আসুন ঘুরে দেখি

সৌরজগৎ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
(ন্যাশনাল ডিপ্লোমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইংল্যান্ড।)

প্রকাশনার নাম লগো ইত্যাদি

সূ চি পা তা

উৎসর্গ

সামিনা রুখসানা বারী, বি.এ.
ভাষা সিলভিয়া বারী, বি.এ.
আলী হুসাইন মুহাম্মদ সুলতান বারী জুবায়ের, একাউন্টেন্ট
মুহাম্মদ কাওসার রাসূল বারী এমরাজ, এম.এস.সি (ম্যাথ্স এন্ড ফিজিক্স - UCL)
মেহরাজ ইবনে বারী শাহরাজ, বি.এ
হাফিজা খানম বুশরা, নূরানী শিক্ষার্থী
এবং
মুসলিমা খানম জাকিরা, নূরানী শিক্ষার্থী

আমার এই সকল আদুরে সন্তানাদিকে

ভূমিকা

-প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
Professor of Physics, Shahjalal Science and Technological University, Sylhet.

মহান প্রভু, প্রতিপালক আল্লাহ মহাবিস্ময়কর এক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে তার এক অতি সংবেদী এবং সুনির্বাচিত স্থান তথা সৌরজগতের এক অতি সংবেদী স্থানে অর্থাৎ পৃথিবী নামক গ্রহে মানবজাতির বাসস্থান করে দিয়েছেন। আমাদের বাসস্থান এই সমৃদ্ধ গ্রহ এমন এক প্রাইম লকেশনে অবস্থিত যা আমাদের জন্য নিজেদের মর্যাদা, অবস্থান ও মহাবিশ্বকে জানার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এ এক ডিজাইন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অনেক বিজ্ঞানী মহাবিশ্বে ডিজাইনের অস্তিত্ব মেনেও ডিজাইনারের অস্তিত্ব মানেন না। তাদের জন্য আফসোস! এটা কি করে সম্ভব যে, ডিজাইন আছে তবে ডিজাইনার নেই? এ এক ভ্রান্তি। মহাবিশ্বে যে ডিজাইন আমরা দেখছি সেই ডিজাইনের ডিজাইনার হলেন আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ। এ সম্পর্কে কণামাত্র সন্দেহ থাকে না, যখন আমরা আল-কুরআন পড়ি। আল-কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, **"Surely, in this are Signs for those who can read sings" (আল-কুরআন : ১৫:৭৫)**। যে আরবী শব্দটি আয়াতের শেষে উদ্ধৃত হয়েছে তা হলো- **'মুতাওয়াছ্‌ছিমিন'** - যার বাংলা প্রতিশব্দ- পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ মানুষ হলো পর্যবেক্ষক। আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেবল তাঁর দাসই বানান নি বরং আমাদেরকে মর্যাদাশীল দাস করে সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজির পর্যবেক্ষক।

পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে বলেই বিজ্ঞানের উন্মেষকাল থেকে বিজ্ঞানীরা মহাকাশের অসংখ্য তথ্য উদঘাটন করেছেন এবং তা সংরক্ষণ করেছেন। চিন্তাশীল মানুষ নিজেদের অবস্থান জানতে সর্বকালেই উৎসুক ছিলেন। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার থেকে তারা তাদের ক্ষুধা মিটিয়েছেন। চিন্তাশীল মানুষের প্রধান লক্ষ্যস্থল আমাদের এই সৌরজগৎ। সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির most life habitable zone -এ অবস্থিত। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলোও পৃথিবীতে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব ও একটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার নিয়ামক। কীভাবে সৌরজগৎ অবিরত চলমান, কার্যকর ও স্থিতিশীল এক বাসস্থান দিল মানুষকে তা জানা যেমন চিন্তাশীল মনের এক আবেদন, তেমনি গবেষকদের আরো গবেষণার উৎস। সৌরজগতের হাজারো বস্তু, তাদের গতি-স্থিতি, ঘূর্ণন, সৃষ্টি-লয় এসবের তথ্য অসংখ্য। সেই অসংখ্য তথ্যকে সুবিন্যস্ত আকারে পরিবেশন এক অতি জটিল কাজ। সেই জটিল কাজের সুন্দর সমাধান করেছেন বাংলার এই বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিবিদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী। তিনি অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন পুরো সৌরজগতকে। সৌরজগতের প্রতিটি **গ্রহ-উপগ্রহ, এ্যাস্টারোইড, মিটিওর** সম্পর্কে বাংলা ভাষায়

এমন তথ্যবহুল গ্রন্থ আর একটি আছে বলে আমার জানা নেই। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য, জটিল সব তথ্য মনকে ভারাক্রান্ত করে না। বইয়ে জ্যোতির্বিদ্যা সংশ্লিষ্ট অনেক তত্ত্বও রয়েছে। সুতরাং তথ্য জানার পাশাপাশি বিজ্ঞানও শেখা হবে অনেক এ বই থেকে। পরিবেশিত অসংখ্য চিত্র জানার কাজটি খুব সহজ করে দেয়। বইটি কেবল স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নয়, মাদ্রাসা ছাত্রদেরও বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা শেখায় সাহায্য করবে। পাশাপাশি বিদগ্ধ বিজ্ঞান পাঠক, এমনকি বয়স্ক উলামায়ে কিরামও বইটির দ্বারস্থ হতে পারেন। মোটকথা, বিভিন্ন বয়স ও পেশার শিক্ষিত পাঠকের জন্য সৌরজগৎ জানা, বিজ্ঞান শেখা, জ্যোতির্বিদ্যা শেখার অনন্য এক উপায় হয়েছে এই **'আসুন ঘুরে দেখি সৌরজগৎ'** নামক গ্রন্থটি।

এ গ্রন্থ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর এক অনবদ্য সংকলন। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক কঠিন বিষয়কে জলের মতো করে পরিবেশন করেছেন। পারিভাষিক বাধা বলতে গেলে খুবই কম। এমন হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা, যে কারো মন জয় করবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কলম অত্যন্ত শক্তিশালী। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উপস্থাপন করেছেন তিনি। গ্রন্থের শেষে মহাকাশ, সৌরজগৎ সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী অসংখ্য তথ্যকে সারিবদ্ধ করে উপস্থাপনও করেছেন তিনি। বইটি মননশীল পাঠকের লাইব্রেরীর মূল্যবান সংযোজন হবে, রেফারেন্স হিসেবে কাজ দেবে এবং সর্বোপরি জানার এক জগতকে হাতের নাগালে এনে দেবে।

আমি ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী সাহেবকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দেই। এমন কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন যা বিজ্ঞানীরাও করেন নি, অন্তত বাংলা ভাষায় নয়, আমার জানা মতে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে ভূমিকা লেখার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বইটির দ্রুত প্রকাশ কামনা করি এবং পাঠকের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাক এই বই- তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনাও করি। ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর জন্যে অসংখ্য মুবারকবাদ।

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
জুলাই ২০১৩।

আমার কথা

আমরা সবাই মহাবিশ্বের মুসাফির। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এক অজানা জগত থেকে আমাদের আগমন। ষাট-সত্তুর-আশি-নব্বুই বৎসর পর আবার সেই অজানা দেশে ফের যাত্রা। বিশ্বের অস্তিত্বকাল, সৌরজগতের বয়স এমনকি মহাকাশে ভাসমান এই নীল গ্রহ **'পৃথিবী'**র বয়সের তুলনায় আমাদের এ ইহলৌকিক জীবন সত্যিই **'ক্ষণকালের'** মাত্র। সংখ্যা এক কোটির সামনে বা শতকোটির সামনে ষাট-সত্তুরের তুলনা কি চলে? কিন্তু এই ক্ষণকালের জীবনই হলো আমাদের প্রাণচঞ্চল চেতনাকাল। এরই মধ্যে প্রদত্ত বড়ো আয়তনবিশিষ্ট শক্তিশালী মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে হবে। জানতে হবে নিজেকে ও জগতকে। জানতে হবে সৃষ্টিকে ও স্রষ্টাকে। সৃষ্ট জগতের মধ্যেই আমাদের বাস। গৃহকর্তাই তার গৃহের খবর জানে বেশী। যে গ্রহে আমাদের বাস, সেটি মহাকাশের এক কোণে ভাসমান। যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তার অবস্থান ও মিথস্ক্রিয়া তার নাম **সৌরজগৎ**। এখানে আছে আরো বেশ ক'টি তুলনামূলক ছোট্ট ও বৃহৎ আয়তনের **গ্রহ**। সেসাথে অনেক **উপগ্রহ**। আরো আছে **এ্যাস্টারোইড** নামক আকারে আলুর মতো অসংখ্য **গ্রহাণুপুঞ্জ**। আছে **ধূমকেতু** ও **মিটিওর**। সর্বোপরি এই পুরো সৌরসিস্টেমের কেন্দ্রে আনবিক ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বলন্ত অতি উজ্জ্বল বিরাট ওজন ও আয়তনবিশিষ্ট এক তারা সবকিছুকে ধরে রেখেছে মহাকর্ষের মাধ্যমে। এটি আমাদের **সূর্য**।

পাঠক! আপনি একজন নভোচারী! হাঁসছেন বুঝি? অন্তত এ গ্রন্থ পাঠের সময় আপনি তা-ই। আপনাকে একটি কাল্পনিক ভ্রমণের সঙ্গী বানাবো। এ ভ্রমণ শেষে আপনি সৌরজগৎ সম্পর্কে ইতোমধ্যে যা জানতেন না, তা জেনে নেবেন। কিভাবে অসংখ্য তারার সমন্বয়ে গঠিত **মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি** নামক এক বিরাট তারাজগতের অংশে আমাদের সৌরজগৎ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে তা আপনি জানতে পারবেন। জানতে পারবেন এর গতিমতি ও গঠনপ্রণালীর উপর অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য। কিভাবে আজকের মানুষ এসব তথ্য আবিষ্কার ও সংগ্রহ করছেন, কিভাবে এসব তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে মহাকাশ ভ্রমণে, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও নিয়ন্ত্রণে ইত্যাদি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

এই ভ্রমণকাহিনী সত্যিকার অর্থে অর্থপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য এবং আনন্দদায়ক করতে যেয়ে জানা তথ্যাদি ও নির্ভরযোগ্য ছবি থেকে আমরা গড়ে তুলেছি একটি ভ্রমণ মডেল। আমরা পুরো সৌরজগতের একটি কাল্পনিক মডেল তৈরী করেছি যা বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্যাদির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মডেল কাল্পনিক হলেও বর্ণিত তথ্যাদি সবই বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কৃত নির্ভরযোগ্য সত্য। এই ভ্রমণ কাহিনী তাই একটি **'সত্য গল্প'**। সহজ, সর্বজনবোধগম্য বাংলা ভাষা এ গল্পের মাধ্যম। ইংরেজী শব্দ থাকলেও এর সঠিক প্রতিশব্দ পাবেন-আরো পাবেন বানানো কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ যা কোন বাংলা অভিধানে এখনো ওঠে নি। তবে হয়তো লিপিবদ্ধ হবে অচিরেই। ... বলা যায় না!

আমাদের ভ্রমণের শুরু বাইর সৌরজগত থেকে এবং শেষ এর কেন্দ্র সূর্যের ঠিক কেন্দ্রস্থলে! কল্পনা

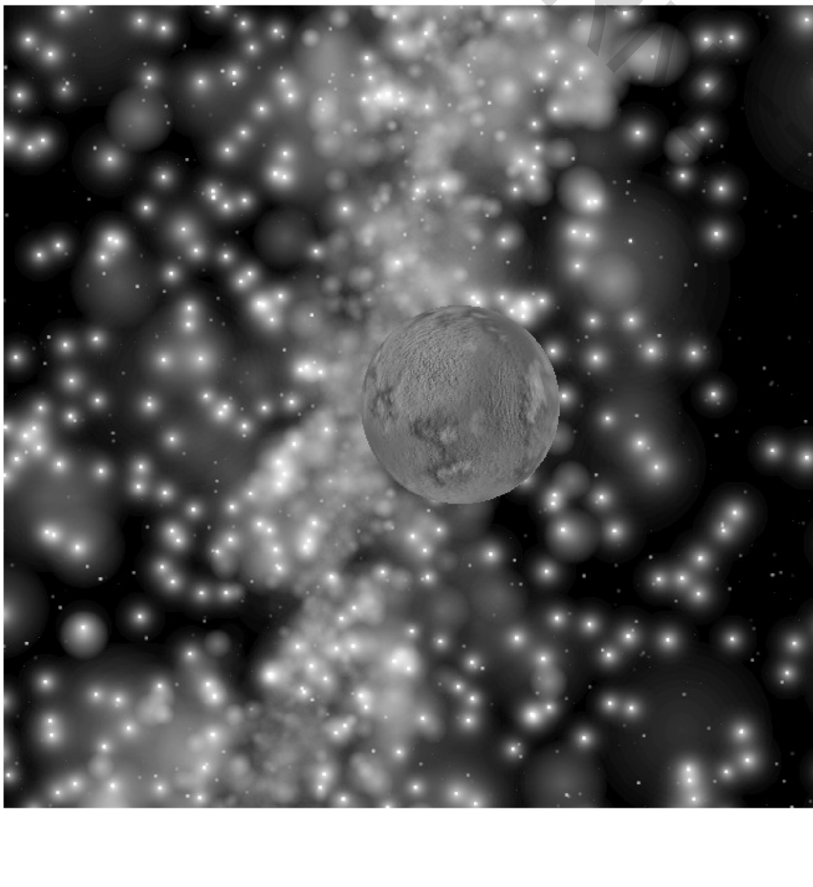
যেথায় ইচ্ছে ভ্রমণ করতে পারে- তাতে কেউ বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। তবে আমাদের এ কল্পনার ভ্রমণে কিছু সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সদাসঙ্গী থাকবে। এগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য ও অনেক সুস্পষ্ট চিত্রাঙ্কন ও ছবি। আমরা যেখানে যেয়ে থামবো- যে বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো, সেটি সম্পর্কে জানা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ব্যক্ত করবো। চিত্রাঙ্কন ও ছবি দ্বারা তা বুঝিয়ে বলবো।

আপনাকে অনুরোধ, সৌরজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেটুকু আপনি জানেন ও বিশ্বাস করেন তার বিপরীত কিংবা সংঘাতময় কোন তথ্য যদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। আপনার এই **'ভুল ধরার'** উপর আমি গভীরভাবে বিবেচনা করবো বিজ্ঞানের আলোকে। যদি এতে ভ্রান্তি বা ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে আমি অবশ্যই আগামী সংস্করণে আপনার নামসহ সংশোধনী ছাপাবো।

পাঠক! এ পর্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা স্মরণ করা একান্ত জরুরী মনে করছি। এদের একান্ত সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থ আপনাদের হাতে ছাপার অক্ষরে পৌঁছতে পারতো না। এই নিঃস্বার্থ সহযোগীরা হলেন, **মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী, পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এবং কবি আবদুল মুকিত মুখতার**। এছাড়া আরো অনেকেই এই গ্রন্থ প্রণয়নে কাজ করেছেন। আমি সবার কাছে চিরঋণী। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা উক্ত সহকর্মীবৃন্দ ও আমার জন্য দু'আ করবেন। ভবিষ্যতে আরো এক দু'টো গ্রন্থ প্রণয়নের আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি।

এবার, আসুন অপূর্ব এই ভ্রমণে যাত্রা শুরু করি। দেখুন, কী আশ্চর্য এক জগতে আমরা বেঁচে আছি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি হতাশ হবেন না ...।

গ্রন্থকার
জুন ২০১২।



যেখান থেকে ভ্রমণের শুরু:
নভোচারী সহযাত্রী! সৌরজগতব্যাপী আমাদের এই অপূর্ব ভ্রমণের শুরু অধুনা আবিষ্কৃত **'সেডনা'** (বায়ে) নামক **'বামন গ্রহ'** থেকে। গ্রন্থ রচনার সময় সূর্য থেকে এর দূরত্ব ছিলো **৮৬.৮৫ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (এইউ)**। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় ৮৭ গুণ বেশী! একটু পরই আমরা সেডনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হবো।

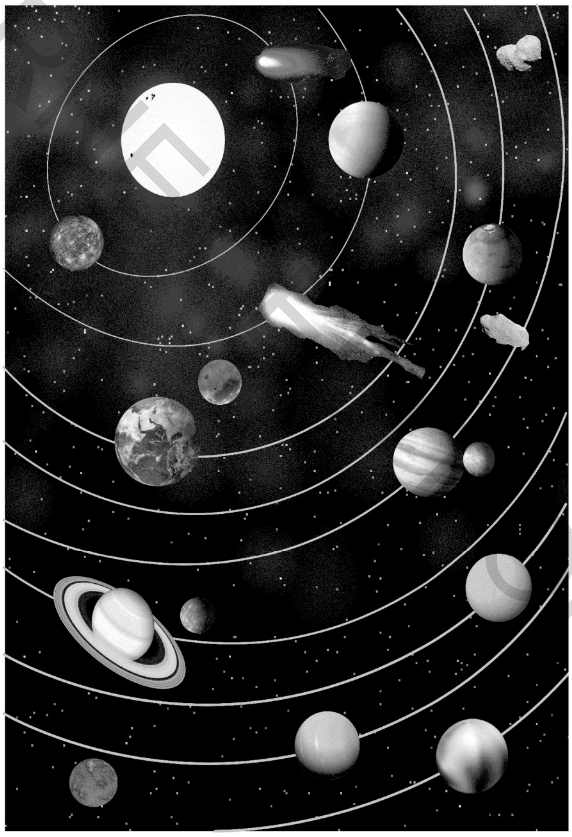
১

সৌর-প্রান্তসীমায় একদল সন্ধানী নভোচারী

আমরা একদল ক্ষুদে নভোচারী। কল্পনার এক মহাকাশযানে অবস্থান করছি। আমরা আছি সৌরজগতের প্রান্তসীমায়। দূর-দূরান্তে, সূর্য থেকে **২ লক্ষ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** দূরে। কী? এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট? এ সম্পর্কে জানতে হবে। বেশ ক'জন সহ-মুসাফির প্রশ্ন করলেন। তাহলে মহাকাশ ভ্রমণে সচরাচর ব্যবহৃত মাপার কিছু ইউনিট বা একক নিয়ে আলোচনা করা জরুরী। আমরা একটু পরই সে আলোচনায় যাচ্ছি। প্রথমে সৌরজগতের একটি ছবি এখানে তুলে ধরলে ভালো হয়।

সৌরজগত: ডানের ছবিটি দেখুন। কোন স্কেল ছাড়াই এ চিত্র অঙ্গন করেছি। এতে তুলে ধরা হয়েছে দূরতম মিনি-গ্রহ বা **প্লানেটোইড 'সেডনা'** থেকে সূর্য পর্যন্ত জানা বস্তুগুলোর চিত্র। চিত্রটি সম্ভবত আরো বড় হলে ভালো হতো। যা হোক, এই চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর প্রায় সবগুলোতেই আমরা ভ্রমণ করবো। আমরা জানবো সূর্য থেকে এগুলোর দূরত্ব, কক্ষপথ ও তার গতির মাত্রা **(বার্ষিক গতি)** এবং নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ঘূর্ণন গতির মাত্রা **(আহ্নিক গতি)**। বস্তুগুলোর আকার, আয়তন, গঠনপ্রণালী, বায়ুমণ্ডল, উপরস্থ তাপমাত্রা ইত্যাদি আরো অনেক তথ্য নিয়েও আলোচনা হবে। তথ্যানুসন্ধানের ভ্রমণশেষে আমরা সৌরজগতের গতিমতি, আয়তন, কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবো- অন্তত এটাই আশা।

ইতোমধ্যে সৌরজগতের বস্তু তথা গ্রহ-উপগ্রহ, এ্যাস্টারোইড ইত্যাদির দু'টি গতির কথা উল্লেখ করেছি। আমার ধারণা আপনি সহযাত্রীর নিকট **'আহ্নিক'** ও **'বার্ষিক'** এ দু'টো গতি অপরিচিত নয়। তবুও- যদি না থাকে? তাই আসুন, আমরা এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর বিস্তারিত আলোচনা করি।



আহ্নিক গতি: অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন সৌরজগতে যেসব গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি আছে এদের মধ্যে দু'টি সুস্পষ্ট গতি বিদ্যমান। এর প্রথমটি হলো **আহ্নিক (দৈনিক) গতি**। আসলে একে দৈনিক কিংবা আহ্নিক বলা তেমন একটা মানানসই নয়। বাস্তবে এটা হলো বস্তুর মধ্যস্থ **'স্পিন'** (spin) বা **'রটেশন্যাল পিরিওড'** (rotational period)। নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঠিক কতটুকু সময়ে বস্তু একবার স্পিন বা ঘুরে, সে হিসাবকেই বলে **আহ্নিক গতি**। নীচের চিত্রে এটা তুলে ধরেছি। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটি গ্রহের রটেশন্যাল পিরিওড এখানে উল্লেখ করবো। অবশ্য আমাদের ভ্রমণকালে এই তথ্যটিসহ প্রতিটি বস্তুর সঠিকভাবে জানা অন্যান্য তথ্যও তুলে ধরবো।



বুধ গ্রহের রটেশন্যাল পিরিওড হলো **৫৮.৪ পৃথিবীর দিন**। শুক্র তার নিজের মধ্যশলাকার উপর ঘুরে আসে **-২৪০ পৃথিবীর দিনে**। লক্ষ্য করুণ সংখ্যাটির পূর্বে **'মাইনাস'** বা বিয়োগ চিহ্ন আছে। এর অর্থ হলো পৃথিবী যেদিকে ঘুরে বুধ তার উল্টোদিকে ঘুরে। অন্যান্য গ্রহের নিকট যখন আমরা পৌঁছবো তখন তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবো। এখন আলোচনায় যাই, **বার্ষিক গতি** নিয়ে।

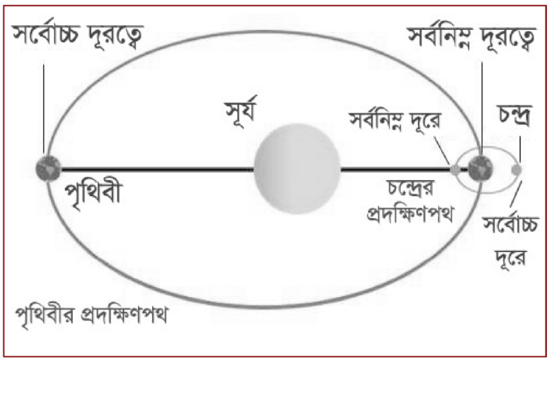
বার্ষিক গতি: বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে বেশ কয়েক শত বৎসর ধরে ওয়াকিফহাল। সৌরজগতের প্রতিটি বস্তুর আরেকটি নির্দিষ্ট গতি আছে। একে বলে **'অরবিট্যাল পিরিওড'**। (orbital period) বাংলায় **বার্ষিক গতি** বললেই চলবে। তবে বর্ষ বলতে কক্ষপথে ঘুরে আসতে যেটুকু সময় লাগে তা-ই মনে করতে হবে। আর কক্ষপথে ঘুরা (যাকে ইংরেজীতে orbit বলে) প্রতিটি বস্তুর জন্য একটি **যৌক্তিক, পরীক্ষিত, পর্যবেক্ষিত** সত্য। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সৌরজগতে সূর্যের কোন সদস্য হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার্থে **'সঠিক গতিশীল হয়ে কক্ষপথে'** ঘূর্ণমান থাকা ছাড়া উপায় নেই। কারণ সূর্যের মধ্যে নিহিত সমগ্র সৌরজগতের সকল বস্তুর তুলনায় **৯৯ শতাংশ ওজন** (বা ম্যাস- মূলত বস্তু)। তার মহাকর্ষের মাত্রা এতোই বিরাট যে, দূর-দূরান্তে কয়েক **আলোকবৎসর** দূর পর্যন্ত তা প্রভাবশীল। সে অবশ্যই সবকিছুকে তার দিকে সদা টেনে নিতে সচেষ্ট আছে। বস্তুগুলো বাঁচতে যেয়ে প্রদক্ষিণ গতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে বাইরের দিকে একটি গতি। এই গতি ও সূর্যের টান গতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি ব্যালান্স। সুতরাং একদিকে সূর্য টানছে আর অপরদিকে বস্তু নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বাইরের দিকে সমপরিমাণ গতি। এই গতি প্রদক্ষিণ পথে চলার ফলেই সৃষ্ট। আশারাখি কিছুটা বুঝে নিয়েছেন। পরে আরো বলবো। এখন দু'একটি বস্তুর কক্ষপথে চলার গতি ব্যক্ত করছি। কাছের গ্রহ বুধ **০.২৪০৪ পৃথিবীর বৎসরে** (অর্থাৎ ৮৮ পৃথিবীর দিনে) একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র **০.৬১৫২ পৃথিবীর বৎসরে** (অর্থাৎ ২২৫ দিনে) একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। বাকী গ্রহ-উপগ্রহের তথ্যাদি বর্ণনার সময় লিপিবদ্ধ করবো তাদের এই গতির মাত্রা। মহাকাশে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ কোন্ আইনের আওতাধীন থেকে প্রদক্ষিণপথে চলে? এ প্রশ্নের আংশিক জবাব হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টি

সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নিলে আমাদের জন্য ভালো হয়। সুতরাং বুঝে নিই **‘প্রদক্ষিণপথ’** বা **অরবিট** বলতে বিজ্ঞান আমাদেরকে কি বলে?



পৃথিবীর বার্ষিক গতি

প্রদক্ষিণপথ: বিজ্ঞানের ভাষায় **‘স্থানের উপর চলমান কোন বস্তুর গতিপথের নাম হলো অরবিট বা প্রদক্ষিণপথ’**। প্রদক্ষিণপথের সূচনা হয় যখন কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর উপর মহাকার্ষিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই আকর্ষণ হেতু চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে ও পৃথিবী (চন্দ্রকে নিয়ে) সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে।



পৃথিবীর প্রদক্ষিণপথ

চারটি গতিপথের যে কোন একটি এই প্রদক্ষিণপথ অনুসরণ করে। এগুলোকে বলে কোণিক সেকশন (conic section)। বাংলায় আমরা কি বলবো? অভিধানে conic- শব্দের অর্থ লেখা আছে **‘মোচাকার’** আর section- শব্দের অর্থ কর্তিতাংশ। তাহলে বলতে হবে: **মোচাকার কর্তিতাংশ!** কারো বোধগম্য হয়েছে কি? আসলে **‘কোণিক সেকশন্স’** জ্যামিতির একটি শাখার নাম। কৌণ বা নিখুঁতভাবে মোচা কোন বস্তুকে বিভিন্ন কোণে কেটে নিলে চারটি গাণিতিক কার্ভ বা বাঁকানো রেখা সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো **বৃত্ত** (circle), **অধিবৃত্ত** (parabola), **উপবৃত্ত** (ellipse) এবং **পরাবৃত্ত** (hyperbola)। নীচের চিত্রে এগুলো অঙ্কিত হয়েছে। পাঠকদেরকে **‘গণিত দ্বারা মানসিক কষ্টে’** ফেলতে চাই না। আর আমি নিজেই গাণিতিক বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় বুঝাতে যেয়ে হিমশিম খেতে আগ্রহী নই! **‘প্লানেটারী মোশন’** খুব জটিল ব্যাপার। এর উপর গভীরে যেয়ে বিশ্লেষণ আদৌ আমাদের মতো সাধারণ নভোচারীদের জন্য জরুরী নয়! ঠিক বলি নি?



যা হোক, উপরোক্ত চারটির যে কোন একটি গতিপথে যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করে। যে বস্তুকে প্রদক্ষিণ করা হয় তা থাকে ঐ চারটি গতিপথের ঠিক **ফোকাল পয়েন্টে**। আমরা পরের পৃষ্ঠার চিত্রে ফোকাল পয়েন্ট দেখিয়েছি। সুতরাং সূর্য ফোকাল পয়েন্টে আছে। আরো দু'টি পয়েন্টও দেখিয়েছি। আমদের ক্ষেত্রে এটুকু তথ্য



জানা এখানে মুখ্য। আশাকরি এ তিনটি চিত্র স্ট্যাডি করলেই আমরা কক্ষপথে ঘুরার সঠিক ব্যাখ্যা মোটামুটি বুঝতে সক্ষম হবো। অবশ্য খুব সূক্ষ্মভাবে বুঝতে গেলে আমাদেরকে সর্বাধুনিক মহাকার্ষিক থিওরীর উপর আলোচনা করতে হবে। এই থিওরীর নাম **'জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি'**। আমরা উচ্চগণিত-সম্বলিত এ থিওরী নিয়ে এখানে মাথা ঘামাবো না। সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তু কিভাবে চলমান, তা বিজ্ঞান সাধারণ ভাষায় যেভাবে বুঝিয়েছে, তা-ই হবে আমাদের অনুসন্ধানের সীমা।

মহাকাশ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্ব মাপার একক: আমাদের এ মহাবিশ্বের আয়তন অত্যন্ত বিরাট। মহাজাগতিক বস্তু যেমন তারকা, তারামণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি এক থেকে আরেকটার দূরত্ব এতো বেশী যে, আমাদের পৃথিবীর বুকে ব্যবহৃত **মিটার, মাইল, কিলোমিটারের** হিসাবে কুলায় না। এসব মাপার ইউনিট দ্বারা যদি আমরা ঐসব বস্তুর দূরত্ব বুঝাতে যাই তাহলে বিরাট লম্বা লম্বা সংখ্যা লিখতে বাধ্য হবো। অবশ্য নিকটস্থ বস্তু যেমন চন্দ্র বা এমনকি সূর্যের দূরত্ব মাইল-কিলোমিটার দ্বারাও বুঝানো সম্ভব। যেমন পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব হলো **৩,৮৪,৪০৩ কিলোমিটার (২,৩৮,৮৫৭ মাইল)**। কথায় এ সংখ্যাকে কিভাবে বলতে হবে? **তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত তিন কিলোমিটার (দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত সাতান্ন মাইল)**। অনুরূপ আমরা সূর্যের গড় দূরত্ব কিলোমিটার ও মাইল দ্বারা লিখতে-বুঝতে পারি- **১৫ কোটি কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)**। কিন্তু চন্দ্র বা সূর্য তো আমাদের অতি নিকটের ক'টি বস্তুর মধ্যে দু'টি মাত্র। এই সৌরজগতেই এমন কিছু বস্তু আছে যাদের দূরত্ব অনেক অনেক গুণ বেশী। আর তারকা ও তারকাপুঞ্জের দূরত্ব তো শত শত কোটি গুণ পর্যন্ত হতে পারে! সুতরাং আমাদের মগজে অনুধাবনযোগ্য এবং বিজ্ঞান-গবেষণায় সুবিধাজনক কিছু দূরত্ব মাপার ইউনিট আবিষ্কার করার দরকার। চ্যালেঞ্জ হলো সংখ্যা ছোট হবে, কিন্তু বুঝানো হবে বড় অঙ্কের দূরত্ব।

এসে গেলো **'এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট', 'পারসেক'** ও **'আলোকবৎসর (লাইট ইয়ার)'**। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, আমরা সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বকে যদি এক **'এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট'** হিসাবে চিহ্নিত করে নেই তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পৃথিবীটা আমাদের সকলের বাসস্থান। সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিকে উদয় হয়-আবার পশ্চিমাকাশের দিগন্তে অস্ত যায়। এই দু'টি বস্তু সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিফহাল। চন্দ্র ও এ দু'টোর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা সর্বাপেক্ষা বেশী। তবে যেহেতু চন্দ্র তুলনামূলকভাবে বেশী নিকটে তাই পৃথিবী-চন্দ্র দূরত্ব কোন একক ইউনিট হিসাবে বেছে নিলে সত্যিকার অর্থে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। সুতরাং ৯৩ মিলিয়ন মাইল বা ১৫ কোটি কিলোমিটারকে আমরা দূরত্ব মাপার ইউনিট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারি। পৃথিবী-সূর্য দূরত্বের সঙ্গে অন্য বস্তুর দূরত্বকে তুলনামূলকভাবে বুঝা যাবে। আর এটা হবে সর্বজনবোধগম্য। হ্যাঁ, এই আশা নিয়েই বেশ আগে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চালু করেন, **'এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট'** [astronomical

unit - AU] নামকরণে বিরাট দূরত্ব মাপার এই এককটি। পাঠক! আর বলতে হবে? মাইল কিলোমিটারের সঙ্গে এই এককটির সম্পর্ক আবার খুব যথার্থভাবে হাইলাইট করা যায়: **১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (AU) = ১৪,৯৫,৯৭,৮৭০ কিলোমিটার (৯,২৯,৫৫,৮০৮ মাইল)**।

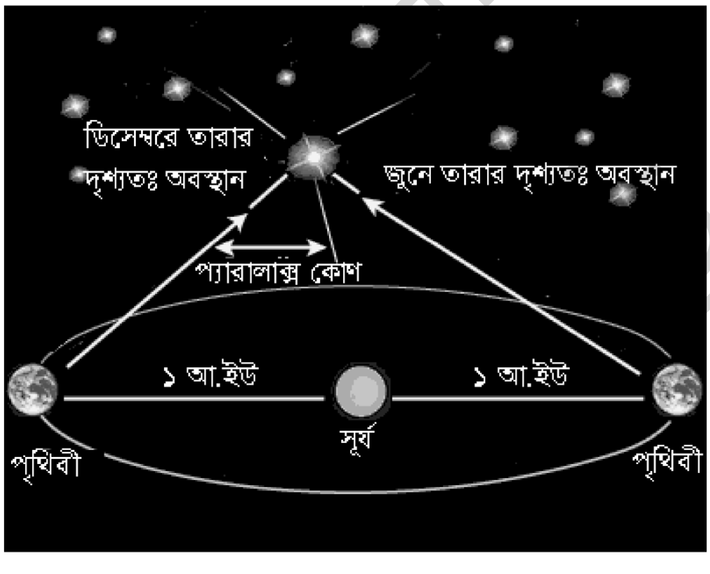
বেশ কিছুদিন **এইউ** দিয়েই চললো। এরপর বিজ্ঞানীরা আবার সমস্যায় পড়লেন! তারা প্রমাণ পেলেন এ মহাবিশ্ব আসলে খুউব বিরাট! নিকটতম তারার দূরত্ব মেপে জানা গেল তা প্রায় **২,৫২,৯৫৯ এইউ!** তাহলে? দূরবর্তী দৃশ্যমান তারাগুলোর দূরত্ব বুঝাতে এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিটেও কুলাবার নয়।

এবার এসে গেলো **'পারসেক'** (Parsec)। পারসেকের হিসাব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করলো তা বুঝার সূত্র আরেকটি ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তারার দূরত্ব অঙ্ক কষে বের করার একটি চমৎকার উপায় আবিষ্কার করেন। আকাশে দৃশ্যমান অনেক তারার দূরত্ব এই অভিনব উপায়ে মাপা সম্ভব। এই নতুন পদ্ধতিকে বলে **'প্যারালাক্স'** (parallax)।

সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। ছয় মাসের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী সূর্যের ঠিক বিপরীত প্রান্তে যেয়ে পৌঁছে। সুতরাং এ দু'টি অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু তা জানা যায় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব থেকে। প্রথম অবস্থানে থাকার সময় দূরের একটি তারা নিকটস্থ আরেক তারার তুলনায় কোথায় আছে তা দেখা যায়। পৃথিবী যখন কক্ষপথে অর্ধেক রাস্তা (ছয় মাসে) অতিক্রম করে দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছে তখন ঐ একই দূরবর্তী তারার দৃশ্যত অবস্থান নিকটস্থ তারাটির তুলনায় কিছুটা বদলে যায়। এখন আমরা এই দৃশ্যত অবস্থান বদলের সঠিক মাপ নিতে পারি ডিগ্রী বা তার অংশ হিসাবে। যেটুকু কোণিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে তা-ই হলো ঐ তারার প্যারালাক্স। সাধারণ জ্যামিতি ব্যবহার করে অঙ্ক কষে ঐ দূরের তারার সঠিক দূরত্ব নির্ণয় তখন অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এখনো বুঝে আসে নি বুঝি? এই অঙ্কটি দেখুন।

অঙ্ক প্যারালাক্স : দূরত্ব (দ পারসেক) = ১/প্যারালাক্স (প আর্কসেকেন্ড)

প্যারালাক্স: কথায় বলে, ছবি কয় শতকথা। সত্যিই তা-ই। প্যারালাক্স নামক তারার দূরত্ব পরিমাপের পদ্ধতি বুঝতে আমাদেরকে ডানের ছবিটি ভালোকরে স্ট্যাডি করতে হবে। দেখুন, এভাবে ব্যাপারটি উপস্থাপন, আমি বর্ণনাকারী ও আপনি পাঠকের জন্য কেমন সহজ!



ছবির দিকে তাকান ও ব্যাখ্যাটুকু পাঠ করুন। পৃথিবী

সুতরাং আমরা **১ পারসেক বলতে ১/১ আর্কসেকেণ্ড** বুঝাচ্ছি। নিকটস্থ তারার নাম প্রক্সিমা সেন্টোরি। এর প্যারালাক্স হলো **০.৭৬২** আর্কসেকেন্ড। উপরের সমীকরণে এই সংখ্যা বসিয়ে দেখা যাক। **দূরত্ব (দ পারসেক) = ১/০.০৭৬২ = ১.৩১২৩৩৫৯৫৮০০৫২৫ পারসেক**।

সুতরাং প্যারালাক্স হলো তারাদের দৃশ্যত অবস্থান পরিবর্তন। এটা ডিগ্রীর অংশ আর্কসেকেন্ড দ্বারা মাপা হয়। প্যারালাক্সের মাধ্যমে অন্তত ২০০০ নিকটস্থ তারার দূরত্ব মাপা সম্ভব। এখন বাকী থাকলো পারসেক ইউনিটের সঙ্গে এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিটের সম্পর্ক। পরীক্ষা ও অঙ্ক কষে দেখা গেছে **১ পারসেক = ২০৬২৬৪.৫৭ এইউ**।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এবার হলো! বড় দূরত্ব মাপতে পারসেক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বেশীদিন এ উপায়ও ব্যবহারযোগ্য রইলো না। নিকটস্থ তারাসমূহের দূরত্ব মাপতে পারসেক যথেষ্ট মনে হলেও দূরতম তারা ও বাইরের গ্যালাক্সির দূরত্ব মাপতে পারসেকেও কুলায় না। সুতরাং প্রয়োজন অপর কোন ইউনিটের। এবার এলো **আলোকবৎসর** (light-year)।

আলোকবৎসর: এই মাপটির মূলে আছে আলোকের গতি। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত কোন চলন্ত বস্তু পান নি যার গতি আলোকের চেয়েও বেশী। সবকিছুর মতো আলোকরশ্মিও গতিশীল। বার বার পরীক্ষা করে এই গতি নির্ধারণ করা হয়েছে। শূন্যস্থানে এই গতি অপরিবর্তনশীল। জগতের সর্বোচ্চ এই গতিটি হলো: **২,৯৯,৭৯২.৪৫৮ কিলোমিটার = ১,৮৬,২৮২.৩৯৯৩৭৮৪১ মাইল**। বিজ্ঞানীরা বলেন, যাবতীয় ইলেকট্রমেগন্যাটিক বিকিরণ (রেডিও, টিভি সিগনাল ইত্যাদি) এই উচ্চতর গতিতে চলে। এখন, প্রতিটি তারা ও গ্যালাক্সি থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীর উপর এসে পতিত হয়েছে। সুতরাং শূন্যস্থানে আলোকের গতির সাথে দূরত্ব মিলালে ঠিক কতদিন পূর্বে এই আলোকরশ্মি পৃথিবীপানে যাত্রা করেছিল তার একটি হিসাব পাওয়া যায়। তবে সর্বোপরি একটি নতুন ইউনিট ব্যবহার করা সম্ভব যেখানে তারা ও গ্যালাক্সির দূরত্ব এই আলোকের গতির সঙ্গে তুল্য হবে।

বিষয়টি অনুধাবন করতে সূর্যের দূরত্ব সম্পর্কে বলা যায়। আমরা জানি এটা পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব ভ্রমণ করতে একগুচ্ছ আলোকরশ্মির কতটুকু সময় লাগবে? আমরা সহজেই তা নির্ণয় করতে পারি: তাহলো (দূরত্ব কিমি) **১৪৯৫৯৭৮৭০ / (আলোকের গতি কিমি প্রতি সেকেন্ড) ২৯৯৭৯২.৪৫৮ = ৪৯৯.০০৪৮ সেকেন্ড**। এখন এই সংখ্যাকে আমরা মিনিটে রূপান্তর করতে পারি: **৪৯৯ / ৬০ = প্রায় ৮.৩২ সেকেন্ড**। সুতরাং সূর্য থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে এটুকু মাত্র সময় অতিবাহিত হয়। আমরা বলতে পারি **১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট = ৪৯৯ লাইটসেকেন্ড = ৮.৩২ লাইট মিনিট (আলোক-মিনিট)**।

এভাবে আমরা এক লাইট ইয়ার বা আলোকবৎসরের দূরত্বও মাপতে পারি। অর্থাৎ এক বৎসর চলার পর একটি আলোকরশ্মি যে পরিমাণ দূরে ভ্রমণ করবে তা-ই হলো এক আলোকবৎসর। এ ইউনিটটি এবার মাইল-কিলোমিটারের সঙ্গে মিলানো যায়। এতে পাঠকরা বুঝতে পারবেন কী কারণে আমরা এই উচ্চতর সংখ্যাটি ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারি।

এক বৎসরে আছে মোট **২৪*৬০*৬০*৩৬৫ = ৩১৫৩৬০০০ সেকেন্ড**। সুতরাং আলোকরশ্মি

এক বৎসরে চলবে = (৩১৫৩৬০০০*১৮৬২৮২.৩৯৯) = ৫৮৭৮৫০২১৭০৭১৯.০৯ মাইল = (৩১৫৩৬০০০*২৯৯৭৯২.৪৫৮) = ৯৪৬০৫৩২০৭৯২৪৫.২ কিলোমিটার।

এই বিরাট সংখ্যাকে কথায় কিভাবে বলবো? আসলে কঠিন। এরপরও একক, দশক, শতক ... বলে বলে প্রথমে কমা দেওয়া যাক: **৫,৮৭,৮৫০,২১,৭০,৭১৯** (দশমিক বাদ দিলাম) **= পাঁচ লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত পঞ্চাশ কোটি একুশ লক্ষ সত্তুর হাজার সাত শত উনিশ মাইল!** কিলোমিটার কথায় বলার চেষ্টায় যাচ্ছি না! আশাকরি বুঝ হয়ে গেছে। ভাবার ব্যাপার নিকটস্থ তারা থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে ৪.২১ বৎসর! আমরা এই দূরত্বকে মাইল-কিলোমিটারে বলার চেষ্টা না করে শুধু বলবো: **নিকটস্থ তারা প্রক্সিমা সেন্টোরির দূরত্ব ৪.২১ আলোকবৎসর। ব্যস।**

যেসব তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো: আমাদের ভ্রমণপথে সৌরজগতের যতো বস্তুর সাক্ষাৎ ঘটবে তাদের ব্যাপারে কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যক্ত করবো। এসব অতিরিক্ত তথ্য দ্বারা বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটবে। বস্তুর নাম, সূর্য থেকে দূরত্ব, কক্ষপথে ভ্রমণের তথ্য, আকার, আয়তন ইত্যাদি যতো বেশী জানা যাবে তা আমাদের ক্ষেত্রে ততোই সৌরজগৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত অবগতির কারণ হবে। সুতরাং আসুন, নিম্নে এসব তথ্য কি তা আগে জেনে নিই।

ইতোমধ্যে আমরা বেশ ক'টি তথ্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি। এগুলো হলো: **১. আহ্নিক গতি, ২. বার্ষিক গতি, ৩. প্যারালাক্স, ৪. অরবিট বা প্রদক্ষিণপথ এবং ৫. দূরত্ব মাপার জন্য চারটি পদ্ধতি: মাইল-কিলোমিটার, এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট, পারসেক ও আলোকবৎসর।**

যে কোন এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তু সম্পর্কে আরো যেসব তথ্য আমাদের জানা দরকার তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো:

১. সূর্য থেকে দূরত্ব, ২. বস্তুর ব্যাসার্ধ, ৩. দৃশ্যত ব্যাস, ৪. সারফেস তাপমাত্রা, ৫. বায়ুমণ্ডলের উপর তথ্যাদি, ৬. গ্রহ হলে তার মুক্তগতি ও ৭. গঠনপ্রণালী।

আশারাখি আমার সহযাত্রী ভ্রমণকারীদের নিকট উপরোক্ত তথ্য সুপরিচিত। তবে যদি কোন ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায় তাহলে বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদানকালে অতিরিক্ত যা বলার বলবো। মোটকথা, আমরা চাই না এই বিরাট ভ্রমণকালে কোনো ব্যাপার কারো নিকট অস্পষ্ট থেকে যাক।

তাহলে আসুন, এবার ফিরে আসি আমাদের ভ্রমণে। আমরা কোনো তারার নিকট ভ্রমণে যাচ্ছি না। এ জন্য অন্য কোন ভ্রমণকাহিনী সবাইকে উপহার দেবার আশা রাখি। আমাদের ভ্রমণসীমা সৌরজগতের দূরতম বস্তু থেকে সূর্যের একেবারে কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত। মোটকথা আমরা ঘুরে দেখবো এ পর্যন্ত জানা সৌরজগতের সকল বস্তুকে। আসুন তাহলে মুহূর্তে চলে যাই দূরতম বস্তু **'সেডনা'** নামক মিনি-গ্রহে।



২

সেডনা, অর্ট ক্লাউড ও কাইপার বেল্ট

আমার সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরতম বস্তু (যখন তার কক্ষপথে সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে যেয়ে পৌঁছে) **'সেডনার'** অতি নিকটে অবস্থান করছি। বস্তুটি আসলে **অর্ট ক্লাউড** (Oort Cloud) নামক একটি কল্পিত এলাকায় অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা অর্ট ক্লাউডে অনেক ধূমকেতু আছে। যা হোক অর্ট ক্লাউড সম্পর্কে এখনো সঠিক তথ্যাদি জানা যায় নি। সেডনা হয়তো অর্ট ক্লাউডের সদস্য হতে পারে। নীচের চিত্রে অর্ট ক্লাউডের একটি কাল্পনিক ছবি দেখা যাচ্ছে।



অর্ট ক্লাউড

আবিষ্কার: মার্চ ২০০৪ সালে সেডনা আবিস্কৃত হয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বললেন, পৃথিবী থেকে ১৩ বিলিয়ন কিলোমিটার (৮ বিলিয়ন মাইল) দূরত্বে এর অবস্থান। বস্তুটি আসলে একটি **প্লানেটইড (গ্রহসদৃশ)**। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা এটির নামকরণ করেন, **সেডনা** (sedna)। কেন এই নাম? আমাদের গ্রহের বরফাবৃত কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে একদল মানুষ (ঠিক এস্কিমোদের মতো) বাস করে। এরা আদি মানুষ। দক্ষিণ মেরু নিকটবর্তী কানাডার একাংশ, আলাসকা, গ্রিনল্যান্ড ও রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় এরা বসবাস করে। এই মানবগোষ্ঠির নাম হলো **ইনোইট** (Inuit)। যদিও আদি তথাপি তাদের কালচারে নিজস্ব কিছু ধর্মবিশ্বাস এবং পৌরাণিক কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। পৌরাণিক কাহিনীর এক **'দেবীর'** নাম হলো **'সেডনা'**। আদি এই মানবগোষ্ঠির সম্মানার্থে বিজ্ঞানীরা উক্ত প্লানেটইডের নামকরণ করেছেন **'সেডনা'**।

জানা অন্যান্য তথ্যাদি: সেডনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন এই গ্রহসদৃশ বস্তুটিই হলো এ পর্যন্ত আবিস্কৃত সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা দূরতম বস্তু। এর প্রদক্ষিণপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির। ফলে প্রদক্ষিণ পথের এক পর্যায়ে এটা সূর্য থেকে

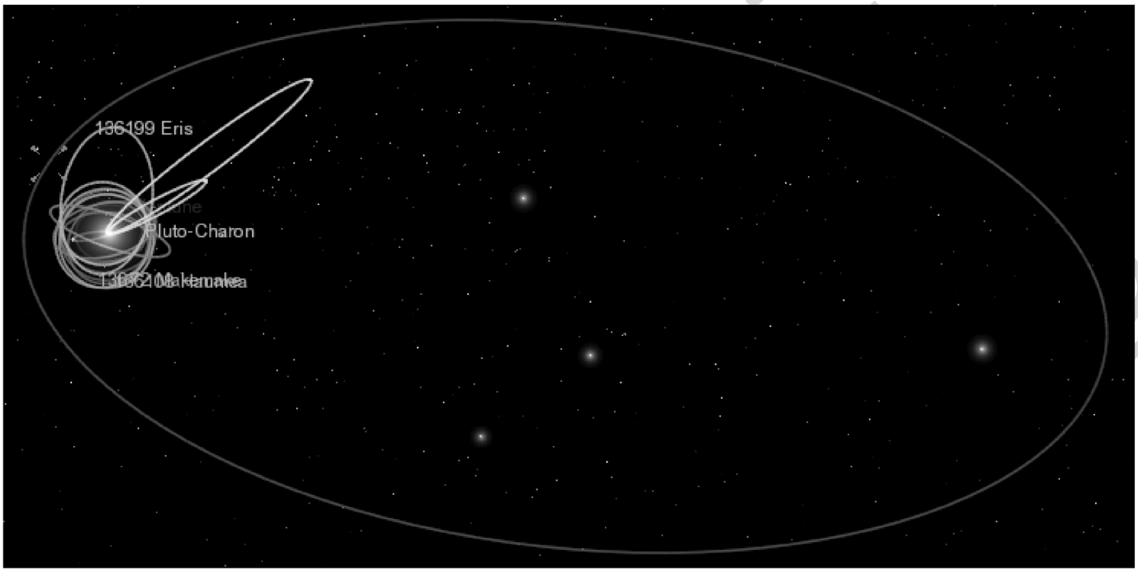
৯৮৬ এইউ দূরত্বে চলে যায়। মাইলের হিসাবে এই বিরাট দূরত্ব হলো **৯,১৬৫,৪৪,২৬,৬৮৭**। প্রায় ৯ হাজার **১** শত ৬৬ কোটি মাইল। কিন্তু বর্তমানে এটি সূর্যের অনেকটা নিকটে অবস্থান করছে। হিসেব করে দেখা গেছে এখন সে ৮৭ এইউ দূরে আছে। সেডনার আহ্নিক গতি হলো ১০ ঘণ্টা। তবে তার বার্ষিক গতি বিরাট। আমাদের এই ভ্রমণে সহায়ক হিসাবে একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশন প্রোগ্রাম আছে। এর নাম **'সেলেস্টিয়া'**। সত্যিকার অর্থে ওয়াভারফুল এই প্রোগ্রাম দ্বারা মহাবিশ্বের অনেক বস্তুর সঠিক তথ্যাদি জানা সম্ভব। এমনকি এই গ্রন্থের অনেক ছবি সৃষ্টিতে সেলেস্টিয়া বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এ প্রোগ্রাম থেকে হিসেব করে দেখা গেছে সেডনা **ঈসায়ী ৮,৪৬৫ সাল** নাগাত সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরতম বস্তু হবে। তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো সেডনার বার্ষিক গতি। সেডনা সূর্যকে একবার মাত্র ঘুরে আসতে ব্যয় করে পৃথিবীর **১২,২৫৮ বৎসর!** সুতরাং লিখিত ইতিহাসের কাল থেকে এ পর্যন্ত সে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করেছে। নীচের চিত্রে এই বিরাট প্রদক্ষিণপথের ছবি তুলে ধরা হলো।

সৌরজগতে আমাদের এই নভোভ্রমণের প্রথম বস্তু সেডনা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। নিম্নে এসব তথ্য তুলে ধরলাম।

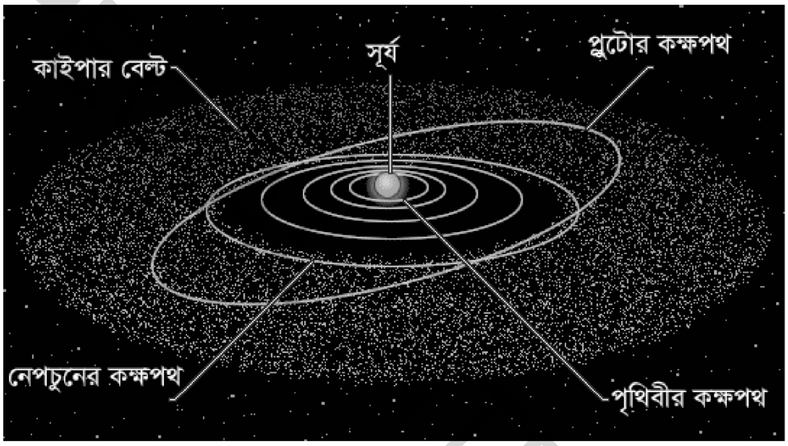
ব্যাসার্ধ: ৮৫০ কিলোমিটার; **সারফেস (উপরস্থ) তাপমাত্রা:** ৩০ ডিগ্রী কেলভিন (-২৪৩.১৫ সেলসিয়াস, -৪০৫.৬৭ ফারেনহাইট); **আকার:** অনেকটা গোলক ধরনের।

কাইপার বেল্ট

প্রিয় সহযাত্রী! সৌরজগতের দূরতম বস্তু সেডনা সম্পর্কে আর বেশী কিছু আমাদের জানা নেই। গ্রহসদৃশ এই বস্তুর নিকট থেকে এবার সূর্যের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আমাদের গতি যদি আলোকের কাছাকাছি না হয় তাহলে পরবর্তী গ্রহ ও তার উপগ্রহ (চন্দ্র) কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ জীবিত থাকতে সম্ভব হবে না! কারণ সেডনা থেকে বর্তমানে (মার্চ ১৪, ২০১২ ঈসায়ী সনে) ঐ গ্রহের দূরত্ব পুরো ১১২ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট। আলোকের গতিতে চললেও সময় লাগবে ১৬ ঘণ্টা। আমাদের হাতে এতো সময় নেই! তবে ভাবনা কিসের? আমরা তো ভ্রমণ করছি **'কল্পনা'** নামক মহাকাশযানে!



তবে সেথায় ভ্রমণের পথে আমাদেরকে মহাকাশে ভাসমান সৌরজগতের অসংখ্য ছোটবড় সদস্যসম্বলিত একটি অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হবে। এ অঞ্চলের নাম **'কাইপার বেল্ট'** (Kuiper Belt)। নীচের কল্পিত চিত্রে এ বেল্টটি তুলে ধরা হয়েছে।



আসলে এই বেল্টটির শুরু নেপচুনের প্রদক্ষিণপথের একটু বাইর থেকে এবং শেষ প্লুটোর প্রদক্ষিণপথ থেকে বেশ দূর পর্যন্ত। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা এই বেল্টে অনেক ছোট-বড় হিমায়িত বরফ, ধূলোবালি ও পাথরের তৈরী বস্তু আছে। এসব বস্তুর আয়তন অতি ছোট্ট বরফখণ্ড থেকে প্লুটোর সমপরিমাণ হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এগুলো শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। এতে বুঝা যায় সমগ্র বেল্টটি মূলত একটি ডিস্কের মতো। এ পর্যন্ত হাজার খানেক কাইপার বেল্ট বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা এদের মোট সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। আয়তনে এরা ৫০ কিমি (৩০ মাইল) থেকেও বড়ো হতে পারে। সৌরজগতে আরেকটি বেল্ট আছে। আমাদের ভ্রমণের অংশ হিসাবে আমরা এ বেল্টের নিকটবর্তী হবো। এটির নাম **'এ্যাস্টারোইড বেল্ট'**। চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল ও সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে এই বেল্ট অবস্থিত।

কাইপার বেল্টে অসংখ্য ধূমকেতুর বাসস্থান বলে ধারণা করা হয়। তবে সবাই মিলেও পৃথিবীর মধ্যে যেটুকু বস্তু আছে তার তুলনায় মাত্র ৩ শতাংশ বস্তু হবে এই বেল্টে।

ইতিহাস: বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় কাইপার বেল্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডাচ্-আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী **'জেরার্ড কাইপার'** থিওরী উপস্থাপন করেন। কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানে এরূপ কোন বেল্টের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি। এখন এটা জানা গেছে, সে যুগের ফটোগ্রাফিক টেকনিক যথেষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম ছিলো না বলেই কাইপার বেল্টের বস্তুগুলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ছবিতে তখন ধরা দেয় নি। এরপর ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হয় **'চার্জ-কাপল্ড ডিভাইস'** [charge coupled device] নামক এক ধরনের ইলেকট্রনিক ক্যামেরা। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী **জেইন ল্যু** এবং **ডেভিড জিউইট** কাইপার বেল্টের প্রথম বস্তুটি আবিষ্কার করেন। এর নামকরণ করা হয় ১৯৯২$QB_১$।

কাঠামো: কাইপার বেল্ট মূলত দু'টি বৃহৎ গ্রুপে বিভক্ত। এর প্রথমটি হলো **'ক্লাসিক্যাল গ্রুপ'**। এ গ্রুপটির অবস্থান ৩৫ থেকে ৫৫ এইউ দূরত্বে। অপর গ্রুপটি **'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে'** আছে। এ গ্রুপের কোন কোন সদস্য হাজার এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

কাইপার বেল্টের জানা ক'টি সদস্য: ১. অরকাস (orcus); সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৮ এইউ;

ব্যাসার্ধ, ৮০০ কিমি; আহ্নিক গতি ২ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ৪০ কেলভিন (-২৩৩.১৫ সেলসিয়াস)। ২. ইক্সিওন (Ixion); সূর্য থেকে দূরত্ব ৪১ এইউ; ব্যাসার্ধ, ৬০০ কিমি, আহ্নিক গতি ১.২৫ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ৪৪ কেলভিন (-২২৯.১৫ সেলসিয়াস)। ৩. এরিস (Erris); সূর্য থেকে দূরত্ব ৯৬.৭ এইউ; ব্যাসার্ধ, ২৪০০ কিমি, আহ্নিক গতি ১.০৮ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ১৮ কেলভিন (-২৫৫.১৫)। এরিস সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ৫৬০ বৎসরে। বর্তমানে সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা দূরতম জানা প্লানেটইড হচ্ছে এরিস। তবে ভবিষ্যতে সেডনা হবে দূরতম বস্তু। বর্তমানে সেডনা ৮৭ এইউ দূরত্বে অবস্থান করছে। ৪. কুয়াওয়ার (Quaoar); সূর্য থেকে ৪৩ এইউ দূরে অবস্থিত; ব্যাসার্ধ, ৬২৫ কিমি; আহ্নিক গতি ১৭.৭ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ৪২ কেলভিন (-২৩১.১৫ সেলসিয়াস)। ৫. ভারুনা (Varuna); সূর্য থেকে দূরত্ব ৪৩.৬ এইউ; ব্যাসার্ধ ৪৫০ কিমি; আহ্নিক গতি ৬.৩৪ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ৪২ কেলভিন (-২৩১.১৫ সেলসিয়াস)। ৬. ২০০৩ ইএল-৬১ (2003 EL61); সূর্য থেকে দূরত্ব ৫১ এইউ; ব্যাসার্ধ, ৯৮০ কিমি; আহ্নিক গতি ৩.৯ ঘণ্টা; সারফেস তাপমাত্রা ৩৩ কেলভিন (-২৪০.১৫ সেলসিয়াস)। ৭. ২০০৫-এফওয়াই-৯ (2005 FY9); সূর্য থেকে দূরত্ব ৫১ এইউ; ব্যাসার্ধ, ৮৫০ কিমি; আহ্নিক গতি ২ দিন; সারফেস তাপমাত্রা ৩৩ কেলভিন (-২৪০.১৫ সেলসিয়াস)। অনেকের মতে গ্রহ প্লুটো ও তার চন্দ্র ক্যারন মূলত কাইপার বেল্টের বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়।

নভোযাত্রী ভাই ও বোন! দেখুন, উপরে বর্ণিত সেডনা ও কাইপার বেল্টের প্রতিটি বস্তুর তাপমাত্রা কী? আসলে এগুলো সত্যিকার অর্থে একেকটি **'ভীষণ ঠাণ্ডা দুনিয়া'** বৈ কিছু নয়! বিজ্ঞানীদের ধারণা এসব বায়ুমণ্ডলহীন বস্তুর উপর কোন **'প্রাণী'** জীবিত থাকার সম্ভাবনা মোটেই নেই। সবগুলো বস্তু সূর্য থেকে এতো বেশী দূরে যে, কোন একটির উপর দাঁড়িয়ে সূর্যকে একটি মিটিমিটি তারার মতো দেখাবে মাত্র। এসব বস্তু প্রায় অন্ধকার এক জগতের বাসিন্দা। এদের বাইরদিকে বিস্তৃর্ণ বিরাট এক আন্তঃতারা মহা-শূন্যস্থান বিরাজ করছে। আমরা কোন একদিন হয়তো আন্তঃতারা মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে তারায় তারায় ভ্রমণে যাবো। তবে বাস্তবে সেদিন খুব দূরে অবস্থিত বলেই মনে হয়। হতাশের কারণ নেই, আমি আশা করছি অচিরেই 'কাল্পনিক' স্পেইস শীপে আপনাদেরকে নিয়ে আরোহণ করবো এবং চলে যাবো তারাজগতের পানে এক নভোভ্রমণে! দু'আ করুন। হয়তো এই ভ্রমণ বেশী দূরে নয়।

এবার আসুন, মুহূর্তেই চলে যাই সৌরজগতের আরেকটি গ্রহসদৃশ বস্তু প্লুটোর নিকটে। এখানে গ্রহসদৃশ বলার পেছনে কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা এই ক'বছর পূর্বে প্লুটোকে 'গ্রহ' -এর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন! তারা বলেন, এটি আসলে পূর্ণাঙ্গ গ্রহ হওয়ার মর্যাদা রাখে না। যা হোক এ বিতর্কে আমাদেরকে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের উদ্দেশ্য একে তলিয়ে দেখা- এই যা।

প্লুটোর পাশে

এক সময় প্লুটোই ছিলো সৌরজগতের মধ্যে সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরতম গ্রহ। কিন্তু এখন আর নয়। আমরা ইতোমধ্যে সেডনা নামক গ্রহসদৃশ বস্তুর নিকটে গিয়েছিলাম। এরপর সৌরজগতের অভ্যন্তরের দিকে ভ্রমণ শুরু করে কাইপার বেল্ট নামক এক অঞ্চল পেরিয়ে এসেছি। এখন আমরা প্লুটোর নিকটে। দেখুন অপর পৃষ্ঠার চিত্রটি। এটি অবশ্য কল্পিত।

এখন আমরা প্লুটো সম্পর্কে জানা তথ্যাদি



তুলে ধরছি। প্লুটোর চন্দ্রের সংখ্যা মোট ৩টি। এর মধ্যে ক্যারন হলো চন্দ্রদের মধ্যে প্রধান। এটি অনেকটা প্লুটোর মতোই। তবে আয়তনে প্রায় অর্ধেক মাত্র। অপর দু'টো মূলত **'গ্রেফতারকৃত'** এ্যাস্টারোইড বলেই মনে হয়। এ দু'টো বেশ দূরে অবস্থান করে প্লুটোকে প্রদক্ষিণ করে। আমরা পরে প্লুটো সিস্টেমের সকল বস্তুর জানা তথ্যাদি তুলে ধরবো।

ইতিহাস: প্লুটো ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত হয়। সে-ই থেকে এটি সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসাবে স্বীকৃত ছিলো। কিন্তু গত ২০০৬ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মত পরিবর্তন করেন। তারা বললেন, প্লুটো মূলত একটি বামন গ্রহ (dwarf planet)! অবশ্য অন্য ভাষায় এটি হলো, **প্লানেটইড** (গ্রহসদৃশ)। যাদের দ্বারা এই মত পরিবর্তন সাধিত হয়, তারা হলেন নতুন **'ইন্টারনেশন্যাল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন'** এর সদস্যবৃন্দ। তবে সবাই তাদের সঙ্গে একমত নন। কিছু বিজ্ঞানী এখনো প্লুটোকে নবম গ্রহ হিসাবেই স্বীকৃতি দেন। যা হোক, আগেই বলেছি এই বিতর্কে জড়িত হওয়া আমাদের জন্য আদৌ দরকার নেই।

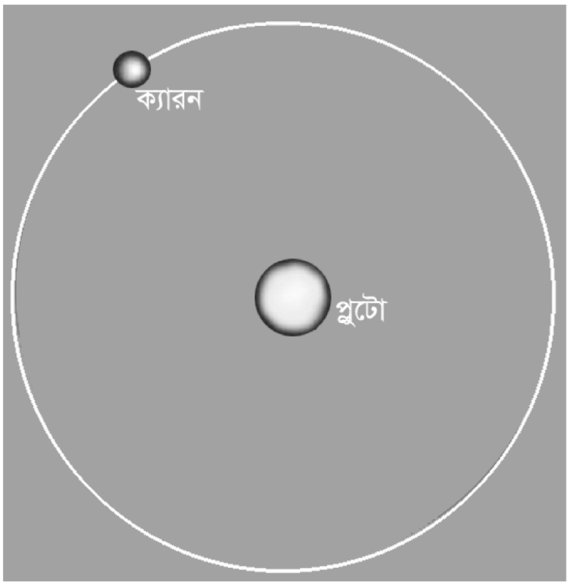
এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি: সূর্যের চতুর্দিকে প্লুটো **২৪৭.৯ পৃথিবী-বৎসরে** একবার ঘুরে আসে। এর গড় দূরত্ব **৫,৮৮০ মিলিয়ন কিমি (৩,৬৫০ মিলিয়ন মাইল)**। তার কক্ষপথ এতোই বক্রাকার যে, সময় সময় সে আগের অষ্টম গ্রহ নেপচুনের কক্ষপথের ভেতর চলে আসে। প্লুটো পৃথিবীর চন্দ্রের তুলনায়ও অনেক ছোট্ট- ব্যাস মাত্র **২,৩৬০ কিমি (১,৪৭৫ মাইল)**। প্লুটোর আহ্নিক গতি মাত্র **৬.৩৮৭ পৃথিবীর দিন**। প্লুটোর মুক্তগতি হলো **১.৬ কিলোমিটার / সেকেন্ড**।

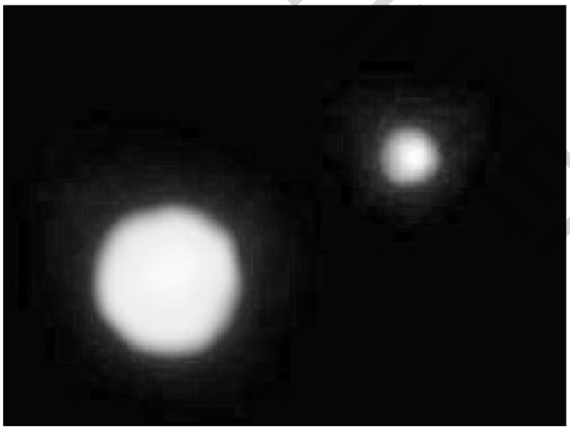
> **মুক্তগতি:** যে কোন এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তু যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির মধ্যাকর্ষণ-জনিত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে প্রাথমিক যে গতির (ভেলোসিটি) প্রয়োজন হয় তাকেই বলে **এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি**। এই গতি অর্জিত না হলে বস্তুর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে বাইরের দিকে ভ্রমণ ইঞ্জিন ছাড়া অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যে কোন উপগ্রহ কিংবা স্পেইস ক্রাফ্ট বস্তুর (অর্থাৎ পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহের উপর থেকে) মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে প্রদক্ষিণপথে পৌঁছতে হলে ঐ বস্তুর ন্যূনতম ০.৭১ গুণ মুক্তগতি (০.৭১*মুক্তগতি) পর্যন্ত গতিশীল হওয়া একান্ত অবশ্যক। এই গতির অর্জিত হলে মহাকাশযানের প্রদক্ষিণ গতিপথ হবে বৃত্তাকার (circular)। গতি এর বেশী হলে প্রদক্ষিণপথ হবে উপবৃত্তিক (elliptical)। মুক্তগতির সমান হলো প্রদক্ষিণপথ হবে অধিবৃত্তিক (parabolic)।

মহাকাশ অভিযান: প্লুটোকে কাছে থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম 'বাস্তব' মহাকাশ অভিযান শুরু হয় ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে। 'নিউ হোরাইজন' নামক একটি মহাকাশযান আমেরিকার 'নাসা' প্লুটোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আগামী ২০১৫ সালে এটি গন্তব্যে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ: এ পর্যন্ত জানা সকল তথ্যাদি পৃথিবীর উপর স্থাপিত ও

মহাকাশে অবস্থানরত **হাবল দূরবীক্ষণযন্ত্র** থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং ২০১৫ সালে যদি নিউ হোরাইজন সফলভাবে তার দীর্ঘ ভ্রমণ সম্পন্ন করে ও প্লুটোর নিকটে যেয়ে ছবিসহ তথ্যাদি প্রেরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে হয়তো অনেক নতুন তথ্য আবিস্কৃত হবে। প্লুটোর সরফেসে আছে নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড ও মিথেইন বরফ। প্লুটোর সারফেস তাপমাত্রা মাত্র ৪১ কেলভিন (-২৩২.১৫ সেলসিয়াস)। ওখানে কেউ 'ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার উপযুক্ত কাপড়' ছাড়া দাঁড়ালে মুহূর্তের মধ্যে বরফের পাথরে পরিণত হবে! নীচে হাবল দূরবীক্ষণযন্ত্রের নেওয়া প্লুটো ও ক্যারনের **'বাস্তব'** একটি ছবি তুলে ধরা হলো।





চন্দ্রঃ প্লুটো একা নয়- তার একাধিক চন্দ্র আছে। এ পর্যন্ত তিনটি নির্দিষ্ট চন্দ্রের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। প্রথমটি বেশ বড়োও। **ক্যারন** নামক এই চন্দ্রটি মাত্র **১৯,৬০০ কিমি (১২,১৮০ মাইল)** দূরে থেকে প্লুটোকে প্রদক্ষিণ করে। এটা **'ঘড়ির কাটার দিকে'** চলে। পৃথিবীর দিনের হিসেবে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে **৬.৪ দিন** মাত্র। তার আহ্নিক গতিও সমান। যার অর্থ, সর্বদা সে একই সাইড প্লুটোর দিকে রাখে। অনেকটা আমাদের চন্দ্রের মতো। এর ব্যাস **১,২০০ কিমি (৭৫০ মাইল)** সাব্যস্ত হয়েছে। আমাদের চন্দ্রের তুলনায় এ ব্যাস মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ক্যারনের কক্ষপথ অনেকটা বৃত্তাকার। উপরের চিত্রটি দেখুন।

ক্যারন কিসব বস্তুর তৈরী তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। ধারণা হলোঃ এতে আছে পানি, বরফ ও পাথর।

প্লুটোর অপর নিকটস্থ চন্দ্রের নাম **নিক্স** (Nix)। হাবল টেলিস্কোপ এটি ২০০৫ সালে আবিষ্কার করে। প্লুটো থেকে **৪৯,০০০ কিমি (৩০,৪০০ মাইল)** দূরে এর কক্ষপথ। নিক্সের উপরিস্থ তাপমাত্রা **৪৯ কেলভিন (-২২৪.১৫ সেলসিয়াস)**। তার আহ্নিক গতি **২৫.৫ পৃথিবীর দিন**। বার্ষিক গতি কিছুটা কম। সিম্যুলেশন প্রোগ্রাম দ্বারা দেখা গেছে নিক্সের এই গতি **প্রায় ২২ দিন**। নিক্সের আকার অনেকটা আলুর মতো। একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব মাত্র ৪৪ কিলোমিটার।

প্লুটোর তৃতীয় চন্দ্রের নাম **হাইড্রা** (hydra)। এটাও ২০০৫ সালে হাবল কর্তৃক আবিস্কৃত হয়। এটা প্লুটো থেকে গড়ে **৬৫,০০০ কিমি (৪০,৩৮০ মাইল)** দূরে থেকে প্রদক্ষিণরত আছে। হাইড্রার উপরিস্থ তাপমাত্রা **৪৭ কেলভিন**

(-২২৬.১৫ সেলসিয়াস)। এ চন্দ্রের আহ্নিক গতি **৩৮.৭ পৃথিবীর দিন** এবং বার্ষিক গতি **প্রায় ৪০ পৃথিবীর দিবস**। হাইড্রার আয়তন (এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত) **৩৬ কিলোমিটার**।

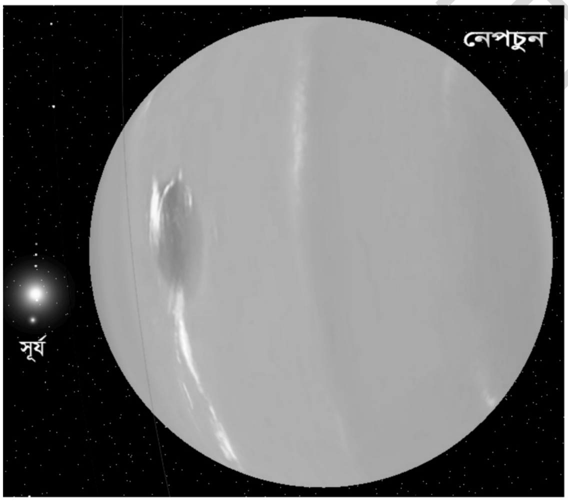
উপরে বর্ণিত প্লুটোর আলুসদৃশ নিক্স ও হাইড্রা চন্দ্রদ্বয় সম্পর্কে আর বেশী কিছু এখনো জানা যায় নি। এগুলো কিসের তৈরী তা-ও নিশ্চিত নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো এ দু'টো উপগ্রহ অনেকটা এ্যাস্টারোইডের মতো। সম্ভবত এগুলো **'গ্রেফতারকৃত'** এ্যাস্টারোইডই হবে। অনেকে আবার বলেন, এগুলো প্লুটোর অংশ। সুদূর অতীতে প্লুটো থেকে তিনটি চন্দ্রই ছিটকে পড়ে। যা হোক, আমরা এ ব্যাপারে আর অতিরিক্ত **'ধারণাভিত্তিক'** বক্তব্য পেশ করতে চাই না। দু'চার বৎসরের মধ্যেই হয়তো সঠিক তথ্য জানা যাবে। এখন ফিরে আসি আমাদের কাল্পনিক ভ্রমণে। আমরা এবার সৌরজগতের অভ্যন্তরের দিকে পুনরায় ছুটে চলে অষ্টম গ্রহ নেপচুনের নিকট চলে যাবো। প্লুটো থেকে নেপচুন **২৮.১৬ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট দূরে**।



৩

গ্যাস দৈত্য নেপচুন

আমরা নেপচুনের কাছে এসে গেছি। কী অপূর্ব নীল এই গ্রহটি! সৌরজগতের মধ্যে এরূপ গাঢ় নীল গ্রহ আর কোনোটিই নয়। আমরা তখনো লক্ষাধিক কিলোমিটার দূরে। নেপচুনকে কিরূপ দেখাচ্ছিল তা নীচের চিত্র থেকে আঁচ করে নিতে পারেন।



প্রাথমিক তথ্যাদি: অষ্টম গ্রহ নেপচুন সূর্য থেকে **৩০ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (৪,৪৯০ মিলিয়ন কিমি- ২,৭৯০ মিলিয়ন মাইল)** দূরে অবস্থিত। এটি সৌরজগতের মধ্যে চতুর্থতম বড় গ্রহ। ব্যাসার্ধ প্রায় **২৫ হাজার কিলোমিটার**। ওজনেও সে কম না। শনি ও জুপিটার পরই তার স্থান। পূর্বে বর্ণিত **'কাইপার বেল্টে'** নেপচুনের মহাকর্ষ বিরাট প্রভাবশীল। তার বিরাটত্ব হেতু বিজ্ঞানীরা একে **'জোবিয়ান'** (জুপিটারের মতো) গ্রহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাকী জোবিয়ান গ্রহ হলো **বৃহস্পতি, শনি** ও **ইউরেনাস**। আমরা অবশ্য এগুলো একে একে ভ্রমণ করবো।

নেপচুন মূলত হিমায়িত পানি, এমোনিয়া ও মিথেইন মহাসাগর-বিশিষ্ট একটি গ্রহ। এর অভ্যন্তর শিলা পাথরের তৈরী। তার বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে পরিপূর্ণ। এছাড়া বায়ুমণ্ডলে মিথেইন গ্যাস থাকায় তার রং হয়েছে নীল-সবুজ।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য: নেপচুনের **১** বৎসর (বার্ষিক গতি) **১৬৫ পৃথিবীর বৎসরের সমান**। অপরদিকে তার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণন (আহ্নিক গতি) অতি দ্রুততর। হিসেব করে দেখা গেছে এ গতি পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেক থেকে একটু বেশী- অর্থাৎ **১৬.১১ ঘণ্টা**। সুতরাং আমাদের একদিন সমান নেপচুনের প্রায় দুই দিন। এত বড়ো গ্রহের জন্য এই গতি সত্যিই খুব দ্রুতময়। এর আলবেদো (দেখুন পরের পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা) হলো **০.৫১-** অর্থাৎ সূর্যের যে সামান্যটুকু আলো সে পায় তার অর্ধেকটা প্রতিবিম্ব করে মহাকাশে আবার ফিরিয়ে দেয়। সে পৃথিবীর তুলনায় মাত্র **৯০০ ভাগের এক ভাগ** আলো সূর্য থেকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের পৃথিবীর তুলনায় তার

আলবেদো (albedo): সূর্য থেকে কোন বস্তুর উপর যেটুকু আলোকরশ্মি পতিত হয় তার মধ্যে কিছুটা আবার মহাকাশে ফিরে যায় আর বাকীটা ঐ বস্তু (গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি) চুষে নেয়। কতটুকু পতিত হলো আর কতটুকু প্রতিবিম্বিত হয়ে মহাকাশে ফিরে গেল তার একটি হিসাবকে বলে আলবেদো। আলবেদো যতো বেশী হবে বস্তু দূর থেকে ততো বেশী উজ্জ্বল দেখাবে।

ভলিউম (আয়তন বা ঘনমান) **৭২ গুণ**। তবে ওজনে মাত্র **১৭.১৫ গুণ বেশী**।

আমাদের কাল্পনিক মহাকাশযান (imaginary spaceship) নেপচুনকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। আমরা খুব আগ্রহভরে গ্রহের বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করলাম। চোখে পড়লো একটি বিরাট কালো দাগ। এছাড়া তাকে প্রদক্ষিণ করছে চারটি রিং। কালো দাগ সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায় নি। এটা অনেকটা বৃহস্পতি গ্রহের বিখ্যাত চোখসদৃশ কালো দাগের মতো। এটা যে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া থেকে সৃষ্ট তা নিশ্চিত। আসলে তা বিরাট ঝঞ্ঝাবায়ু। তবে কোন্ কারণে তা শত শত বৎসর যাবৎ স্থায়ী আছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা মাত্র **৪১ কেলভিন (-২৩২.১৫ সেলসিয়াস)**।

ইতিহাস: পৃথিবীর উপর স্থাপিত দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে নেপচুন আবিস্কৃত হয়। এর পূর্বে সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে আবিস্কৃত বৃহৎ গ্রহ ছিলো ইউরেনাস। নেপচুন আবিষ্কারের আরেক দিক হলো এটির অস্তিত্ব ও অবস্থানের কথা বিজ্ঞানীরা আগেই গণিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তারা দেখতে পেলেন ইউরেনাসের গতিবিধির মধ্যে কিছু **'নড়াচড়া'** দেখাচ্ছিলো যা অন্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব থাকার ইঙ্গিত দেয়। এরপর অঙ্ক কষে সেই তখনো অজানা বস্তুটির সম্ভাব্য অবস্থান নির্ণিত করা হলো। ১৮৪৫ সালে বৃটিশ মহাকাশ বিজ্ঞানী **জন কাউচ এডাম** ও ফ্রান্সের **আরবেই জীন জসেফ লেভেরিয়ে** স্বাধীনভাবে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেন। তাদের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে জার্মান মহাকাশ বিজ্ঞানী **জোহান গটফ্রিড গ্যালে** টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এক বৎসর পর (১৮৪৬ সালে) নেপচুন আবিষ্কার করেন। গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক গল্পের সাগরদেবতা নেপচুনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: পৃথিবী থেকে খালিচোখে নেপচুনকে দেখা মুশকিল। শক্তিশালী একজোড়া দূরবীন যন্ত্রের মাধ্যমেও গ্রহটিকে আপনি মিটিমিটি জ্বলন্ত তারকাসদৃশ দেখবেন মাত্র। বড়ো দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে বেশ উজ্জ্বল নীল-সবুজ একটি বৃত্তের মতো দেখা যায়। তখন তার ব্যাস উর্ধ্বে **২.৩ আর্ক সেকেন্ড** মাত্র।

আর্ক সেকেন্ড (arc second): ডিগ্রী হিসাবে একটি বৃত্তের মধ্যে আছে মোট **৩৬০ ডিগ্রী**। প্রত্যেক ডিগ্রী সমান **৬০ মিনিট**। আর প্রত্যেক মিনিট **সমান ৬০ সেকেন্ড**। আর্ক অর্থ বৃত্তের পরিধিরেখার একটি ছোট্ট অংশ। একটি ক্ষুদ্র কোণিক অংশ হিসাবে মহাকাশে বস্তুর দৃশ্যত বড়ত্ব বুঝাতে এই আর্ক সেকেন্ড মাপটি ব্যবহৃত হয়। **এক আর্ক সেকেন্ড = ১/৩৬০০ ডিগ্রী।**

পৃথিবী থেকে বিরাট দূরত্বে নেপচুনের অবস্থান। এ পর্যন্ত একটি মাত্র মহাকাশযান আমরা গ্রহের নিকটে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছি। সৌরজগতে চারটি বড় আয়তনের গ্রহ আছে: **বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন**।

গেল শতকের শেষ সত্তুর ও আশির দশকে এই চারটি গ্রহ তাঁদের কক্ষপথে ঘুরে বিরল একটি সরলরেখায় অবস্থান নেয়। অর্থাৎ সূর্য থেকে এগুলো একই লাইনে যারতার কক্ষপথে ছিলো। বিজ্ঞানীরা এই বিরল অবস্থানকে গনিমত মনে করে একটি মহাকাশযান একে একে এই চারটে গ্রহ কাছে থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। **ভয়েজার-২ মহাকাশযান** ২০ আগষ্ট ১৯৭৭ ঈসায়ী পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। দীর্ঘদিন ভ্রমণ শেষে এটি প্রথমে বৃহস্পতির নিকট পৌঁছে **১৯৭৯** সালে। এরপর চলতে চলতে **১৯৮১** সালে শনিগ্রহের নিকটে যেয়ে উপস্থিত হয়। তারপর আবার দীর্ঘদিন ভ্রমণ শেষে ইউরেনাসের নিকট **১৯৮৬** সালে যেয়ে পৌঁছে। সবশেষে **১৯৮৯** সালে সে চতুর্থ বড়ো গ্রহ নেপচুনের কাছে যায়। প্রতিটি গ্রহ ভিজিটের সময় **ভয়েজার-২** অনেক ছবিসহ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রেডিও সিগনালের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এ থেকে উক্ত চারটি গ্রহ সম্পর্কে বিরাট এক তথ্যের ভাণ্ডার বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়।

ভয়েজার-২-কে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চগতিতে চলন্ত রাখার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। যানের মধ্যে বৃহস্পতি পর্যন্ত কোনমতে পৌঁছার জ্বালানি মওজুদ ছিলো। আসলে অতিরিক্ত জ্বালানি **ভয়েজার-২**-এ মওজুদ রাখা আদৌ সম্ভব ছিলো না। তবে ক্রাফটের অন-বোর্ড অত্যাধুনিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ন্যাভিগেশন সিস্টেমকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকেই রেডিও সিগনালের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। আমাদের সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ হলো বৃহস্পতি। এর মহাকর্ষ বিরাট। বিজ্ঞানীরা **ভয়েজার-২**-কে সুকৌশলে কক্ষপথে পর্যাপ্ত-সংখ্যকবার প্রদক্ষিণ শেষে গ্রহের মহাকার্ষিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একে শনিগ্রহের দিকে ধাক্কা লাগান! ফলে তার গতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ছুটে চলে শনির দিকে। কী অপূর্ব কৌশল! বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এভাবে গতিশীল করায় **ভয়েজার-২** এর গতি **ঘণ্টায় ৪০ হাজার মাইলে** উন্নীত হয়। বলাই বাহুল্য, এ গতি অর্জন কোন মানবতৈরী যন্ত্রের জন্য একটি রেকর্ড।

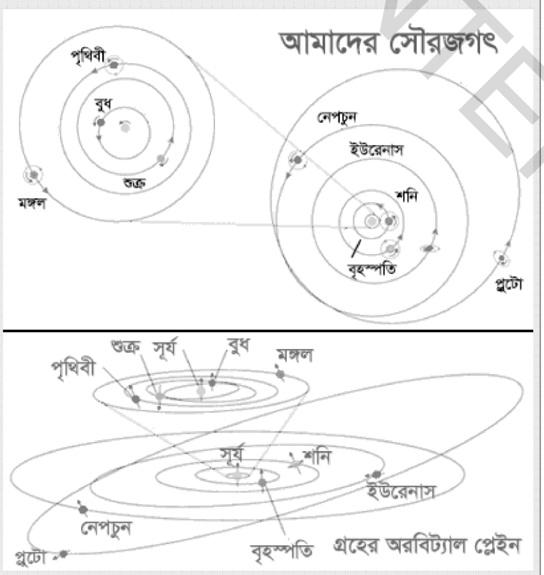
এখানেই শেষ নয়। ধাক্কা দিয়ে শনির নিকট পৌঁছানোর পর একই উপায়ে পুনরায় **ভয়েজার-২**-কে শনির মহাকর্ষ দ্বারা ধাক্কা দিয়ে ইউরেনাসে পাঠানো হয়। সেখান থেকে নেপচুনে পৌঁছাতেও একই কৌশল ক্রিয়াশীল ছিলো। নভোচারী সহযাত্রী! সৌরজগৎ কতো বিরাট, চিন্তার বিষয়। এতো গতিশীল করার পরও নেপচুনে পৌঁছতে ১০ বৎসরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়।

ভয়েজার-২ থেকে নেপচুন ও তার চন্দ্রসমূহ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। নেপচুনের রিং সিস্টেম ও অজানা পাঁচটি চন্দ্র **ভয়েজার-২** আবিষ্কার করে। এর চারটি অকৃত্রিম উপগ্রহ নেপচুনের নিকটবর্তী অবস্থানে থেকে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। আমরা একটু পরই নেপচুনের প্রতিটি চন্দ্রের নিকটে যেয়ে সব তথ্য অনুসন্ধান করে বের করবো!

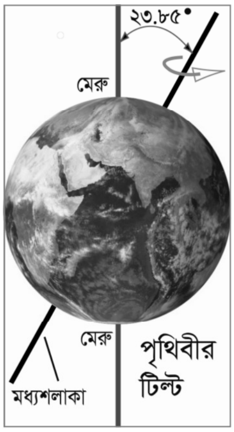
নেপচুনের গতিমতি: আগেই বলেছি, নেপচুন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ত্রিশ গুণ দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। আপনার মনে আছে কি? এক **এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (এইউ)** হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান- অর্থাৎ **৯ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল**। সুতরাং নেপচুন এর ৩০ গুণ দূরে অবস্থিত। আপনি যদি নেপচুনিয়ান হোন (*আসলে হওয়া সম্ভব নয়! বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এতোই কম যে, মুহূর্তের মধ্যে কোন প্রাণী নেপচুনের উপর সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে দাঁড়ালে হিমায়িত বরফখণ্ডে পরিণত হবে!*), তাহলে এক বৎসর অতিবাহিত হতে পৃথিবীর **১৬৫** বৎসর চলে যাবে। কারণ, নেপচুন এতোই দূরে যে, একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে

তার ১৬৫ বৎসর সময় লাগে। তার **অরবিট্যাল প্লেইন** পৃথিবীর অরবিট্যাল প্লেইনের প্রায় সমান। কিন্তু প্লুটোর এ প্লেইন ভিন্ন ও তার কক্ষপথ অতিরিক্ত ডিম্বাকৃতির হওয়ায় সে সময় সময় নেপচুন থেকে নিকটবর্তী হয়।

অরবিট্যাল প্লেইন (orbital plane):
প্রতিটি গ্রহ একেকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই পথে চলার কাঙ্ক্ষিকতার নাম **অরবিট্যাল প্লেইন**। অধিকাংশ গ্রহ প্রায় একই অরবিট্যাল প্লেইনে ঘুরে তবে কোন কোনটির অবস্থান এই প্লেইন থেকে অনেকটা ভিন্ন। নীচের চিত্রটি স্ট্যাডি করলেই অরবিট্যাল প্লেইন বলতে কি বুঝায় তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন।



আমরা ইতোমধ্যে গ্রহের নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণনের কথা বলেছি। প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে এই **'আহ্নিক'** গতি বিদ্যমান। আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই গতি হলো পূর্বদিকে **প্রতি মিনিটে ২৭ কিমি**। তবে এই গতিটি ঠিক পূর্বদিকে স্থিরগতি নয়। বাস্তবে আমাদের পৃথিবী নিজের সঠিক মধ্যশলাকা থেকে **২৩.৪৫ ডিগ্রী কাত** হয়ে ঘুরে। এই কাত হওয়ার নাম হলো **'এক্সিয়্যাল টিল্ট'** (axial tilt) বা **'মধ্যশলাকারিক কাত'**। এই কাত হয়ে ঘূর্ণনের ফলেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মৌসুম বা ঋতু। নীচের চিত্রটি দেখুন।

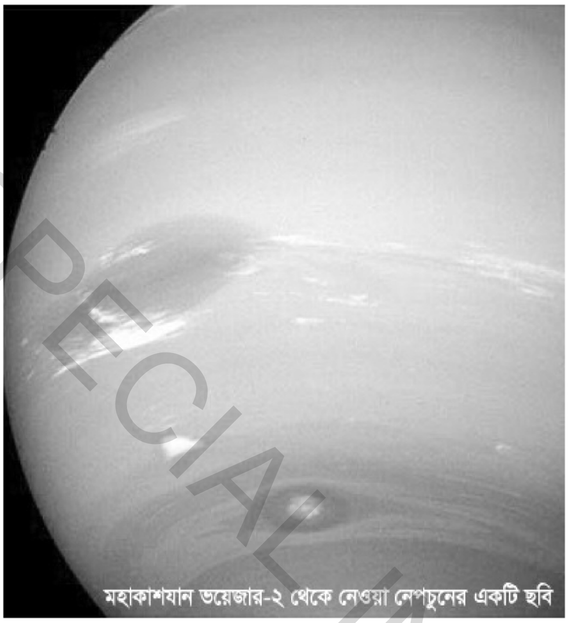


নেপচুনের এক্সিয়্যাল টিল্ট হলো **২৯.৬ ডিগ্রী**। লক্ষ্য করুন, এই টিল্টের পরিমাণ প্রায় পৃথিবীর সমান। ফলে নেপচুন ও পৃথিবীর মৌসুম প্রায় একই ধরনের।

গ্রহের অভ্যন্তর

আমরা নেপচুনে একটি মাত্র মহাকাশযান প্রেরণ করেছি। তবে এটি থেকে তথ্যাদি প্রাপ্ত হয়ে বিজ্ঞানীরা গ্রহের অভ্যন্তর কিসব বস্তু দ্বারা সৃষ্ট তা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বাস্তবে এটি পানি ও শিলা পাথরের তৈরী। তার গাঢ় একটি বায়ুমণ্ডল আছে। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, এই বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অল্প মাত্রায় মিথেইন গ্যাস বিদ্যমান।

নেপচুনের কেন্দ্র শক্ত বস্তুর তৈরী। ধারণা করা হয় তার কৌর (কেন্দ্র) এর আয়তন পৃথিবীর ব্যাসের সমান হবে। যা হলো, **১২,৭৫৬ কিমি (৭,৯২৬ মাইল)**। এই কৌরে কি আছে? বিজ্ঞানীদের ধারণা এতে লৌহ এবং মেগনেসিয়াম সিলিকেইট আছে। কৌর থেকে দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলব্যাপী শুধু মহাসাগর। এর মোট ঘনাঙ্কের অধিকাংশই মূলত এই তরল পদার্থে তৈরী। কিন্তু এই গ্রহব্যাপী ব্যাপ্ত মহাসাগর সাঁতরানোর জন্য তেমন যুৎসই নয়! এই সাগর খুব গরম! **ভয়েজার-২** থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এই মহা-মহাসাগরের তাপমাত্রা **৪৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**


মহাকাশযান ভয়েজার-২ থেকে নেওয়া নেপচুনের একটি ছবি

(৮৫০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট)। এখন প্রশ্ন জাগে এই উত্তপ্ত তরলপদার্থ কেন বাষ্পে পরিণত হচ্ছে না? এর জবাব মিলে আমরা যখন ভাবি, বাষ্প হওয়ার সঙ্গে চাপের সম্পর্ক নিয়ে।

নেপচুনের গভীরে চাপের পরিমাণ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় কয়েক মিলিয়ন গুণ বেশী। আর এই উচ্চ চাপ বস্তুর **মলিকিউলগুলোকে** আরো বেশী এঁটে রেখেছে। তারা একটা আরেকটা থেকে অনেকটা নিকটে। ফলে উচ্চ তাপ সত্ত্বেও এগুলো চতুর্দিকে ছুটোছুটি করে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে না।

মলিকিউল: সব বস্তু এটমের তৈরী। একাধিক এটম মিলে তৈরী হয় বস্তুর **মলিকিউল**। যেমন পানির মলিকিউলে আছে দু'টি **হাইড্রোজেন এটম** ও একটি **অক্সিজেন এটম** (নীচের চিত্র দ্র:)। এই তিনটি এটম একত্রে **'বন্ড'** (শক্তভাবে যুক্ত থেকে) তৈরী করেছে পানি।



বায়ুমণ্ডল

আগেই বলেছি, নেপচুনের গ্যাসসর্বস্ব বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ৩% মিথেইন। ইতোমধ্যে বর্ণিত মহা-মহাসাগরের উপর থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বে **৫,০০০ কিমি (৩,০০০ মাইল)** পর্যন্ত বিস্তৃত আছে এই বায়ুমণ্ডল। এই গাঢ় বায়ুমণ্ডল থেকে সূর্যের আলো নীল রংয়ে প্রতিবিম্ব হয় কেন? জবাব হলো, এই বায়ুমণ্ডলে থাকা মিথেইন গ্যাস লাল ও কমলা রং চুষে নেয়, কিন্তু নীল রং চতুর্দিকে ছিটিয়ে ফেলে। ১৯৯৮ সালে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান দ্বারা জানতে পেরেছেন নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে 'methyl' (**উচ্চারণ, মেথ্ল**) নামক একটি গ্যাসের মলিকিউল বিদ্যমান। এই মলিকিউলে আছে একটি কার্বন এটম এবং তিনটি হাইড্রোজেন এটম। এসব মলিকিউল খুব প্রতিক্রিয়াশীল। এরা একে অন্যের সঙ্গে মিলে 'ethane' (**উচ্চারণ, এথেন**) নামক আরেকটি রংহীন, জ্বালানি গ্যাস সৃষ্টি করে। এই রিয়েকশনারী মেথ্ল মলিকিউলকে বলে **'হাইড্রোকার্বন রেডিকেল'** (hydrocarbon radicals)। এর অর্থ এগুলো অল্পকাল স্থায়ী থাকা। কেমিক্যাল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উপরোক্ত জ্বালানি গ্যাস, **এথেন** তৈরী করে। সূর্যের গ্রহ-পরিবারের মধ্যে বাইরে অবস্থানরত একটি গ্রহে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মলিকিউল ছিলো বলে ইতোমধ্যে কেউ জানতেন না। এই **মেথ্ল** কোত্থেকে সৃষ্টি হয়? কারণ এগুলো তাড়াতাড়ি অন্য গ্যাস অর্থাৎ **এথেনে** পরিণত হয়ে যায়, অথচ বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ কমে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, নিশ্চয় নেপচুনের অভ্যন্তরে বিরাট বিরাট **ঝঞ্ঝাবায়ু** বা **ঝড়-তুফান** সংঘটিত হচ্ছে। এ থেকে সৃষ্ট **মেথ্ল** পুরো বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। যখন এই উচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল মলিকিউল ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে এসে পৌঁছে যায়, তখন সূর্যের এনার্জি এদেরকে ভেঙ্গে

পরিণত করে **এথেন** গ্যাসে।

নেপচুনের মিথেইন গ্যাস স্তরের নিম্নস্থ বায়ুমণ্ডলে সাগর লেবেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় চাপের মাত্রা পাঁচ গুণ থেকেও বেশী। ফলে সেখানে হয়তো বিরাজ করছে **হাইড্রোজেন সলফাইড-এর** (hydrogen sulfide - পঁচা গন্ধযুক্ত একটি বিষাক্ত গ্যাস) একটি গাঢ় স্তর।

এটা জানা গেছে, নেপচুন যে পরিমাণ তাপশক্তি বাইর থেকে প্রাপ্ত হয় তার **২.৭ গুণ** আবার বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত করে! এই অতিরিক্ত এনার্জি সে কোত্থেকে পেল? অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ কেউ মনে করেন, অতীতে নেপচুনকে এ্যাস্টারোইড ও গ্রহসদৃশ **ধূমকেতু** বম্বার্ডমেন্ট করেছে। বায়ুমণ্ডলে পতিত এসব বস্তু ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যায়। নেপচুনের প্রভাবশীল মহাকর্ষ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকে এখনও টেনে তার কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরো গ্রহব্যাপী সৃষ্টি হচ্ছে **ঘর্ষণজনিত এনার্জি**। আর এই এনার্জিই তাপ আকারে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে। জানা গেছে, নেপচুনের কৌর (কেন্দ্রস্থল) সূর্যের উপরস্থ তাপমাত্রার চেয়েও উত্তপ্ত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেখানকার তাপমাত্রা **৫১৪৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৯,৩০০ ফারেনহাইট)**।

যা হোক, গ্রহ নেপচুনের বায়ুমণ্ডল যে অত্যন্ত সক্রিয় তা নিশ্চিত। গ্রহের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসা তাপ এনার্জির ফলে এতে সৃষ্টি হয় বিরাট বিরাট শক্তিশালী ঝড়-ঝঞ্ঝা। গ্রহের বিষুবরেখা থেকেও মেরু অঞ্চলের উপর বাতাসের গতি বেশী। সৌরজগতের একটি রেকর্ড এককভাবে নেপচুনের অধিকারে। এটি হলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তুফান। নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে সময় সময় ঝড়ের গতি **২,০০০ কিমি (১,২০০ মাইল)** এর কোঠায় গিয়ে ঠেকে!

উপরে বর্ণিত উচ্চগতিশীল বাতাসের স্বরূপ হাবল মহাকাশ দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা 'দেখা যায়'। একেক তুফান গ্রহের বায়ুমণ্ডলের হাজার হাজার মাইলব্যাপী বিস্তৃত হতেও দেখা গেছে। এই তুফানের চিহ্ন হলো ছোটবড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দাগ যা কোটি কোটি মাইল দূর থেকেও দেখা যায়। এসব দাগের মধ্যে একটি হলো 'বড় অন্ধকার দাগ'। **ভয়েজার-২** মহাকাশযান এই দাগটির ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে ১৯৮৯ সালের মে মাসে। নীচের ছবিটি হলো সে-ই ছবি।


ভয়েজার-২ থেকে নেওয়া নেপচুনের কালো দাগ

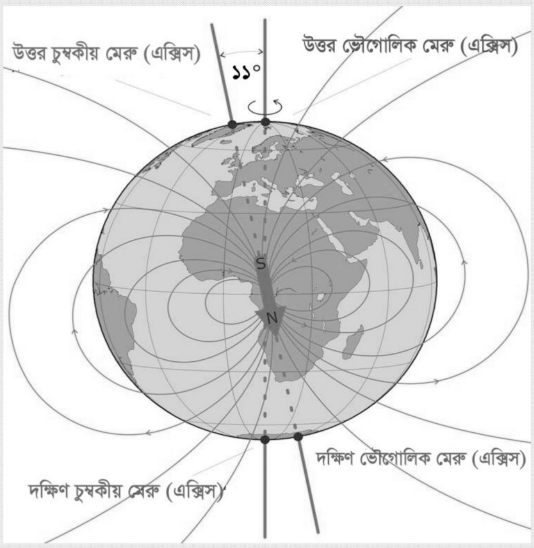
উক্ত অন্ধকার দাগটির আয়তন আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় সমান। কিন্তু এই দাগ বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। ১৯৯৪ সালে হাবল টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত ছবি প্রমাণ করেছে এই দাগ মিটে গেছে। কিন্তু কারণ কি? অনেকের ধারণা দু'টি অবস্থার যে কোনটি ঘটেছে: হয় সেই বিরাট ঝড়ের অবসান হয়েছে না হয় এর উপর বায়ুমণ্ডলের খুব ঘন কোন পর্দা পড়েছে। তবে উভয়টি থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায়, নেপচুনের

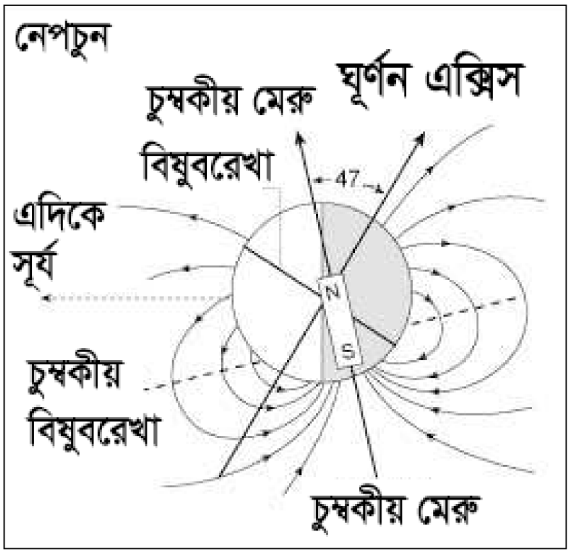
আবহাওয়া খুব দ্রুত রদবদল হয়। যা হোক, আমরা এ পর্যন্ত জানা তথ্যাদির উপর নির্ভর করে নেপচুনের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করলাম। এবার তলিয়ে দেখা যাক, গ্রহের ম্যাগনেটিক (চুম্বকীয়) ফিল্ড কিরূপ।

নেপচুনের চুম্বকীয় ফিল্ড

পৃথিবীর চুম্বকীয় ফিল্ডের মতো নেপচুনেরও অনুরূপ একটি ফিল্ড আছে। চতুর্দিকে বেশ দূর-মহাকাশ পর্যন্ত এই ফিল্ডের প্রভাব বিদ্যমান। গ্রহের কৌর বা কেন্দ্রস্থল থেকে ধীর গতিতে তাপশক্তি বেরিয়ে আসছে। এতে সৃষ্টি হয় নেপচুনের গভীর মহাসাগরে বৈদ্যুতিকভাবে চার্জ হওয়া অসংখ্য কণা। এসব কণা চলন্ত আছে। আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় চুম্বকীয় ফিল্ড। নেপচুনের **'চুম্বকীয় এক্সিস'** থেকে ভূতাত্ত্বিক মেরু ৪৭ ডিগ্রী কোণে স্থাপিত। চুম্বকীয় ফিল্ডের প্রভাব গ্রহের উপরিভাগ থেকে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার ঊর্ধ্ব পর্যন্ত সক্রিয়।

চুম্বকীয় মেরু [এক্সিস] (magnetic pole or axis): গ্রহের চুম্বকীয় ফিল্ডের গতিপথের লাইন যেদিকে চলে সেটাই হলো তার চুম্বকীয় এক্সিস (নীচের চিত্র দেখুন)।





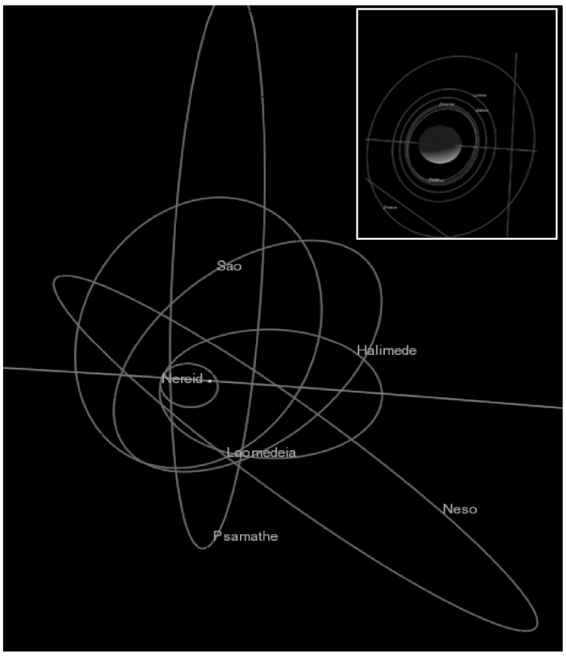
নেপচুনের রিং ও একঝাঁক চন্দ্র

আমাদের সৌরজগতে রিংসর্বস্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি প্রখ্যাত গ্রহ আছে। এটির নাম শনি। আমরা অচিরেই তার নিকটে যাবো। নভোচারী ভাই-বোনেরা, শনিগ্রহের এ ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চয় আপনারা জ্ঞাত। তবে অন্যান্য গ্রহেরও অনুরূপ রিং থাকতে পারে- তা বেশ পরে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন। পৃথিবীকেন্দ্রিক কোন টেলিস্কোপে কিন্তু এ ধরনের রিং দেখা যায় নি। সুতরাং সবাই ধরে নিয়েছিলেন, রিং সিস্টেম একমাত্র শনিগ্রহেরই বৈশিষ্ট্য। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ কথাটি গ্রহণযোগ্য ছিলো। এ বৎসর যখন **ভয়েজার-২ মহাকাশযান** নেপচুনের নিকট পৌঁছল তখন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নেপচুনের ছবিগুলো দেখে অবাক হলেন। নেপচুনেরও রিং আছে বলে সুস্পষ্ট দেখাচ্ছিল ওসব ছবিতে। আর এক-দু'টো নয়, নেপচুনের সর্বমোট চারটে রিং আছে। এগুলো প্রস্থে **১৫ কিমি (৯.৩ মাইল)** থেকে **৫,৪০০ কিমি (৩,৬০০ মাইল) পর্যন্ত** চওড়া। প্রতিটি রিং নেপচুনকে পুরোদমে প্রদক্ষিণ করছে।

পৃথিবী থেকে সরাসরি দৃশ্যমান দু'টি চন্দ্রের খবর আমরা আগে থেকেই জানতাম। নেপচুনের এ দু'টো বড় আয়তনের চন্দ্রের নাম **ট্রাইটন** ও

নিরিদ। ট্রাইটন **১৮৪৬** খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন বৃটিশ মহাকাশবিজ্ঞানী **উইলিয়াম লাসেল**। নিরিদ ডাচ বংশোদ্ভুত বিজ্ঞানী **জেরার্ড কাইপার** আবিষ্কার করেন **১৯৪৯** সালে। এরপর **১৯৮১** সালে **লারিসা** নামক আরেকটি চন্দ্র আবিস্কৃত হয়। তবে এটি দূরবীক্ষণযন্ত্রে ধরা দেয় নি। **লারিসার** অস্তিত্ব মিললো যখন সে ঘুরে ঘুরে দূরবর্তী একটি তারার সামনে এসে পড়ে। সুতরাং **ভয়েজার-২ মহাকাশযান** নেপচুনের নিকট দিয়ে উড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাত্র তিনটি চন্দ্রের কথা আমার নিশ্চিতভাবে জানতাম। **ভয়েজার-২** আরো পাঁচটি চন্দ্র আবিষ্কার করলো। এরপর ২০০৩ ও ২০০৪ সালে যথাক্রমে তিনটি করে নতুন চাঁদ পৃথিবীকেন্দ্রিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়। এ নিয়ে নেপচুনের অকৃত্রিম উপগ্রহের সংখ্যা দাঁড়ালো **১৩**টি।

আমাদের এই ভ্রমণের সহায়ক সিম্যুলেশন প্রোগ্রাম **'সেলেস্টিয়া'** থেকে জানা যায়, নেপচুনের চতুর্দিকে আরো বহু ছোট-বড় উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। নীচে এসব বস্তুর প্রদক্ষিণপথের একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন কোন



কোন উপগ্রহের প্রদক্ষিণপথ এতো বেশী ডিম্বাকৃতির যে, এরা সময় সময় গ্রহ থেকে মহাকাশে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণে চলে যায়।

নেপচুনের সবক'টি উপগ্রহে আমরা ভিজিট করবো না। তবে বড়ো আয়তনের ক'টির উপর জানা তথ্যাদি নিয়ে কিছুটা আলোচনা খুব একটা নিষ্ফল হবে না। সুতরাং আসুন, তলিয়ে দেখি নেপচুনের ওসব **নেচারেল স্যাটেলাইট**।

ভেতরের ৬টি চন্দ্র

নেইয়াদ: নেপচুনের নিকটতম চন্দ্র। মাত্র **৪৮, ২০০ কিমি (২৮,৯০০) মাইল** দূরে থেকে সে প্রদক্ষিণ করে। একবার মাদার-গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে সময় নেয় মাত্র **৭ ঘণ্টা**। নেপচুনের বিষুবরেখা বরাবর থেকে সে প্রায় বৃত্তাকার প্রদক্ষিণপথে চলে। **নেইয়াদ** মূলত আলুর মতো একটি বস্তু। তার গড় ব্যাস মাত্র **৫৮ কিমি (৩৫ মাইল)**। আমাদের চন্দ্রের (পৃথিবীর একমাত্র চাঁদ) উপর এমন বড় কিছু গর্ত আছে যার ভেতর নেইয়াদকে সহজেই ফিট করা যাবে। যা হোক, আমরা এ চেষ্টায় যাবো না! এই ছোট্ট চন্দ্র সম্পর্কে আমরা আর বেশী অতিরিক্ত বলতে অপারগ। শুধু এটুকু: সে ও তার বোন **তালাসা** এবং **ডেসপিনা** মিলে নেপচুনের রিংগুলোর পাহারা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই তিনটি চন্দ্রের মহাকর্ষ রিংগুলোকে আটকে রেখেছে। **'পাহারাদার কুকুর'** হিসাবে নেইয়াদ নেতার কাজে নিয়োজিত- তাই এর অপর নাম হয়েছে, **শেপার্ড** - অর্থাৎ **মেষপালক**। চন্দ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা **৫১ কেলভিন (-২২২.১৫ সেলসিয়াস)**।

ভয়েজার-২ নেপচুন ছেড়ে সৌরজগতের বাইরের বিরাট অন্ধকার আন্তঃতারা মহাকাশের দিকে পাড়ি জমাবার পূর্বমুহূর্তে এই চন্দ্রটি আবিষ্কার করে **১৯৮৯** সালে।

তালাসাঃ চন্দ্র তালাসার অবস্থান নেইয়াদের পরই। এটিও একটি ছোট্ট আয়তনের বস্তু। আলুর মতো এই চাঁদের গড় ব্যাস **৮০ কিমি (৪৮ মাইল)**। এটাও পৃথিবীর চন্দ্রের মধ্যম আয়তনের একটি গর্তে সহজেই ঢুকে যাবে। তালাসার প্রদক্ষিণপথ অনেকটা বৃত্তাকার। সে নেপচুন থেকে **৫০,০০০ কিমি (৩০,০০০ মাইল) দূরে থেকে প্রতি ৭.৫ ঘণ্টায়** একবার নিজের মা-গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। এটাও নেপচুনের বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত। তার বোন নেইয়াদের মতো সে-ও নেপচুনের রিং সিস্টেমের অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে **'শেপার্ডের'** কাজে নিয়োজিত আছে। এটাও **ভয়েজার-২** বিদায়ক্ষণে আবিষ্কার করে **১৯৮৯** সনে।

ডেসপিনাঃ তৃতীয় চন্দ্র ডেসপিনাও **শেপার্ডের** কাজে নিয়োজিত আছে। নেপচুন থেকে তার দূরত্ব **৫২,৫০০ কিমি (৩২,৬০০ মাইল)**। প্রতি ৮ ঘণ্টায় সে তার প্রভাবশীল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। আগে বর্ণিত দু'টোর মতো এই চাঁদটিও নেপচুনের বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত। তার প্রদক্ষিণপথও প্রায় বৃত্তাকার। এটিও আলুর মতো আকারবিশিষ্ট। তার গড় ব্যাস ১৫৪ কিমি (৯৬ মাইল)। নেইয়াদ, তালাসা এবং এই ডেসপিনা মূলত আমাদের চাঁদের মতো বায়ুমণ্ডলহীন, নির্জীব চন্দ্র। এটাও **ভয়েজার-২** এর বিদায়কালীন আবিষ্কার।

গ্যালাটিয়াঃ নেপচুনের চতুর্থ এই চন্দ্রটিও **ভয়েজার-২** এর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। সে যাবার আগে এই উপগ্রহের ছবি রেখে যায় ১৯৮৯ সালে। নেপচুন থেকে গ্যালাটিয়া **৬২,০০০ কিমি (৩৮, ৫০০ মাইল) দূরে থেকে প্রতি ১০.২৯ ঘণ্টায়** নেপচুনকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তার প্রদক্ষিণপথ অনেকটা বৃত্তাকার এবং সে অবস্থান করে গ্রহের বিষুবরেখা বরাবর। তার সারফেস তাপমাত্রা মাত্র **৫১ কেলভিন (-২১৫ সেলসিয়াস)**। আলুর মতো আকারের এই চন্দ্রটির গড় ব্যাস **১৮০ কিমি (১০৮ মাইল)**। এতে না আছে বায়ুমণ্ডল আর না কোন জিওলজিক্যাল ক্রিয়ার অস্তিত্ব। আমরা খুব একটা এই চন্দ্র সম্পর্কে এখনো অবগত হই নি। সুতরাং এবার পরবর্তী চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়া যায়।

লারিসাঃ নেপচুনের অভ্যন্তরীণ প্রদক্ষিণপথে ঘূর্ণমান পঞ্চম চন্দ্র এটি। আলুর মতো দেখতে এই চন্দ্রটির গড় ব্যাস **১০০ কিমি (৬২ মাইল)**। লারিসা তার মা-গ্রহ নেপচুনকে **১৩.৩ ঘণ্টায়** একবার প্রদক্ষিণ করে। নেপচুন থেকে লারিসার দূরত্ব **৭৫,০০০ কিমি (৪৭,০০০ মাইল)**। এটাও বায়ুমণ্ডলহীন একটি নির্জীব চন্দ্র। **ভয়েজার-২** এটিও যাবার সময় আবিষ্কার করেছিল।

প্রটিউসঃ ৪৩৬ কিমি (২৬২ মাইল) ব্যাসবিশিষ্ট এই বড়ো চন্দ্রটি নেপচুনের ষষ্ঠ অভ্যন্তরীণ উপগ্রহ। সে নেপচুন থেকে **১,১৮,০০০ কিমি (৭০,৬০০ মাইল)** দূরে থেকে প্রতি **২৭** ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ কাজ সমাপ্ত করে। তার প্রদক্ষিণপথ বৃত্তাকার। নেপচুনের বিষুবরেখার ঊর্ধ্বে সে হলো ষষ্ঠ উপগ্রহ। উপরে বর্ণিত সবগুলো উপগ্রহও অনুরূপ কক্ষপথে ঘূর্ণমান। প্রটিউসের আয়তন আমাদের চন্দ্রের তুলনায় নয় ভাগের এক ভাগ। নেপচুনের সকল জানা চন্দ্রের মধ্যে এটি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। প্রথম স্থানে আছে **ট্রাইটন**। আমরা একটু পরই তাকে নিয়ে কথা বলবো। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো বেশ বড়ো হওয়া সত্ত্বেও প্রটিউস দেখতে আলোর মতো। সমগ্র সৌরজগতে অসংখ্য চন্দ্র আছে। আমরা এ ব্যাপারে আরো অবগত হবো অভ্যন্তরের দিকে আমাদের এই ভ্রমণকালে। প্রটিউস দেখতে আলুর মতো হওয়াটা কেমন যেনো অদ্ভুত মনে হয়। কারণ, এরূপ বড় আয়তনের অন্য কোন

চন্দ্র পাওয়া যায় নি যার আয়তন অনুরূপ। বড়ো আয়তনের চন্দ্র সাধারণত আমাদের চাঁদের মতো **'গোলক'** (বা বলের) আকারের হয়ে থাকে। কিন্তু একে দেখতে অনেকটা শনিগ্রহের দূরের চন্দ্র **'ফিবি'**র মতো লাগে। তার দেহটি **'পতিত বস্তু'** দ্বারা গর্তপূর্ণ। যেমনটি আমাদের চন্দ্রও। ঠিক ফিবির মতো প্রটিউসও মোট প্রাপ্ত আলোকরশ্মির ৬ শতাংশ প্রতিবিম্ব করে। উভয় চন্দ্রের আয়তন ও গঠন পরীক্ষা করে কোন কোন বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, একদা এরা সৌরজগতের কোন এক স্থানে একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল। পরে একটিকে গ্রেফতার করেছে শনি আর অপরটিকে নেপচুন। তবে এটা থিওরী মাত্র। এর সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। আর শুধু থিওরীর উপর বেশী বলার অভ্যেস থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখতে ভালোবাসি।

এই উপগ্রহটির অস্তিত্বও **ভয়েজার-২** মহাকাশযানের কীর্তি। সে চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ছবি প্রেরণ করে পৃথিবীতে। ছবিটি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রটিউস আবিষ্কার করেন।

বাইরের কয়েকটি চন্দ্র

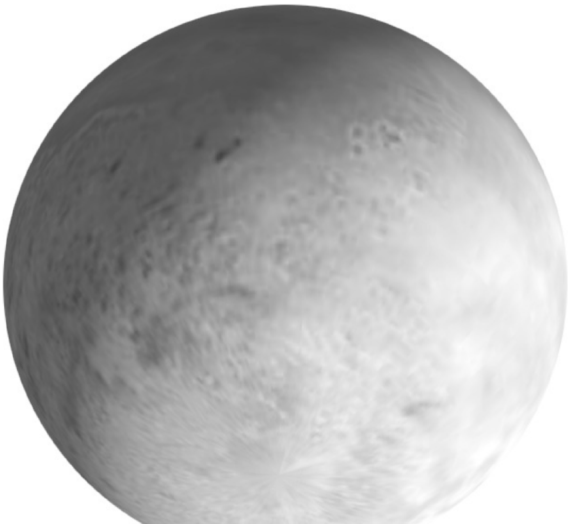
সর্ববৃহৎ চন্দ্র ট্রাইটন: এই উপগ্রহটি নেপচুন থেকে বাইরের দিকে সপ্তম স্থানে অবস্থিত। এটা গড়ে **৩,৫৪,৮০০ কিমি (২,২০,৪০০ মাইল)** দূরে থেকে নেপচুনকে প্রতি **৫.৮৭৭ দিনে** একবার প্রদক্ষিণ করে। তার নিজস্ব ঘূর্ণন গতিও সমান। এর অর্থ হলো সে তার একটি অর্ধগোলক সর্বদা নেপচুনের দিকে রাখে। ট্রাইটনের ব্যাসার্ধ (অর্থাৎ সেন্টার পয়েন্ট থেকে বাইর পর্যন্ত দূরত্ব) হলো **১,৩৫৩ কিমি (৮৪১ মাইল)**। সুতরাং সৌরজগতের সকল উপগ্রহের মধ্যে দশটি বড়ো উপগ্রহের একটি হলো ট্রাইটন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চন্দ্রটির এক-চতুর্থাংশ বরফ ও অপর তিন-চতুর্থাংশ শিলা পাথরের তৈরী। নেপচুনের দক্ষিণ মেরুর উপর থেকে দৃশ্যমান হলে এটির গতিপথ হবে ডানে বা ঘড়ির কাটার দিকে। কিন্তু নেপচুন তার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ তার আহ্নিক গতিপথে) ঘুরে উল্টো দিকে- তথা ঘড়ির কাটার বিপরীতে।

এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে জেনে নিলে ভালো হয়। সমগ্র সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ যখন সূর্যের দক্ষিণ মেরু বরাবর ঊর্ধ্বে উঠে পর্যবেক্ষণ করবো তখন এগুলোর বার্ষিক ও আহ্নিক গতি কোন দিকে বলে দেখাবে? এটা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যে, প্রতিটি গ্রহের আহ্নিক গতি একই দিকে। সুতরাং আমরা দেখবো সবগুলো গ্রহ ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে ঘুরছে। একই সঙ্গে দেখা যাবে অধিকাংশ গ্রহের আহ্নিক গতিও সেই একই দিকে। এ ব্যাপারটি প্রায় সকল বড়ো আয়তনের উপগ্রহের ক্ষেত্রেও সত্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৌরজগৎ সৃষ্টির সময় সবগুলো গ্রহ এবং বড়ো চন্দ্র একত্রে সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে একই দিকে গতিরও সৃষ্টি হয়। এ কথাটি বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত থিওরী মাত্র। সুতরাং এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা আর সমুচিত হবে না।

যা হোক, ফিরে আসি ট্রাইটনে। আমাদের উদ্দেশ্য, এর বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থার উপর তথ্যানুসন্ধান। ট্রাইটনের উপরে অনেক **আগ্নেয়গিরি** আছে। কোন কেন আগ্নেয়গিরির আয়তন **২০০ কিলোমিটার (১২০ মাইল)** পর্যন্ত চওড়া। এর উত্তরগোলার্ধে গোলাপী রংয়ের বরফ দেখতে পাওয়া যায়। পুরো বরফ-টুপির চতুর্দিকে আবার নীল রংয়ের রেখা বিদ্যমান। এতে বুঝা যায়, গোলাপী রং ধারণ করেছে হিমায়িত বরফে সূর্যের আলো পতিত হওয়ায়। আর নীল রেখা ইঙ্গিত করে নাইট্রোজেনের তৈরী নতুনভাবে সৃষ্ট বরফ।

ট্রাইটনের পাতলা একটি বায়ুমণ্ডলও আছে।

এতে হিমায়িত নাইট্রোজেন মেঘমালা হিসাবে **৫ থেকে ১০ কিমি (৩ থেকে ৬ মাইল)** ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিচরণরত। একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, ১৯৮৯ সালের পর থেকে ট্রাইটনের উপরিস্থ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। তখন ছিলো **-২৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** আর এখন তা বেড়ে **-২৩৩ ডিগ্রীতে** পৌঁছেছে। যদিও মাত্র দুই ডিগ্রী, তথাপি তাপমাত্রা বাড়ায় এটাই ইঙ্গিত করে যে, ট্রাইটন খুব ধীরে ধীরে হিমায়িত নাইট্রোজেনকে বাষ্পে পরিণত করছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ঘন থেকে ঘন বায়ুমণ্ডল। এ ব্যাপারটি বুঝাতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা একটি থিওরী তুলে ধরেছেন। আগেই বলেছি, থিওরী নিয়ে বেশী বলার অভ্যেস আমার নেই। সুতরাং শুধুমাত্র এটাই বলছি, এই থিওরী মতে ট্রাইটন দু'শ বৎসর অন্তর অন্তর এভাবে তার বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ এবং আবার ঠাণ্ডা করে। এর কারণ হলো, এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন সে তার উত্তর গোলার্ধ সরাসরি সূর্যের দিকে স্থির রাখে। এতে ধীর গতিতে **'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'** ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। এ ব্যাপারে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। নীচে ট্রাইটনের একটি ছবি নীচে তুলে ধরছি।



অষ্টম উপগ্রহ নিরিদ: এই চন্দ্রটিও বেশ বড়ো। সে নেপচুন থেকে **৫.৫১ মিলিয়ন কিমি (৩.৩৩ মিলিয়ন মাইল - ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার**



মাইল) দূরে থেকে প্রতি **৩৬০ পৃথিবী-দিনে** একবার প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ নিরিদের এক বৎসর সমান পৃথিবীর ৩৬০ দিন। বাইরের দিকে ঘূর্ণমান চন্দ্র ট্রাইটন ও নিরিদের মধ্যে মাঝখানে বিরাট বড়ো শূন্যস্থান বিদ্যমান। ট্রাইটন থেকে নিরিদের দূরত্ব **১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার কিলোমিটার**। উভয় চন্দ্রের মধ্যখানে আর কোন উপগ্রহ নেই। নিরিদ তার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে **১১.৫২ ঘণ্টায়** একবার ঘুরে আসে। সুতরাং নিরিদের একদিন আমাদের তুলনায় প্রায় অর্ধদিবস। নিরিদ এ পর্যন্ত জানা সৌরজগতের যাবতীয় চন্দ্রের প্রদক্ষিণপথের ক্ষেত্রে একটি একক স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তার এই কক্ষপথ সর্বাপেক্ষা বেশী **'ডিম্বাকৃতির'**। অন্য কোন চন্দ্রই এতো বেশী ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে ঘুরে না। সে যখন নেপচুনের নিকটবর্তী হয় তখন তার দূরত্ব **১৩ লক্ষ ৫**

পতন-গর্ত (impact crater): সৌরজগতের দীর্ঘ ইতিহাসে সময় সময় মহাকাশ থেকে আগত দ্রুত গতিশীল বস্তু গ্রহ-উপগ্রহের উপর পতিত হয়েছে। সৌরজগত সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে দীর্ঘদিন এসব পড়ন্ত বস্তুর মাত্রা ও বড়ত্ব বেশী ছিলো। এসব বস্তু যখন গ্রহ বা চন্দ্রের উপর পতিত হয় তখন বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে। সৃষ্টি করে ছোট-বড় গর্ত। ইম্পেক্ট ক্রেটার বা পতন-গর্ত এগুলোকেই বলে। আমাদের চন্দ্রে এরূপ অসংখ্য গর্ত আছে।



চন্দ্রের উপর অসংখ্য 'পতিত গর্ত'

হাজার মাইল- আবার যখন দূরবর্তী অবস্থানে যায় তখন সে নেপচুন থেকে **৯৬ লক্ষ ২৪ হাজার মাইল** সরে দূরে পড়ে। নিরিদের কক্ষপথ নেপচুনের বিষুবরেখা থেকে **২৮ ডিগ্রী** কাত আছে। সে অনেকটা গোলাকার বলের মতো। ব্যাস প্রায় **৩৪০ কিমি (২০৪ মাইল)**। সুতরাং নিরিদ আমাদের চন্দ্রের তুলনায় ১০ ভাগের এক ভাগ হবে।

নিরিদ সম্পর্কে আমরা আর খুব বেশী জানি না। **ভয়েজার-২** এই চন্দ্র থেকে **৪৭ লক্ষ কিমি (২৯ লক্ষ মাইল)** দূরে অবস্থান নিয়ে ছবি পাঠিয়েছে। এতে দেখা যায় চন্দ্রের উপরে অনেক **'পতন গর্ত'** বিদ্যমান।

চন্দ্র হালিমিড: এটি নেপচুনের নবম নেচারেল উপগ্রহ। এ গ্রহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা অতি অল্প জানতে পেরেছি। এটি দেখতে অনেকটা আলুর মতো। নেপচুন থেকে এর সর্বোচ্চ দূরত্ব **০.১৬ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (১,৪৮,৭২,৯২৯ মাইল)** পর্যন্ত হয়। আবার যখন সে নেপচুনের কাছে আসে তখন সে মাত্র **৬৭,৯৩,৬০০ মাইল** দূরে থাকে। ধারণা করা হয়, হালিমিডের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দূরত্ব মাত্র **২৪ কিমি** হবে। তার আহ্নিক গতি মাত্র **১০ ঘণ্টা**। সে **৫ বৎসর ২ মাসে** একবার নেপচুনের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। আমরা যেহেতু এই চন্দ্র সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানি না, তাই চলুন পরবর্তী চন্দ্রটির নিকটে যাই।

সাও (Sao): এ উপগ্রহ নেপচুনের দশম চাঁদ। সে প্রতি **১০ ঘণ্টায়** একবার নিজে নিজে ঘুরে। আর নেপচুনকে প্রদক্ষিণকালে **০.১৯৩ এইউ (১,৭৯,৪০,৪৭০ মাইল)** দূরে সরে যায়। আরাব নিকটতম অবস্থানে তার দূরত্ব হয় **০.১০৫৯৬ এইউ (৯৮,৪৯,৫৯৭ মাইল)**। সাও দেখতে আলুর মতো। এটা সম্ভবত **'গ্রেফতারকৃত'** কোন **এ্যাস্টারোইড** হবে। সাও সম্পর্কে আর যা বলার তাহলো তার আনুমানিক আয়তন। ধারণা করা হয় এক প্রাপ্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব **২৪ কিলোমিটারের (১৫ মাইলের)** বেশী হবে না।

লাওমিদিয়া (laomedeia): এটি হলো নেপচুনের একাদশ নাম্বার চাঁদ। আমরা এটা সম্পর্কে খুব একটা বেশী জানি না। সেলেস্টিয়ায় এটির অবস্থান নির্ণিত আছে। প্রোগ্রাম রান করে যা জানতে পেরেছি তা-ই এখানে লিপিবদ্ধ করছি। এসব তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে

গ্যারান্টি নেই- মূলত আপনাকে একটি **‘ধারণা’** দেওয়াই উদ্দেশ্য। গ্রীক পৌরাণিক কাল্পনিক কাহিনীকে **‘জিন্দা’** রাখতে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা যেনো একেবারে অন্ধ! তাই সবগুলো গ্রহ-উপগ্রহের মতো এটিরও এক অদ্ভুত নামকরণ করেছেন। আমি এসব নাম পছন্দ করি না। যে যেটাই বলুক, আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার আছে- নয় কি?

যা হোক, **‘অসুন্দর’** নামবিশিষ্ট লাওমিদিয়া (বা লাওমিডিয়া) নিজে নিজে **১০ ঘণ্টায়** একবার ঘুরে আসে। আর তার বার্ষিক গতি তথা নেপচুনের চতুর্দিকে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে আসতে সময় লাগে, **৮ বৎসর ৮ মাস**। নেপচুন থেকে গড়ে **০.১৮৫ এইউ (১,৭১,৯৬,৮২৪ মাইল)** দূরে তার প্রদক্ষিণপথ। লাওমিডিয়ার বৃহত্তম দৈর্ঘ্য হলো **২৪ কিলোমিটার**।

দ্বাদশ নাম্বার উপগ্রহ নেসো (Neso): এটিও মূলত গ্রেফতারকৃত এ্যাস্টারোইড। নেপচুনকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করতে সে দীর্ঘ **২৬ বৎসর** সময় নেয়। তবে তার আহ্নিক গতি **৯.৫ ঘণ্টা**। নেপচুন থেকে নেসোর গড় দূরত্ব হলো **০.৮৮৩ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (৮,২০,৭৯,৯৭৮ মাইল)**। নেসো সম্পর্কে অতিরিক্ত জানা যায় নি-শুধুমাত্র এটুকুঃ তার বৃহত্তর দৈর্ঘ্য হলো **৩০ কিলোমিটার (প্রায় ১৯ মাইল)**।

উপগ্রহ **‘জামাদে’** (psamathe): কী অদ্ভুত অসুন্দর শ্রুতিকঠোর নাম! আর সহ্য হচ্ছে না। প্রিয় নভোচারী সহযাত্রী! সুদূর নেপচুনের নিকটস্থ উপগ্রহ যার দ্বারাই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়- ঠিক নয় কি? পৃথিবীসহ সৌরজগৎ কিংবা সমগ্র তারামণ্ডলের কোন বস্তুর উপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাহলে নামকরণ আমার পছন্দসই করবো- তাতে কার কি বলার আছে? আমি তাই আপনাদের সমর্থন নিয়ে এসব গ্রহ-উপগ্রহের কিছু **‘বিকল্প’** নামকরণ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। সুতরাং গ্রন্থের শেষে কয়েকটি তালিকায় আমরা পৌরাণিক কল্পকাহিনীর মাহাত্ম্যতে পাগল বিজ্ঞানীদের নামের পাশে এসব **‘প্রস্তাবিত বিকল্প’** নাম উল্লেখ করবো। আপনাদের পূর্ণ সমর্থন থাকলে কোন অসুবিধা নেই- একদিন এসব নামই হয়তো এই ভূখণ্ডের মানুষের মুখে ও লেখায় উচ্চারিত হবে।

যা হোক, এই মুহূর্তে আমাদের ভ্রমণপথে নেপচুনের নিকটস্থ সর্বশেষ এই চন্দ্রের উপর কিছু তথ্য সেলেস্টিয়ার সুবাদে তুলে ধরছি। এরপরই আমরা নেপচুনের নিকটস্থ মহাকাশ ত্যাগ করে ছুটে চলবো অভ্যন্তরের দিকস্থ পরবর্তী গ্রহ ইউরেনাসের দিকে। নেপচুনের এই উপগ্রহটি মা-গ্রহ থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। সে দীর্ঘ **২৫ বৎসরেরও অধিক সময়ে** নেপচুনকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করে আসে। তার আহ্নিক গতি **১০ ঘণ্টা**। যখন সে নেপচুনের কাছে থাকে তখন তার দূরত্ব মা-গ্রহ থেকে **২,৬৩,৪৫,২৮৭ কিমি (১,৬৩,৭০,২০২ মাইল)** হয়। যখন সে তার কক্ষপথে ভ্রমণ করে শেষ সীমায় পৌঁছে তখন এর প্রায় তিনগুণ দূরে অবস্থান করে (সেলেস্টিয়ার হিসেব অনুযায়ী **৬,৭২,৭১,২৬৫ কিমি- যা ৪,১৮,০০,৪২৬ মাইল**)। জামাদে’র দৈর্ঘ্য **১৪ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল)** বলে এ পর্যন্ত জানা তথ্য থেকে ধারণা করা হয়েছে। এ্যাস্টারোইড-সদৃশ এই চন্দ্র সম্পর্কে আর তেমন বেশী আমরা এখনো জানতে পারি নি।



৪

আরেক গ্যাস দৈত্য ইউরেনাস

ইউরেনাসের দিকে ভ্রমণ

সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাস। নেপচুন থেকে অভ্যন্তরের দিকে এর অবস্থান। দীর্ঘ **১৭.৩৪০ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** পথ আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে। আলোকের গতিতে চললেও আমাদের বর্তমান অবস্থান (নেপচুন) থেকে ইউরেনাসের নিকট পৌঁছতে ৮৬৫২ সেকেন্ড সময় লাগবে। অর্থাৎ, ২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট! তবে আমাদের মনের গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুততর! আমরা এতো সময় অপেক্ষা কেন করবো? খুউব উচ্চগতিতে চলে আসলাম ইউরেনাস থেকে **৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল** (অর্থাৎ ১ এইউ) দূরে। আমরা এখানে এসে গতিরোধ করলাম। চোখে পড়লো মিটিমিটি তারার মতো একটি উজ্জ্বল বস্তু। হ্যাঁ, এটাই সৌরজগতের চারটি বড় গ্রহের একটি- ইউরেনাস। সেলেস্টিয়া প্রোগ্রাম এটুকু দূরত্বে থাকতেই ইউরেনাসের কয়েকটি বাইর-চন্দ্রের নাম তাদের অবস্থানসহ জানালো। এগুলো হলোঃ **ফার্দিন্যান্ড, মার্গেরেট, সিটিবস, স্টিফানো, ট্রিঙ্কোলো, কালিবান, প্রসপেরো ও সাইকোরেক্স**। আমরা আরো কাছে যেয়ে এসব চন্দ্রের উপর যাকিছু জানা তথ্যাদি উল্লেখ করবো। আগে চলুন, ইউরেনাসের আরো নিকটে যাই।

আমরা ইউরেনাস থেকে **২৭ লক্ষ মাইল** দূরে এসে আবার গতিরোধ করলাম। এবার সেলেস্টিয়া ইউরেনাসকে স্পষ্ট দেখাচ্ছিলো। তার চতুর্দিকে আরো একদল চন্দ্রের নাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল দৃষ্টিগোচর হলো। এ চন্দ্রগুলো হলোঃ **অবেরন, টাইটানিয়া, আম্ব্রিয়েল, এ্যারিয়েল ও মিরান্ডা**। ইউরেনাসের এসব উপগ্রহের উপরও আমরা বিস্তারিত বর্ণনা একটু পরই তুলে ধরছি। প্রথমে চলে যাই, ইউরেনাসের একেবারে নিকটে। মা-গ্রহ সম্পর্কে আগে জানার পরই তার সন্তানাদি উপগ্রহগুলোর উপর আলোচনা করা হবে সঠিক উসুল- নয় কি?

এবার আমরা দ্রুত ইউরেনাস থেকে মাত্র **৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল** উপরে এসে পৌঁছে গেছি। সুবহানাল্লাহ! এ কী দৃশ্য! ইউরেনাসের চতুর্দিকে আরো কতো চন্দ্র! বেশ ক'টির নামও ভেসে আসছে। বাকীগুলোর প্রদক্ষিণ পথ শুধু অঙ্কিত। চন্দ্রগুলো হলোঃ **ম্যাব, পাক, বেলিন্ডা, পারদিকা, কিউপিড, রজেলিন্ড, ডেসদেমোনা, ক্রেসেন্ডা, জুলিয়েট, বিয়াঙ্কা, অফেলিয়া ও করদেলিয়া**। এ পর্যন্ত মোট চন্দ্রের সংখ্যা ২৫-এ গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা ইউরেনাসের আরো কাছে যেতে ইচ্ছুক।

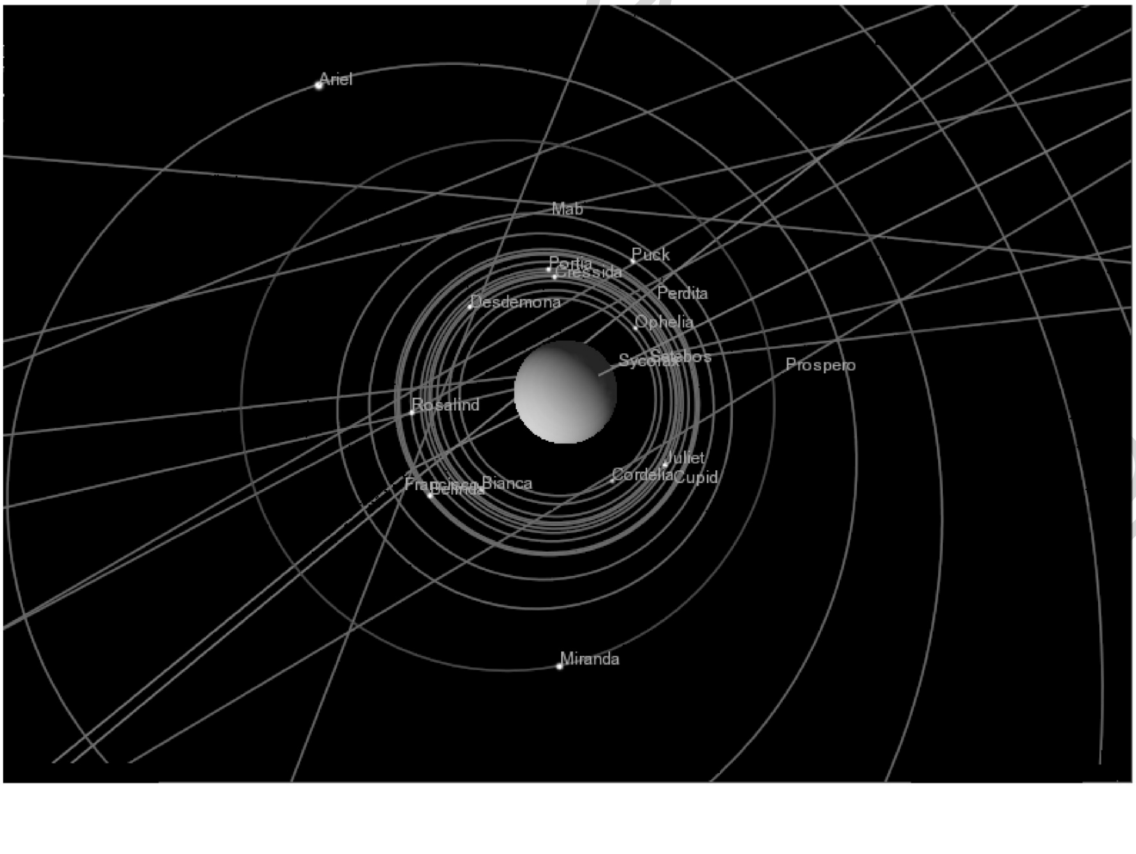
এবার আমরা গ্রহ থেকে মাত্র **৯০ হাজার কিলোমিটার** ঊর্ধ্বে এসে গেছি। আমরা ধীর

গতিতে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। নীল এই গ্রহটির একটি চিত্র নীচে তুলে ধরেছি। এবার এই মোটা গ্রহের উপর যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি তার উপর বিস্তারিত বর্ণনার দিকে মনোনিবেশ করা যাক।



চারটি **'জুপিটার'** সদৃশ বড় আকার ও ওজনের **'জোবিয়ান'** গ্রহের একটি হলো ইউরেনাস। সে পুরো সৌরজগতের সকল গ্রহের তুলনায় ওজনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। তার আরেক বৈশিষ্ট্য হলো নিজের ঘূর্ণন-মধ্যশলাকা কাত হয়ে আছে। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন গ্রহ নেই। এভাবে থাকার ফলে তার বায়ুমণ্ডলে বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয় পুরো প্রদক্ষিণ সময়-ব্যাপী। এ পর্যন্ত জানা ২৭টি চন্দ্রের প্রায় সবগুলোই বিষুবরেখা বরাবর উপরে ক্রমান্বয়ে দূরে থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ইউরেনাস যে প্লেইনে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে তুলনায় চন্দ্রগুলো ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় নব্বুই ডিগ্রী ভিন্ন প্লেইনে। ইতোমধ্যে আমরা ওসব চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছি। একটু পরই তাদের উপর বিস্তারিত লিখবো। নীচের চিত্রে গ্রহের নিজের প্রদক্ষিণপথ ও চন্দ্রগুলোর প্রদক্ষিণপথ দেখানো হলো।

নেপচুনের মতো এটিও একটি **'বরফ'** দৈত্য। এই বরফে আছে পানি, এমোনিয়া ও মিথেইনের



সংমিশ্রণ। তবে তার বায়ুমণ্ডল অনেকটা **হাইড্রোজেন** ও **হিলিয়াম** গ্যাসের তৈরী। কিছুটা **মিথেইন** গ্যসও সেথায় বিদ্যমান- ফলে তাকে দেখতে অনেকটা নেপচুনের মতো নীল-সবুজ রংয়ের লাগে। তাকে খালিচোখে মিটিমিটি তারার মতো মনে হয়। পৃথিবী থেকে বড় কোন টেলিস্কোপ তার দিকে স্থির করে ধরলে অনেকটা নীল বেশ বড়ো **'বৃত্তের'** মতো লাগে। এটাই ছিলো সর্বপ্রথম গ্রহ যাকে বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন। **ভয়েজার-২** মহাকাশযান তার **গ্রান্ড টোরের** অংশ হিসাবে ইউরেনাসের নিকট-মহাকাশ দিয়ে ভ্রমণ করেছিল। ফলে আমরা এই গ্রহ ও তার বেশ ক'টি চন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। এছাড়া কিছু অপরূপ সুন্দর ছবিও **ভয়েজার-২** পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে।

প্রাথমিক তথ্যাদি

ইউরেনাস আমাদের সূর্য থেকে গড়ে **২,৮৬০ মিলিয়ন কিলোমিটার (২৮৬ কোটি কিমি- প্রায় ১৭৮ কোটি মাইল)** দূরে থেকে তার প্রদক্ষিণ পথে দীর্ঘ **৮৪ বৎসরে** একবার ঘুরে আসে। সুতরাং তার এক বৎসর সমান আমাদের ৮৪ বৎসর। আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে যে পরিমাণ সূর্যালোক পায় তার তুলনায় ইউরেনাস মাত্র চারশ ভাগের একভাগ প্রাপ্ত হয়। গ্রহের **ইক্যুয়েটরিয়্যাল** (বিষুবরেখার) ব্যাস হলো **৫১,১১৮ কিমি (৩১,৭৬৩ মাইল)**। তার ওজন (বস্তুর পরিমাণ) আমাদের পৃথিবীর তুলনায় **১৪.৫৪ গুণ**। আর ভলিউম (ঘনমান) হলো **৬৭ গুণ**। ইউরেনাসের উপর মহাকর্ষের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় **১.১৭ গুণ**। এর অর্থ, এক কেজি ওজনের কোন বস্তু ইউরেনাসের উপর **১.১৭ কেজি** হবে।

ইতিহাস

নিজের তৈরী একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ১৭৮১ সালে বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্শেল** ইউরেনাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু বাস্তবে এ আবিষ্কার ছিলো **'দুর্ঘটনা'!** তিনি এ সময় অপর এক কাজে দূরবীক্ষণযন্ত্র সেদিকে স্থির করেন। চলন্ত বস্তু হিসাবে ইউরেনাসকে একটি **কমেট** (ধূমকেতু) মনে করে, এ সম্পর্কে অবগত



হাবল মহাকাশ দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা ধারণকৃত ইউরেনাসের ছবি। তার রিং সিস্টেম স্পষ্ট দেখাচ্ছে। ভয়েজার-২ সর্বপ্রথম এই রিং সিস্টেম আবিষ্কার করে। সৌজন্যে: Encarta Encyclopedia NASA/Hubblesite/Erich Karkoschka (University of Arizona)

করেন **বৃটিশ রয়েল সোসাইটিকে**। ইউরেনাসের অবস্থান ও ঘূর্ণন গতি-মতি অবশ্য বেশ আগে থেকেই গাণিতিকভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা সেই **১৬৯০** সালের দিকে। কিন্তু সঠিক দূরবীক্ষণযন্ত্রের অভাবে গ্রহটি আবিষ্কার করতে চলে গেলো আরো নব্বুই বৎসর।

সেই কবে আবিস্কৃত হওয়ার পরও কিন্তু ইউরেনাস সম্পর্কে আধুনিক যুগ পর্যন্ত আমরা খুব একটা জানতে পারি নি। অবশেষে এক উপযুক্ত মুহূর্ত গত শতকের সত্তুর দশকের শেষের দিকে আমাদের নিকট হাজির হলো। চারটি দৈত্যসদৃশ গ্রহ তাদের প্রদক্ষিণপথে ঘুরে ঘুরে বহুদিন পর একই লাইনে অবস্থান করছিলো। **নাসা'**র বিজ্ঞানীরা এই সুযোগ হারাতে চাইলেন না। সব ক'টি জোবিয়ান গ্রহের কাছঘেষে **'ফ্লাইবাই'** মিশন প্রস্তুত হলো। **ভয়েজার-২ মহাকাশযান আগষ্ট ২০, ১৯৭৭ ঈসায়ী** উড্ডয়ন করলো কেনেডি স্পেইস সেন্টার থেকে। এই **'মহাকাশ প্রযুক্তির বিস্ময়' স্পেইসশীপ** প্রথমে জুপিটারের নিকটে আসে **১৯৭৯** সালে। এরপর শনিগ্রহ ভিজিট করে **১৯৮১** সনে। তারপর ছুটে যায় ইউরেনাসের নিকট **১৯৮৬** সালে। এখান থেকে বিদায় হয়ে ছুটে যায় নেপচুনের নিকট। সেখানে পৌঁছে **১৯৮৯** ঈসায়ী। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ সেন্টার থেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত **ভয়েজার-২** এর কৃতীত্বের উপর আলোচনা করেছি। কিভাবে সে নেপচুনের নিকট যেয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ করে। এবার দেখা যাক, ইউরেনাসের নিকট থেকে সে কী উপহার দিল পৃথিবীবাসীকে।

অনেক কিছু। প্রথমত ইতিহাসের সর্বপ্রথম ইউরেনাসের কিছু বিস্ময়কর ছবি সে পাঠালো। পৃথিবীর সকল মিডিয়ায় এসব ছবি দেখানো হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর মানুষ এ ছবিগুলোকে দেখেছেন। দ্বিতীয়ত, এ পর্যন্ত সবাই ভেবেছিলেন, একমাত্র শনিগ্রহের চতুর্দিকে রিং আছে। কিন্তু **ভয়েজার-২** থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ হলো, ইউরেনাসেরও রিং আছে (আগের পৃষ্ঠার ছবি দ্রঃ)। এছাড়া **ভয়েজার-২** ইউরেনাসের বেশ ক'টি ছোটবড় চন্দ্রের ছবি পাঠিয়েছে। সে মোট পাঁচটি নতুন চাঁদ আবিষ্কারও করেছে।


ইউরেনাস (পেছনে) ও তার বড় একটি চাঁদ 'আরিয়েল'।
সৌজন্যেঃ সেলেস্টিয়া

পরে পৃথিবীর মহাকাশে স্থাপিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ ইউরেনাসের দিকে স্থির করা হয়। সে ছবি তুলে বিভিন্ন **তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। দৃশ্যমান তরঙ্গে** (যা চোখে দেখা যায়) ছবির তুলনায় **অদৃশ্য তরঙ্গ** যেমন **ইনফ্রারেড রেডিয়েশনে** (এই তরঙ্গে আমার চোখে কিছু দেখি না কিন্তু উপযুক্ত ক্যামেরা দ্বারা ছবি তুলা সম্ভব) অনেক বেশী তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। হাবল এ তরঙ্গেও ইউরেনাসের ছবি তুললো। গ্রহের বায়ুমণ্ডলে পরিবর্তন, দু'টি নতুন চন্দ্রের অস্তিত্ব এবং দু'টি অতিরিক্ত রিং এই অনুসন্ধান থেকে আবিস্কৃত হলো।

গ্রহের গতিমতি

জগতের সব বস্তুই- **গ্রহ-উপগ্রহ, তারা, তারাপুঞ্জ, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিপুঞ্জ, ক্লাস্টার,**

ক্লাস্টারপুঞ্জ, সুপারক্লাস্টার ইত্যাদি সবকিছু গতিশীল। কেউ স্থির নেই। নির্দিষ্ট আইনের আওতাধীন থেকে সবাই **অস্থির, ঘূর্ণমান**। আমাদের সমগ্র সৌরজগতে এ পর্যন্ত একটি বস্তুও পাওয়া যায় নি, যে সূর্যের তুলনায় স্থির আছে। বাস্তবে এভাবে থাকাও অসম্ভব। সূর্যের বিরাট মহাকর্ষ কোন স্থির বস্তুকে খুব দ্রুত টেনে নিজের উপর নিয়ে পতিত করবে- এটা নিশ্চিত। সুতরাং বাঁচার উপায় কি? কক্ষপথে চলমান থাকা। **কক্ষপথ** বা **অরবিট** বলে সূর্যের চতুর্দিকে চলমান থাকার রাস্তাকে। কোন বস্তু নিজে নিজে না ঘুরে কোন বৃত্তাকার কিংবা ডিম্বাকৃতির পথে চলতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অন্তত দু'টি গতি বিদ্যমান। এর প্রথমটি হলো নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণন- যাকে আমরা **'আহ্নিক' গতি** বলি। আর অপরটি হলো সূর্যের চতুর্দিকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখা ও স্থিতিশীল থাকার জন্য কক্ষপথে ঘুরে আসা। একবার পুরো কক্ষপথ অতিক্রম করে আসাকে আমরা বস্তুটির **'বার্ষিক'** গতি বলি।

ইউরেনাসের এই দু'টি গতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা বলেছি। এছাড়া পরিশিষ্টে **'এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি'** টেবিলে এসব গতির উপর পূর্ণ একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে আর ওসব গতিবিধির কথা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু অতিরিক্ত বলছি, ইউরেনাস ও পৃথিবী প্রায় একই **'অরবিট্যাল প্লেইনে'** কক্ষপথে ঘুরে। ফলে পৃথিবীর আকাশে একই পথে তাকে পাড়ি দিতে দেখা যায়। তার বৎসরও আমাদের তুলনায় দীর্ঘ- **৮৪ বৎসর**। তবে তার দিন খুব দ্রুততর। আপনি যদি ইউরেনাসের বিষুবরেখা বরাবর দাঁড়ান তাহলে পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় লাগবে মাত্র **৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড**। অন্যকথায়, আমাদের হিসাবে ১৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে তার এক দিন। আমাদের পৃথিবীর মতো প্রতিটি গ্রহেরই **উত্তর-দক্ষিণ মেরু** আছে। ইউরেনাসের দক্ষিণ মেরু যদি আমরা উপরের দিকে মনে করি- তাহলে তার আহ্নিক (দৈনিক) গতি হবে ডানদিকে (ঘড়ির কাটার দিকে)। ঠিক যেভাবে পৃথিবীসহ অধিকাংশ গ্রহ ঘুরে থাকে। ইউরেনাসের আহ্নিক গতির প্লেইন থেকে তার বার্ষিক গতির প্লেইন ঠিক **৯০ ডিগ্রী নয়- বাস্তবে তা ৮২.২ ডিগ্রী**। কিন্তু বিরাট **'টিল্ট'** বা কাত হয়ে থাকার দরুন তার বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হয় আবহাওয়া-জনিত বা সিজনের সীমাতিরিক্ত পরিবর্তন। অন্য সকল গ্রহের তুলনায় এই বড় মাত্রার টিল্টের কারণ জানা যায় নি। তবে থিওরীর অভাব নেই। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবো না!

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি টিল্ট কোণের মাত্রা বড় হওয়ায় ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তবে সে সূর্য থেকে এতো বেশী দূরে অবস্থান করে যে, এই পরিবর্তন প্রতি ৪২ বৎসর পর একবার মাত্র ঘটে। অর্থাৎ তার উপরিভাগে সূর্যালোকের পরিমাণ এই দীর্ঘদিন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে অতি অল্প বা অতিবেশী হয়। কিন্তু এরপরও উভয় মেরুর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য খুব একটা বেশী পরিলক্ষিত হয় না। গ্রহের উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে **-২১২ ডিগ্রী থেকে -৩৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ বস্তু

ইউরেনাস কিসের তৈরী? এটা মূলত তরল পদার্থ ও গ্যাসসর্বস্ব গ্রহ। তার গভীর বায়ুমণ্ডলে আছে **হাইড্রোজেন** ও **হিলিয়াম**। এসাথে অত্যল্প বিষাক্ত গ্যাস **মিথেইন**। তার **শিলা পাথরের** তৈরী কেন্দ্র সম্ভবত পৃথিবীর কেন্দ্রের চেয়েও কম আয়তনবিশিষ্ট হবে। ধারণা করা হয় কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ বড়জোর **২ হাজার কিলোমিটার (১২৪০ মাইল)**। কিন্তু সেখানকার তাপমাত্রা বিরাট- প্রায় **৬৬৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**। গ্রহের ভলিউমের

অধিকাংশ বস্তু তরল আকারে আছে। এই তরল পদার্থকে কেউ কেউ বরফের **'মহাসাগর'** হিসাবে ব্যক্ত করেন। এ মহাসাগর কিন্তু আমাদের প্রশান্ত, ভারত কিংবা আটলান্টিক মহাসাগরের মতো নয়। পানির মধ্যে মিশে আছে **সিলিকেট, ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেনসর্বস্ব মলিকিউল**- যেমন **এ্যামোনিয়া ও হাইড্রোকার্বন, মিথেইন** ইত্যাদি। এছাড়া গ্রহের এই মহাসাগর খুব গরম: ধারণা করা হয় তাপমাত্রা **৬৬৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঠিক নেপচুনের মতো বায়ুমণ্ডলের উচ্চ তাপ থাকায় এই **'পানি'** বাষ্পে পরিণত হয় না। অন্যথায়, যেহেতু মাত্র ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাই হচ্ছে বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য যথেষ্ট- তাই মহাসাগরের অস্তিত্বই থাকতো না।

বায়ুমণ্ডল

ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলও অনেকটা নেপচুনের মতো। এতে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অনেকটা কম পরিমাণ মিথেইন। গ্রহের বায়ুমণ্ডল মহাসাগর লেবেল থেকে **৫,০০০ হাজার কিলোমিটার** ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। **ভয়েজার-২** গ্রহের নিকট দিয়ে ফ্লাই-বাই করে ১৯৮৬ সালে। তখন বায়ুমণ্ডল খুব একটা সক্রিয় ছিলো না- তা ছিলো স্থির, শান্ত। কিন্তু ২০০১ সালে হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রমাণ করেছে যে, গ্রহের বায়ুমণ্ডলে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা হচ্ছে। আহ্নিক গতিপথের দিকে খুব উচ্চ গতিতে বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো গ্রহের পুরো বায়ুমণ্ডলব্যাপী।

ম্যাগনেটিক ফিল্ড

পৃথিবীর মতো ইউরেনাসের চতুর্দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিদ্যমান। গ্রহের গভীর মহাসাগরে **'চার্জড্ আয়ন'** থাকার ফলেই এই ফিল্ডের সৃষ্টি। তবে এর শক্তি পৃথিবীর তুলনায় অনেকটা কম। শক্তি কম হলেও নিজের মধ্যশলাকার (বা এক্সিস অব রটেশনের) সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এই ফিল্ড গ্রহের উপরিভাগ থেকে অন্তত কয়েক লক্ষ কিলোমিটার ঊর্ধ্ব মহাকাশ পর্যন্ত সক্রিয়।

রিং ও চন্দ্র

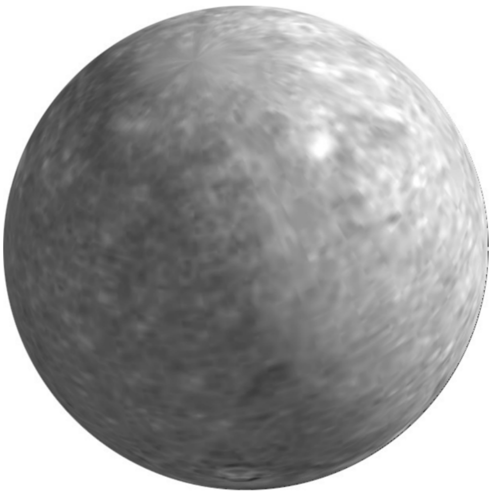
আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, শনির মতো ইউরেনাসেরও রিং আছে। তবে শনির অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত রিংগুলোর মতো তেমন গাঢ় নয়। এ পর্যন্ত মোট ১৩ টি রিং সনাক্ত হয়েছে। এগুলো ছোট ছোট বস্তুর তৈরী এবং গ্রহের বিষুবরেখার উপরে থেকে প্রদক্ষিণরত আছে। গ্রহের নিকটস্থ একঝাঁক রিং আছে যারা অনেকটা ধূসর বর্ণের। এগুলো বেশী দূর থেকে দেখাই যায় না। গ্রহ থেকে এরা **৩৮,০০০ কিমি (২৪,০০০ মাইল)** দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করে। বড় বড় ফুটবলের মতো কালো রংয়ের বরফখণ্ড ও শিলা পাথরে সৃষ্ট এসব রিং। ইউরেনাসের রিং সিস্টেমের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রুপ **৬৭,০০০ কিমি (৪১,৬৩২ মাইল)** থেকে **৯৭,০০০ কিমি (৬০,৭০৮ মাইল)** দূরত্বে থেকে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

ইউরেনাসের এ পর্যন্ত ২৭টি চন্দ্র আছে বলে প্রমাণ মিলেছে। গ্রহের নিকটে আমাদের কল্পনার স্পেইস শীপে ভ্রমণকালীন বর্ণনার সময় এসব চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছি। আসুন, এবার বড় ক'টি চাঁদ সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নিই। অবশ্য গ্রন্থের শেষে সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। পাঠকরা সেখান থেকে ইউরেনাসের সকল চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জেনে নিতে পারবেন।

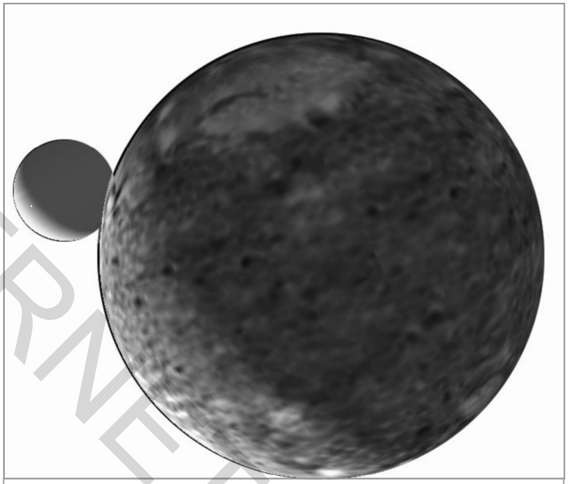
টাইটানিয়া: এ চাঁদটি গ্রহ থেকে প্রায় **৪,৩৬,০০০ কিমি (২,৬২,০০০ মাইল)** দূরে থেকে ইউরেনাসকে ৯ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ

করে। তার প্রদক্ষিণপথ অনেকটা বৃত্তাকার। সে গ্রহের বিষুবরেখার উপরে থেকে ঘুরে। **ভয়েজার-২**-এর নেওয়া ছবি হতে এটা স্পষ্ট যে, এই চাঁদটি আমাদের চন্দ্রের মতো গোলকাকৃতির। তার ব্যাস (একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দূরত্ব) **১৫৮০ কিলোমিটার (৯৪৭ মাইল)**। ইউরেনাসের অন্য কোন চন্দ্র এতো বড় নয়। কিন্তু এরপরও এটি আমাদের চাঁদের তুলনায় অর্ধেক ব্যাসবিশিষ্ট মাত্র। মাপজোখ থেকে জানা গেছে, টাইটানিয়া মূলত অর্ধেক বরফ ও অর্ধেক শিলা পাথরের তৈরী।

ইউরেনাসের অপর চন্দ্র আরিয়েলের মতো টাইটানিয়ার গায়ে খুব বেশী বড় আয়তনের পতন-গর্ত নেই। দেখতে মনে হয় সাম্প্রতিককালে তার অভ্যন্তরে জিওলজিক্যাল ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। তার সারফেসে আছে অসংখ্য যুক্ত উপত্যকা এবং সমভূমি। একটি **'মেসিনা চাজমাতা'** নামক উপত্যকা আছে যার দৈর্ঘ্য **১৬০০ কিলোমিটার (১০০০ মাইল)**। প্লানেটারী বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই উপত্যকা টাইটানিয়া হিমায়িত হওয়ার সময় সৃষ্টি হয়েছে। মনে করা হয়, অতীতে টাইটানিয়া খুব উত্তপ্ত ছিলো। সে সময় বরফ তরল অবস্থায় বিরাজ করছিলো। নীচে এই আকর্ষণীয় চন্দ্রটির একটি ছবি তুলে ধরা হলো।



অবেরন: এটিও ইউরেনাসের একটি বড়ো চন্দ্র। অধিকাংশ মতে এটি গ্রহের দ্বিতীয় বৃহৎ চন্দ্র। প্রথমটি হলো ইতোমধ্যে আলোচিত টাইটানিয়া। অবেরন গড়ে **৫,৮৩,০০০ কিমি (৩,৫০,০০০ মাইল)** দূরে থেকে প্রতি **১৩ দিন ১২ ঘণ্টায়** একবার ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করে। গ্রহের বিষুবরেখা বরাবর উর্ধ্বে ঘূর্ণনরত এই চন্দ্রের প্রদক্ষিণপথ অনেকটা বৃত্তাকার। গোলক (বা বল) আকৃতির এই চন্দ্রের ব্যাস **১৫২০ কিলোমিটার (যা ৯৪০ মাইলের মতো)**। সুতরাং আমাদের চন্দ্রের তুলনায় অবেরন অর্ধেক ব্যাসবিশিষ্ট।



ইউরেনাসের আরেক চন্দ্র অবেরন- অনেকটা টাটানিয়ার মতোই। (সৌজন্যেঃ সেলেস্টিয়া)

টাইটানিয়ার মতো অবেরনও অর্ধেক বরফ এবং অর্ধেক শিলা পাথরের তৈরী বলে অনেকেই মনে করেন। তবে তার উপর অতীতে বহু ছোট-বড় **এ্যাস্টারোইড** পতিত হয়েছে- এটা নিশ্চিত। কারণ পুরো চন্দ্রব্যাপী গভীর-অগভীর অসংখ্য **'পতন-গর্ত'** বিদ্যমান। ১৯৮৬ সালে **ভয়েজার-২ মহাকাশযান** থেকে নেওয়া ছবি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, অবেরনের গায়ে বেশ কয়েকটি পাহাড়-পর্বতও আছে। এর একটি **৬ কিলোমিটার** উঁচু। চন্দ্রটির বাইরের স্তর বা তার

চামড়া অনেকটা ধূসর বর্ণের। এছাড়া বড় বড় গর্তের ফ্লোরেও কালো রং থেকে বুঝা যায়, সাম্প্রতিককালে (অর্থাৎ গত কয়েক মিলিয়ন বৎসরের মধ্যে) উপগ্রহে বেশ কিছু জিওলজিক্যাল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংগঠিত হয়েছে।

ইতিহাসঃ বৃটিশ মহাকাশবিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্শেল** এই চন্দ্র **১৭৮৭** ঈসায়ীতে আবিষ্কার করেন। তিনি বৃটিশ নাট্যকার **উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'এ মিডসামার নাইট্স ড্রিম'** নাটকের এক চরিত্রের নামানুসারে এর নাম রাখেন, **অবেরন**। হার্শেলের এই নামকরণ-নিয়মকে পরবর্তী বিজ্ঞানীরাও বহাল রাখেন। আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরেনাসের সকল আবিষ্কৃত চন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকের চরিত্রের নামানুসারে। এমনকি অবেরনের সারফেসের বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতের নামও এই বৃটিশ প্লে-রাইটের সৃষ্ট কাল্পনিক স্থান ও ট্রাজিক চরিত্রের নামানুসারে রাখা হয়েছে।

যা হোক, নামকরণের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অবজেকশন আছে। কিন্তু কে শোনে আমার কথা! এরপরও বলবো, মহাকাশের বস্তু বা এমনকি এই পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এগুলোর নামকরণ সমগ্র মানবজাতির নিকট গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস সর্বদাই থাকা উচিৎ। দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে নজর রাখার অনুরোধ রইলো। এটুকু উল্লেখের পর আমরা পরবর্তী, **'শেক্সপিয়ারিয়ান কার‍্যাক্টার'** নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি।

আম্ব্রিয়েলঃ ইউরেনাসের আরেকটি বড় চন্দ্র এটি। সে গড়ে ২,৬৬,০০০ কিমি (১,৬০,০০০ মাইল) দূরে থেকে প্রতি ৪ দিন **১৫** মিনিটে একবার ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করে। এ পর্যন্ত আলোচিত অন্য উপগ্রহ দু'টোর মতো সে-ও বিষুবরেখার উপরে থেকে প্রায় বৃত্তাকার প্রদক্ষিণপথে চলে। গোলক আকারের এই চন্দ্রের ব্যাস **১১৭০** কিমি (৭০২ মাইল)। সুতরাং সে আমাদের চন্দ্রের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ আয়তনবিশিষ্ট। তার ঘনাঙ্ক মেপে জানা গেছে উপরে বর্ণিত অন্য দু'টির চন্দ্রের মতো আম্ব্রিয়েলও মূলত অর্ধেক বরফ আর অর্ধেক শিলা পাথরের তৈরী। তার উপরিভাগ ইউরেনাসের সকল চন্দ্রের তুলনায় সর্বাপেক্ষা গাঢ় ধূসর রংয়ের। তার পড়শী চাঁদের নাম আরিয়েল। সেটির তুলনায় আম্ব্রিয়েল অর্ধেক মাত্র আলোকরশ্মি নিজের গাঁ থেকে মহাকাশে প্রতিবিম্ব করে। এ চাঁদটিও অতীতে এ্যাস্টারোইড দ্বারা খুব বেশী বম্বার্ডমেন্টের শিকার হয়েছে। তার চতুর্দিকে অসংখ্য **'পতন-গর্ত'** দেখা যায়। **ভয়েজার-২** থেকে পাঠানো ছবি পরীক্ষার মাধ্যমে একটি বিশেষ বস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। **১৪০** কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট এই বিরাট গর্তকে ওয়ান্ডা (Wunda) নামকরণ করা হয়েছে।


ইউরেনাস ও তার চাঁদ আম্ব্রিয়েল

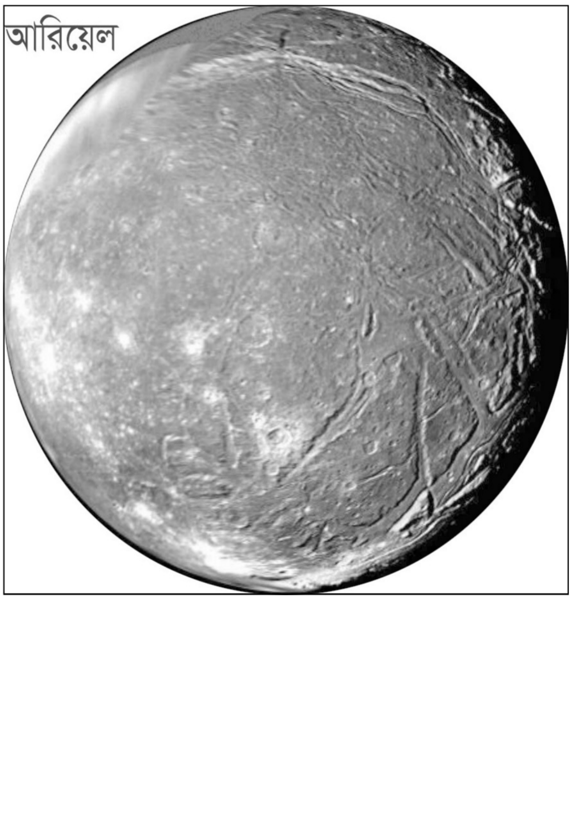
চন্দ্রটি সম্পর্কে আর খুব একটা বেশী আমাদের জানা নেই। ভবিষ্যতে কোন মিশন থেকে জানবো হয়তো। একে **১৮৫১** সালে **উইলিয়াম লাসেল** নামক এক বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন।

আরিয়েল: এটাও ইউরেনাসের একটি বড় আয়তনের অকৃত্রিম উপগ্রহ। সে গড়ে **১,৮৫,০০০ কিমি (১,১৫,০০০ মাইল)** দূরে থেকে ইউরেনাসকে মাত্র **২.৫ দিনে** একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। তার অবস্থান আগে বর্ণিত আম্ব্রিয়েলের তুলনায় ইউরেনাসের নিকটে। প্রদক্ষিণপথও অনুরূপ। গোলকাকারের এই চন্দ্রের ব্যাস **১১২০ কিলোমিটার (৬৯০ মাইল)**। আমাদের চন্দ্রের তুলনায় সে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র আয়তনবিশিষ্ট। উপরে বর্ণিত তিনটি চন্দ্রের মতো আরিয়েলও মূলত অর্ধেক বরফ ও বাকী অর্ধেক শিলা পাথরের তৈরী।

আরিয়েল ইউরেনাসের অন্য সব চন্দ্রের তুলনায় একক একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার গাঁ থেকে আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং তাকে সবার তুলনায় উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রের গাঁয়ে অনেক গভীর ও দীর্ঘ নদী-নালা দেখতে পাওয়া যায়। এমনও কিছু নালা আছে যারা শত শত কিমি পর্যন্ত দীর্ঘ এবং ১০ কিমি পর্যন্ত চওড়া।

আরিয়েল সম্পর্কেও আমরা খুব একটা বেশী জানি না। **ভয়েজার-২** তার কাছ ঘেঁষে উড়ে যাওয়ার সময় কিছু ছবি প্রেরণ করে। এ চন্দ্র সম্পর্কে আমাদের জানার ব্যাপ্তি এই ছবিগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে চন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক আগে। বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী **উইলিয়াম লাসেল ১৮৫১** সালে এ উপগ্রহ সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন। শেক্সপিয়ারের **'দ্যা টেম্পেস্ট'** নাটকের চরিত্রের নামানুসারে এর নামকরণ করেন আরিয়েল।

মিরান্ডা: ইউরেনাসের আরেক বড় চন্দ্র। সে **১,৩০,০০০ কিমি (৭৭,৯০০ মাইল)** দূরে থেকে ইউরেনাসকে প্রতি **৩৪ ঘণ্টায়** একবার প্রদক্ষিণ করে। গ্রহের বিষুবরেখা থেকে কিছুটা কাত প্লেইনে তার প্রদক্ষিণপথ অবস্থিত। অর্থাৎ এ পর্যন্ত বর্ণিত অন্যান্য চাঁদের ঠিক একই প্লেইনে সে অবস্থান করে না- কিছুটা দূরে। মিরান্ডার ব্যাস মাত্র **৪৭২ কিমি (২৯০ মাইল)**। তবে সে-ও গোলক আকারের। দেখতে রৌপ্যের মতো। আমাদের চন্দ্রের তুলনায় মিরান্ডা এক-অষ্টমাংশ আয়তনবিশিষ্ট। এ চন্দ্রটিও মূলত অর্ধেক বরফ ও অর্ধেক শিলা পাথরের তৈরী।





মিরান্ডার উপরিভাগ বিভিন্ন ধরনের। **ভেরোনা রুপেজ** নামক তার একটি পর্বত আছে যার উচ্চতা **১৫ কিমি**। অনেক বড় আকারের উপত্যকাও পাওয়া যায়। এর কোনো কোনটা **২০ কিমি** পর্যন্ত গভীর। আরো আছে এক দু'টো সুগভীর গর্ত- **৩০ কিমি** পর্যন্ত চওড়া। আমেরিকার **ভয়েজার-২** মহাকাশযান বেশ নিকটে থেকে মিরান্ডার কিছু ছবি আমাদের কাছে প্রেরণ করেছে। এ ছবিগুলোই আমাদের তথ্যের সূত্র। (আগের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন)

ইতিহাস: ইউরেনাসের এই চাঁদটি **১৯৪৮** সালে ডাচ্-আমেরিকান বিজ্ঞানী **জেরার্ড কাইপার** আবিষ্কার করেন। তিনিও শেক্সপিয়ারের **'দ্যা টেম্পেস্ট'** নাটকের এক চরিত্রের নামানুসারে এর নামকরণ করেন। পরবর্তীতে আবিস্কৃত মিরান্ডার গায়ের বিভিন্ন বস্তুর নামকরণও শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকের চরিত্রের নামানুসারে করা হয়।

আমরা ইতোমধ্যে ইউরেনাসের অন্যান্য প্রায় সবক'টি চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছি। যেহেতু গ্রন্থের শেষে এসব চন্দ্রের নমসহ জানা সকল তথ্যের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাই এখানে ওগুলো নিয়ে আর বেশী আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না। এখন আমাদের কাল্পনিক ভ্রমণ পুনরায় শুরু হবে। আমরা খুব দ্রুত সৌরজগতের আরেক বড় গ্রহ শনির দিকে যাত্রা করবো। সুতরাং সাবাই নিজেকে সামলে নিন!

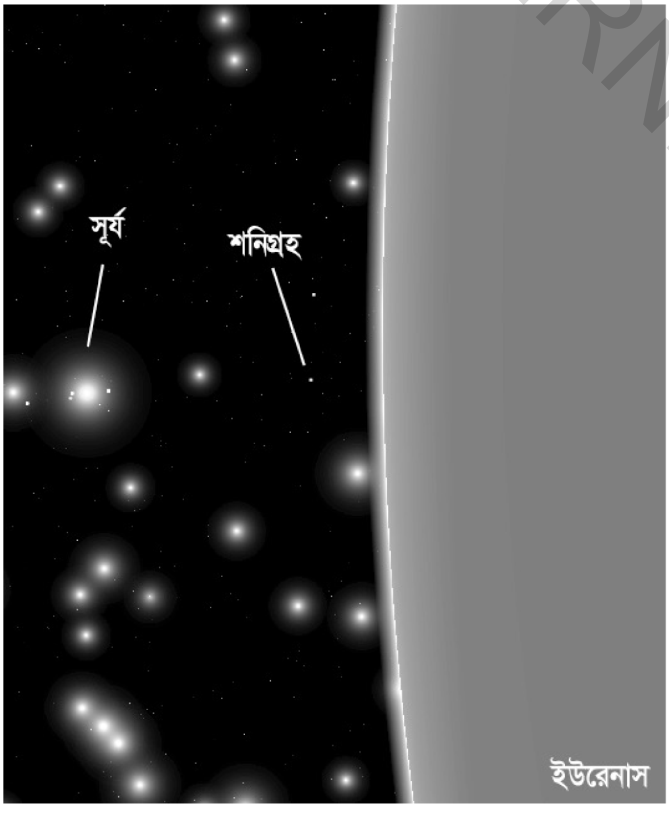


৫

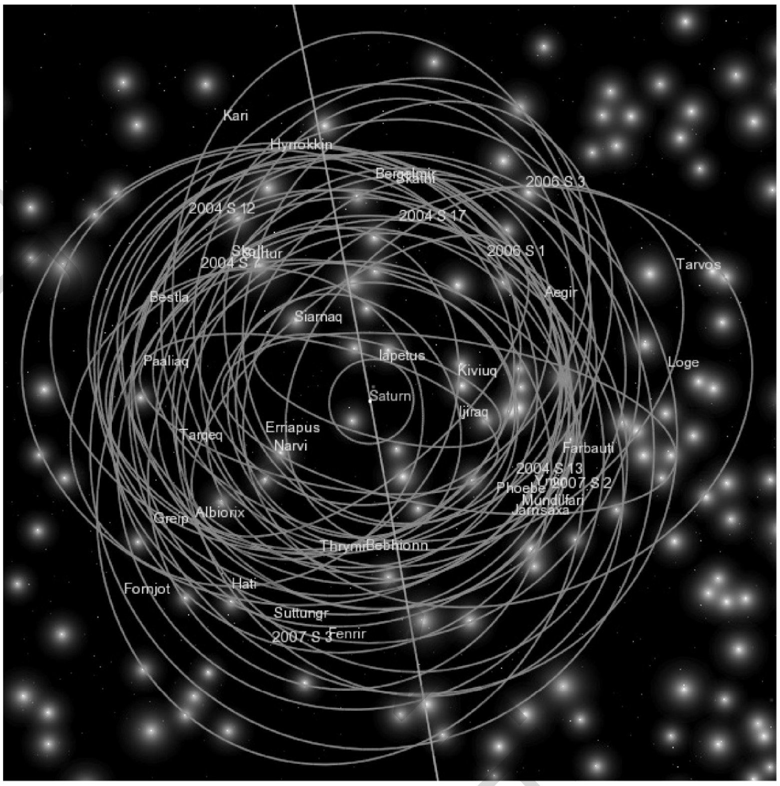
সৌরজগতের রিংসর্বস্ব 'সুন্দরী' শনিগ্রহ

শনির নিকটে

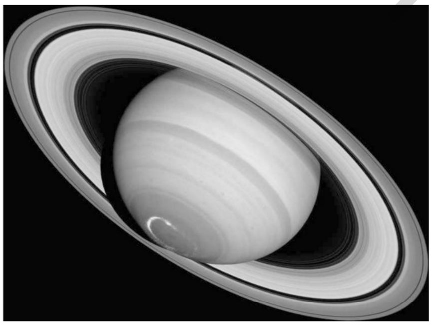
এবার আমাদেরকে ইউরেনাস থেকে সৌরজগতের অভ্যন্তরের দিকে যাত্রা শুরু করতে হবে। সেলেস্টিয়া থেকে জানা গেল গ্রন্থ প্রণয়নের সময় এই ভ্রমণ হবে প্রায় **২৯.৩৫৪ এইউ (২৭২,৮৬,২৪,৭৮৮ মাইল)** দূরের রাস্তা। আমাদের কাল্পনিক মহাকাশযানটি ঘুরিয়ে শনির দিকে স্থির করলাম। শনিকে আমরা শুধুমাত্র একটি ছোট্ট তারকাসদৃশ দেখতে পেলাম। এরপর সূর্যের প্রতি স্থির করে দেখি- সে-ও অনেক অনেক দূরে, প্রায় **২০.০৭৩ এইউ (১৮৬,৫৯,০১,৯৩৪ মাইল)**। নীচের চিত্রটি দেখুন। তবে আমাদের নিকট দূরত্ব কোন সমস্যাই নেই! চলুন, সৌরজগতের (আমাদের প্রিয় পৃথিবীর পর) সর্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রহ শনির নিকটে যাই।



আমরা এখন শনির বিষুবরেখা বরাবর **১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)** উপরে এসে অবস্থান করছি। সুবহানাল্লাহ! দেখুন শনির বাইরের চন্দ্রের সংখ্যা (পরের পৃষ্ঠার চিত্র)! আমরা কিছুক্ষণ এখানে থেকে হিসেব করে জানলাম, শুধু বাইর স্পেইসে শনির চতুর্দিকে প্রায় ৩৭টি ছোটবড় চন্দ্র প্রদক্ষিণরত আছে। এগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করছি না। অবশ্য পরিশিষ্টে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ টেবিলে এগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত জানা সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি। এখন আমাদের ফোকাস শনিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ থাকাটাই হবে সমুচিত।



ইতোমধ্যে আমার ৩৭টি বাইরের চন্দ্র সম্পর্কে বলেছি। এবার গ্রহ থেকে **৪৮,০০,০০০ কিমি** দূরে অবস্থান নিয়ে তাকিয়ে দেখি আরো **২১টি** চন্দ্র দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে চন্দ্রের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো **৫৮টি**। আরো চারটি আমাদের চোখে পড়েনি- তবে আছে। সৌরজগতের কোন গ্রহের এতো বেশী চন্দ্র নেই। সর্বাপেক্ষা কম হলো আমাদের পৃথিবীর- মাত্র **১টি**। বিজ্ঞানীরা শনির **৬২টি** চন্দ্রের মধ্যে **৫৩টির** নামকরণ করেছেন। যা হোক বিশেষ কিছু চন্দ্রের উপর তথ্যাদি একটু পরই তুলে ধরবো। প্রথমে শনিগ্রহ ও তার অতিসুন্দর রিং সিস্টেমের উপর আলোচনা করা যাক। আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে রিংগুলো কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! (উপরের চিত্র দেখুন) এগুলো আসলে কি? একটু পরে এ প্রশ্নের জবাবে আসছি। প্রথমে জেনে নিই শনিগ্রহ সম্পর্কে আমাদের জানা বিশেষ কিছু তথ্য।



গ্রহ হিসাবে সূর্য থেকে শনির অবস্থান ষষ্ঠ স্থানে। আমাদের সৌরজগতের মধ্যে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ গ্রহ এটি। প্রথম স্থানে আছে বৃহস্পতি। আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ গ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিলো। গেল শতকের শেষের দিকে মহাকাশযান এই দূরের গ্রহে প্রেরণ করে আমরা তার সম্পর্কে অনেক বেশী জানতে পেরেছি। প্রথমে **পাইওনিয়ার**, পরে **ভয়েজার** এবং সবশেষে **কাসিনি** মহাকাশযান এই বিরাট গ্রহের কাছ-ঘেঁষে উড়ে যায়। তারা প্রেরণ করে অসংখ্য সুন্দর ছবিসহ অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য।

শনিগ্রহ আমাদের পৃথিবীর বৎসরের হিসাবে প্রতি **২৯ বৎসর ৬ মাসে** একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং তার **১** বৎসর সমান আমাদের **২৯.৫** বৎসর। সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব হলো **৯.৭১৭৫ এইউ = ১৪৫,৩৭,১৭,৩০২ কিমি (৯০,৩২,৯৮,০৬৪ মাইল)**। সে তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে মাত্র **১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে** একবার ঘুরে আসে- এটাই তার একদিন বা আহ্নিক গতি। শনির টিল্ট **২৭ ডিগ্রী**- ফলে তার বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি

হয় বিশেষ পরিবর্তনশীল ঋতু। রিং ছাড়াই শনির ব্যাসার্ধ **৬০,২৬৮ কিমি (৩৭,৪৪৯ মাইল)**। তার ওজন (ম্যাস) **৯৫টি পৃথিবীর সমপরিমাণ**। শনি গোলকাকার হলেও তার উভয় মেরু প্রায় **১০% চওড়া**। সুতরাং সে হলো সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী '**চেপ্টা**' গোলক দেহবিশিষ্ট গ্রহ।

আগেই বলেছি বেশ ক'টি মানবতৈরী মহাকাশযান শনির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে। **১৯৭৯** সালের সেপ্টেম্বর মাসে **পাইওনিয়ার-১১** শনির নিকটে যেয়ে ছবি প্রেরণ করে। এরপর **ভয়েজার-১** শনির নিকটে পৌঁছে ১৯৮০ সালের নভেম্বরে। **ভয়েজার-২** সেখানে যেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রেরণ করে আগস্ট **১৯৮১** সালে। এ তিনটি যানের মধ্যেই ছিলো ক্যামেরা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্র গ্রহের **দৃশ্যমান, আলট্রাভাইলেট, ইনফ্রারেড এবং রেডিও বিকিরণের** উপর গবেষণা করে। এছাড়া গ্রহের ম্যাগ**নেটিক ফিল্ড ও চার্জড্ কণা** এবং আন্তগ্রহ মহাকাশে বিচরণশীল অন্যান্য কণা সম্পর্কেও অনেক পরীক্ষা করেছে যানগুলো।

এরপর নাসা (**নেশন্যাল এরোনোটিক্স এন্ড স্পেইস এডমিনিস্ট্রেশন**) **কাসিনি** নামক একটি মহাকাশযান শনির দিকে প্রেরণ করে **১৯৯৭** সালের অক্টোবরে। দীর্ঘদিন ভ্রমণশেষে সে শনির নিকটে পৌঁছে ২০০৪ সালের জুলাই মাসে। কাসিনিকে শনি ও তার কয়েকটি বিশেষ চন্দ্রের নিকট-মহাকাশে প্রদক্ষিণরত রাখা হয়েছে। চন্দ্র **টাইটানের** উপরে সে একটি **'প্রোব'** (ছোট্ট যান) প্রেরণ করে। এই প্রোব ২০০৫ সালের প্রথমদিকে সফলভাবে টাইটানের উপর অবতরণ করেছে। এসব মিশন থেকে আমরা শনি ও তার বেশ ক'টি চন্দ্র সম্পর্কে অনেক জ্ঞানবান হয়েছি।

শনির অভ্যন্তর

আশ্চর্যের ব্যাপার! এই বিরাট গ্রহটিকে বিরাট



বিরাট কোন মহা-মহাসাগরে ফেলে দিলে সে ভাসতে থাকবে! বিষয়টা বুঝার ব্যাপার বৈকি। আসলে কোন বস্তু পানিতে ভাসা কিংবা ডুবা নির্ভর করে তার ঘনাঙ্কের উপর। আর ঘনাঙ্ক মানে কিউবিক ভলিউমে কি পরিমাণ বস্তু আছে তার একটি হিসাব। সৌরজগতের সব গ্রহের তুলনায় শনির ঘনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ শনির ঘনাঙ্ক আমাদের পৃথিবীর তুলনায় আট গুণ কম। শনিগ্রহ মূলত অতি পাতলা **হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী**। এবার আসা যাক, পানিতে ভাসার বিষয়ে।

পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত, কোন বস্তুর ঘনাঙ্ক যদি পানির ঘনাঙ্কের তুলনায় কম হয় তাহলে সে বস্তু পানিতে ডুবে যাবে না- ভাসতে থাকবে। শনির ঘনাঙ্ক হলো **৭০০ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার**, যা পানির তুলনায় কম (**পানির ঘনাঙ্ক = ১০০০ কিলোগ্রাম/কিউবিক মিটার**)। সুতরাং সে পানিতে ভাসবে। যা হোক এ ভাসার ব্যাপারটি **'হাইপোথিটিক্যাল'**, কারণ পরীক্ষা করে প্রমাণের কোন উপায় নেই!

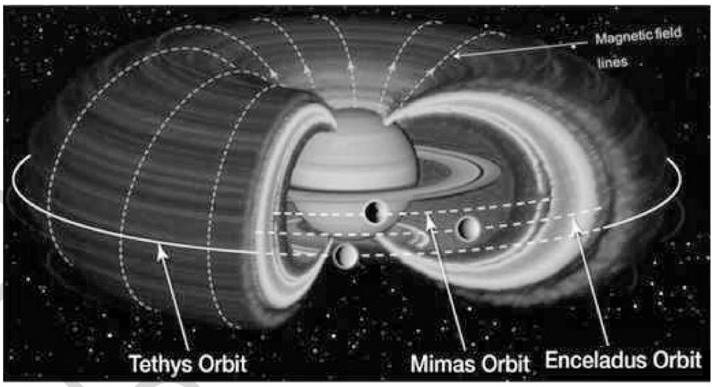
শনির বায়ুমণ্ডলের চাপ কিন্তু বিরাট। অভ্যন্তরের দিকে সৃষ্ট এই চাপশক্তি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে কেন্দ্রে যেয়ে বিরাট প্রতিক্রিয়া করে। সেখানকার গ্যাসকে এই শক্তি তরল পদার্থে রূপান্তর করে রেখেছে। আমরা যখন গ্রহের ঠিক কেন্দ্রে যেয়ে পৌঁছবো, তখন দেখতে পাবো পুরো কৌর বা মধ্য-অভ্যন্তরে বিরাজ করছে একটি ছোট্ট হাইড্রোজেনের তৈরী ধাতুতে পরিণত বল। এ অবস্থায় হাইড্রোজেন হয়ে ওঠে **ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার** (বিদ্যুৎ বহনকারী ধাতু)। আর এই ধাতু-হওয়া হাইড্রোজেন এতে সৃষ্টি বিদ্যুৎপ্রবাহই মূলত গ্রহের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টির জন্য দায়ী। কেন্দ্রের তাপমাত্রাও বিরাট- সম্ভবত ১৫ হাজার সেন্টিগ্রেড (২৭ হাজার ফারেনহাইট) পর্যন্ত হতে পারে। অভ্যন্তরস্থ এই বিরাট তাপমাত্রা ও সংকোচন ক্রিয়া থেকেই শনি নিজের থেকে বিরাট মাত্রার তাপ-এনার্জি বাইর মহাকাশে ছেড়ে দেয়। অথচ শনি পৃথিবীর তুলনায় মাত্র ১.১ শতাংশ রৌদ্র সূর্য থেকে পেয়ে থাকে।

বায়ুমণ্ডল

আগেই বলেছি শনির চতুর্দিকে বিরাট একটি বায়ুমণ্ডল আছে। এতে সর্বাপেক্ষা বেশী বস্তু (ম্যাস) হলো **হাইড্রোজেন (৮৮%)**, এরপর **হিলিয়াম (১১%)**; অন্যান্য- **মিথেইন, এমোনিয়া, এমোনিয়া ক্রিস্টেল, ইথেইন গ্যাস, এসিটাইলিন** এবং **ফোসফাইন**। এ সবগুলো মিলে বাকী ১% বস্তু আছে বায়ুমণ্ডলে।



উপরে **ভয়েজার-২** থেকে নেওয়া ছবিটি দেখুন। ছবিটি **'ইনফ্রারেড'** তরঙ্গে তোলা। এ থেকে বিজ্ঞানীরা গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। বায়ুমণ্ডলের মেঘমালার তাপমাত্রা মাত্র **-১৭৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-২৮৫ ফারেনহাইট)**। লক্ষ্য করুন, মাইনাস (-) সাইন। এই তাপমাত্রা সত্যিই **'ভীষণ ঠাণ্ডা'**। ফলে ওসব মেঘমালা বেশ ওজনবিশিষ্ট- অর্থাৎ সংকোচিত। শনিগ্রহে বাতাসও বয়ে যায় ঋতুর পরিবর্তন হেতু। ঋতু পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত রিং থেকে পতিত ছায়া। বাতাসের গতির মধ্যে বেশ পরিবর্তন ঘটে। কাসিনি মহাকাশযান আবিষ্কার করেছে, ১৯৮০ সালে মাপা বাতাসের গতি ছিলো, **১,৭,০০০ কিমি (১,০৬০ মাইল)** পর্যন্ত। কিন্তু ২০০৭ সালের দিকে তা কমে **১,০০০ কিমি (৬২১ মাইল)** -এ নেমে এসেছে। প্রথম মাপটি করেছিল **ভয়েজার-২** মহাকাশযান।



ম্যাগনিটোস্ফিয়ার

সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির তুলনায় শনির ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি অনেক কম। তার ম্যাগনিটোস্ফিয়ার অনেক ছোট- বৃহস্পতির তুলনায় তা মাত্র তিন ভাগের একভাগ হবে। এরপরও তা গ্রহের কেন্দ্র থেকে অন্তত ২০ লক্ষ কিলোমিটার দূর-মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। শনির **মাইমাস** ও **এনসেলাডাস** নামক নিকটস্থ দু’টি উপগ্রহ এই ম্যাগনিটোস্ফিয়ায়ের ভেতরে অবস্থিত (দেখুন উপরের চিত্রটি)। তবে এ আয়তন কমবেশী হয়। **সোলার উইন্ড** (সৌরবাতাস) বৃদ্ধি পেলে সূর্যের দিকের গোলক সংকোচিত ও বিপরীত দিকের গোলক বর্ধিত হয়। ম্যাগনিটোস্ফিয়ার থাকার ফলেই গ্রহের বায়ুমণ্ডলসহ উপরিভাগ ওসব উচ্চগতিসম্পন্ন কণার বম্বার্ডমেন্ট থেকে মুক্ত থাকে। সুতরাং যেসব গ্রহে এই ম্যাগনিটোস্ফিয়ার অনুপস্থিত ওসব গ্রহের উপরে কোন প্রাণীজীবন বেঁচে থাকা কঠিন হবে। আমাদের পৃথিবীর ম্যাগনিটোস্ফিয়ার সূর্য থেকে আগত এসব ক্ষতিকর বস্তু থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখে। সৌরজগতে আমাদের ভ্রমণের অংশ হিসাবে পৃথিবীর নিকট পৌঁছে অবশ্যই আমরা এই নীলাম্বরী গ্রহটির উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। আর মাত্র দু’টি গ্রহ, বৃহস্পতি ও মঙ্গল পরেই আমরা সেখানে পৌঁছবো- নভোচারী সাথী! একটু ধৈর্য ধরুন। আমাদের মা-গ্রহ তো আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আদরের ও গুরুত্বহ। তাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা অবশ্যই গভীরে যাবে। যা হোক ফিরে আসি শনিতে।

শনির ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের **‘ঘূর্ণন’** কিছুটা অদ্ভুত। অন্যান্য সকল গ্রহের নিজের ঘূর্ণন (আহ্নিক গতি) এবং ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের ঘূর্ণন একই রেইটের হয়ে থাকে। কিন্তু শনির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। **কাসিনি মহাকাশযান** থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা গেছে শনির এই উভয় (আহ্নিক ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের ঘূর্ণন) গতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যবধান মাত্র ৬ মিনিটের হলেও এটা প্রমাণ হলো, ম্যাগনিটোস্ফিয়ার ও বাস্তব গতি ভিন্ন হতে পারে। এটুকু বলার একটা বিশেষ কারণ হলো, বিজ্ঞানের কাজ ক্রমপরিবর্তনশীল স্বভাবকে উন্মোচন করা। ইতোমধ্যে সবাই মনে করতেন গ্যাসীয় বড় বড় গ্রহের আহ্নিক গতি

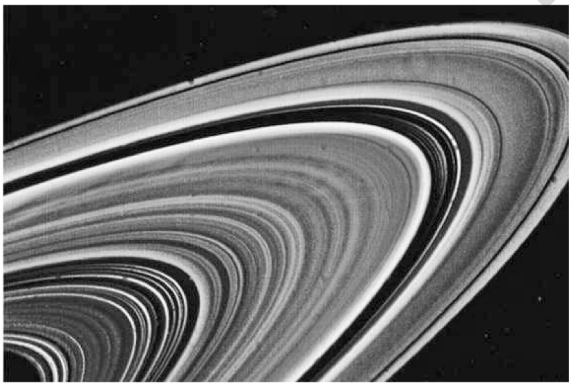
> **ম্যাগনিটোস্ফিয়ার (magnetosphere)**: গ্রহ থেকে বাইর মহাকাশ পর্যন্ত অদৃশ্য গোলক। বাংলায় একে **‘চুম্বকগোলক’** বলা যায়। এতে বিদ্যমান গ্রহের ম্যাগনেটিক শক্তির ফলে চার্জ-হওয়া পরমাণু আটকা পড়ে।

> **সৌরবাতাস (solar wind)**: সূর্য থেকে উচ্চ গতিসম্পন্ন অণু-কণা সর্বদাই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব **‘আইয়োনাইজ্‌ড’** (বৈদ্যুতিকভাবে চার্জ-হওয়া) কণা আন্তঃগ্রহ মহাকাশ পেরিয়ে গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে পতিত হয়। এই চলমান অণু-কণাকেই বলে **‘সোলার উইন্ড’** বা সৌরবাতাস।

মাপার উপায় ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের ঘূর্ণন থেকে পাওয়া যাবে। বাস্তবে এভাবে মেপেই আমরা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন- এ চারটি বৃহৎ গ্রহের আহ্নিক গতি নির্ণয় করেছি। **কাসিনির** তথ্য থেকে এ সত্য আর গ্রহণযোগ্য হবে না যে, গ্রহের ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের আহ্নিক গতি ও বাস্তব আহ্নিক গতি সমান। সুতরাং বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে, শনির সঠিক আহ্নিক গতি আমাদের এখনো জানা হয় নি- তা **১০.৫ ঘণ্টার কাছাকাছি হতে পারে**- এই যা।

শনির রিং সিস্টেম

পৃথিবী বা এমনকি নিকট-মহাকাশে স্থাপিত বড় বড় টেলিস্কোপ দিয়ে শনির উজ্জ্বল রিংগুলো সহজে দেখা গেলেও বাইরের এবং ভেতরের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বলগুলো মোটেই দেখায় না। নিম্নের ছবিটি দেখুন। কাসিনি মহাকাশযান ২০০৪ সালে এই ছবিটি পৃথিবীতে প্রেরণ



করেছে। এতে সুস্পষ্ট- শনির রিং অনেক চওড়া ও চেপ্টা। রিংগুলো মূলত দ্রুত গতিশীল প্রদক্ষিণরত অসংখ্য **শিলাখণ্ড, গ্যাস ও বরফ**। নিকট-পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে কয়েক লক্ষ একক রিংয়ের সমন্বয়ে পুরো রিং সিস্টেম গঠিত।

ইতালির বিজ্ঞানী **গালিলিও ১৬১০** সালে তার ছোট্ট টেলিস্কোপ দিয়ে যখন এই রিং সিস্টেম প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তিনি বুঝতে বা দেখতে পারেন নি, এগুলো শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। তিনি ভেবেছিলেন, এগুলো গ্রহের **'হাতল'!** তবে ডাচ বিজ্ঞানী **ক্রিস্টিয়ান হাইজেন্স** ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম **১৬৫৫** সালে এই থিওরী তুলে ধরেন: **রিংগুলো আসলে গ্রহ থেকে আলাদা সিস্টেম; এগুলো গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে।**

প্রতিটি বৃহৎ রিংকে ইংরেজী অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে; যেমন, D, C, B, A, F, G ও E ইত্যাদি। দৃশ্যমান দূরতম রিং গ্রহের কেন্দ্র থেকে **১,৩৬,২০০ কিমি (৮৪, ৬৫০ মাইল)** দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু রিংয়ের গাঢ়ত্ব সর্বোচ্চ **৫ মিটার (১৬.৪ ফুট)** মাত্র। এ কারণেই সাইড থেকে রিংগুলো একটি রেখার মতো দেখায়। নীচে **০.০০০৫ সেন্টিমিটার (০.০০০২ ইঞ্চি)** থেকে উর্ধ্বে **১০ মিটার (৩৩ ফুট)** পর্যন্ত ব্যাসবিশিষ্ট অসংখ্য বস্তু দ্বারা এসব রিং গঠিত। পুরো রিং সিস্টেমের বস্তুর সমন্বিত ওজন পৃথিবীর চন্দ্রের তুলনায় এক-ষষ্ঠাংশ হবে।

রিং A ও রিং B এর মধ্যে দূরত্ব বিদ্যমান। এই ভাগ-হওয়াকে বলে **'কাসিনি ডিভিশন'**। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী **জিওভানি কাসিনি** এ ব্যাপারটি প্রথম সনাক্ত করেন বলে তারই নামানুসারে এটির নামকরণ হয়েছে। যা হোক, রিং ও তাদের ফিজিক্স সম্পর্কে এখনো অনেক ব্যাপার জানা যায় নি। তবে থিওরীর অভাব নেই। ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। সঠিক তথ্য হয়তো অচিরেই বেরিয়ে আসবে। মহাকাশ ভ্রমণের যুগ তো এইমাত্র শুরু হয়েছে। সমগ্র সৌরজগতব্যাপী মানবজাতির বিচরণ মূলত অসম্ভব নয়। আমরা তখন অনেকে হয়তো এ পৃথিবীতে থাকবো না- কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে সৌরজগতসহ পুরো মহাবিশ্বের উপর আরোও জ্ঞানবান হবে, বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করে আরোও বিস্মিত হবে, তা নিশ্চিত। এখন,

আমাদেরকে বস্তুজগৎ নিয়ে যা কিছু জানা গেছে তার উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। আর এ পর্যন্ত জানা তথ্যের মাত্রা ও বিস্ময়তা মোটেই কম নয়। আসুন, শনি সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নিই। বিশেষকরে তার অসংখ্য চন্দ্রের মধ্যে বড় ক’টির উপর আমাদের আলোচনার স্কোপ নিবদ্ধ রাখা উচিত।

শনির ক’টি বড় চন্দ্র

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, শনিগ্রহের এ পর্যন্ত মোট চন্দ্রের সংখ্যা ৬২-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে তিপ্পান্নটির নামকরণ করা হয়েছে। সমগ্র সৌরজগতের অধিকাংশ জানা বস্তু ও তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্যাদির একটি বড় **‘এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যের টেবিল’** গ্রন্থের শেষে ছাপিয়ে দিয়েছি। নভোচারী সহযাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, যে কোন বস্তুর উপর আরো জানতে ঐ টেবিলটি দেখে নেবেন। এবার আসুন, শনির বড় ক’টি চন্দ্রের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা যাক।

টাইটান

শনির চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোট ৬২টি চন্দ্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপগ্রহের নাম **টাইটান**। এ চন্দ্রের চতুর্দিকে একটি বায়ুমণ্ডলও আছে। তবে উপরিস্থ তাপমাত্রা অতি অল্প। শুধু আমাদের চাঁদের চেয়ে সে বড় নয়, তবে প্রথম গ্রহ বুধের থেকেও **টাইটান** আয়তনে বড়। তার ব্যাসার্ধ **২,৫৭৫ কিমি (১,৬০০ মাইল)**। একটি চন্দ্র হিসাবে সমগ্র সৌরজগতের সকল চন্দ্রের মধ্যে টাইটান বড়ত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে। সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির চাঁদ **গানিমিড** প্রথম স্থানের অধিকারী। তা-ও খুব এটা নয়- এর ব্যাসার্ধ মাত্র **১১২ কিমি (৬২ মাইল)** বেশী।

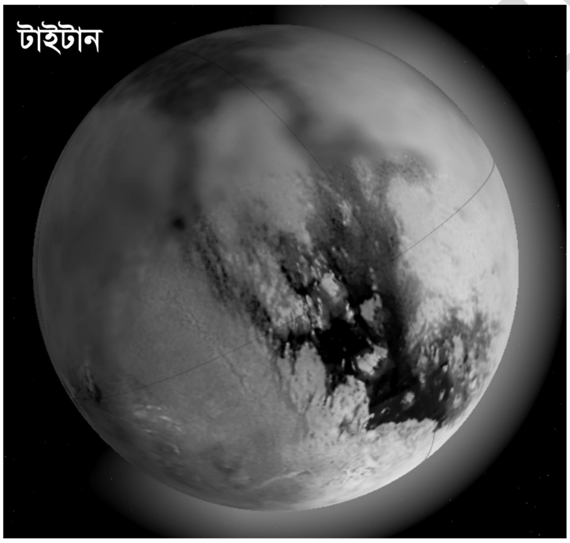
টাইটানের সারফেস তাপমাত্রা মাত্র **-২৮৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট (-১৭৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)**। এটা তার মা-গ্রহ শনিকে গড়ে **১২ লক্ষ কিলোমিটার (৭ লক্ষ ৪৫ হাজার মাইল)** দূরে থেকে প্রতি **১৬ পৃথিবী-দিবসে** একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। টাইটানের বায়ুমণ্ডল থাকায় বিজ্ঞানীরা একে নিয়ে খুব বেশী গবেষণা চালাচ্ছেন। সৌরজগতের অপর কোন চন্দ্রের অনুরূপ গ্রহসদৃশ গাঢ়, মেঘমালায় পরিপূর্ণ বায়ুমণ্ডল নেই। আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা **নাসা** কর্তৃক প্রেরিত **ভয়েজার-১ মহাকাশযান** টাইটানের নিকটবর্তী হয়। বেশ কিছু ছবি প্রেরণ করে। এ থেকে আমরা টাইটান সম্পর্কে অনেক ব্যাপার অবগত হয়েছি। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার জানা গেছে: **পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায়ও তার চাপ**

কাসিনি প্রোব থেকে নেওয়া টাইটানের শুষ্ক ভূমির একটি ছবি।



৬০% বেশী! ৫ মিটার গভীর কোন পুকুরের তলদেশে যে পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হয় ঠিক ততটুকু চাপ আছে টাইটানের বায়ুমণ্ডলে। মহাকাশে স্থাপিত হাবল টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত কিছু ছবি দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, টাইটানের সারফেসে একটি বড় **মহাদেশ** আছে। তবে তরল আকারে কোন **'মহাসাগর'** আছে কি না তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি। এ সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শনির কক্ষপথে এখনও প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ **কাসিনি-হাইজেন্স** থেকে হয়তো আমরা অচিরেই এই বিরাট চন্দ্রটি সম্পর্কে আরো অনেককিছু জানতে সক্ষম হবো। এই মহাকাশযানে কিছু বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে। এগুলো টাইটানকে পরীক্ষার জন্য তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং নিরাশার কিছু নেই।



কাসিনি-হাইজেন্স মিশন যদি পুরোদমে সফল হয়- আর এ পর্যন্ত বিফল হওয়ার কোন অশনি সংকেত পাওয়া যায় নি, তাহলে আমরা হয়তো কিছু অত্যাশ্চর্য বিষয় আবিষ্কার করতে পারি এই রহস্যজনক চন্দ্রটির ব্যাপারে।

ইতিহাস: ডাচ এ্যাস্ট্রনোমার **ক্রিশ্চিয়ান হাইজেন্স** ১৬৫৫ সালের ২৫ মার্চ এই চন্দ্রটি আবিষ্কার করেন। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর একটি চরিত্রের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় টাইটান।

রিয়া

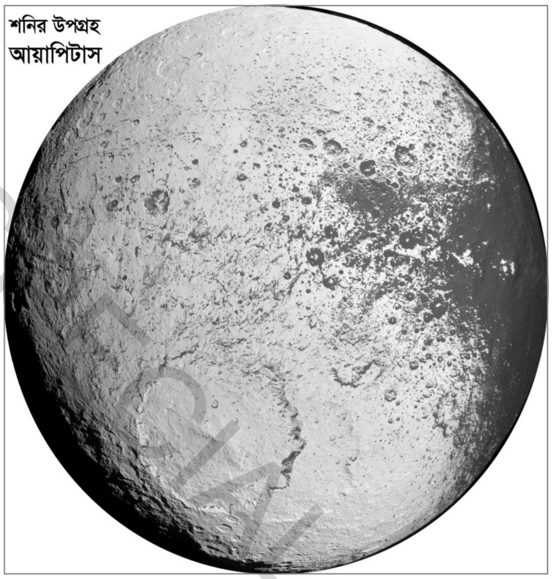
এই চন্দ্রটিও বলের মতো। তবে টাইটান থেকে অনেক ছোট। সে গড়ে **৫,২৭,০০০ কিমি (৩,২৭,০০০ মাইল)** দূরে থেকে শনিকে প্রতি **৪.৫ ঘণ্টায়** একবার প্রদক্ষিণ করে। রিয়ার গোলকের ব্যাস **১৫৩০ কিমি (৯৫১ মাইল)**। এটি শনির দ্বিতীয় বৃহৎ চন্দ্র। নিকটস্থ আরেক চন্দ্রের নাম **ডায়োন**। রিয়া তারই মতো। আমরা একটু পরই ডায়োন সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরবো। তবে রিয়া ডায়োন থেকে দ্বিগুণ ওজনসম্পন্ন। ডায়োনের ব্যাসও রিয়ার তুলনায়

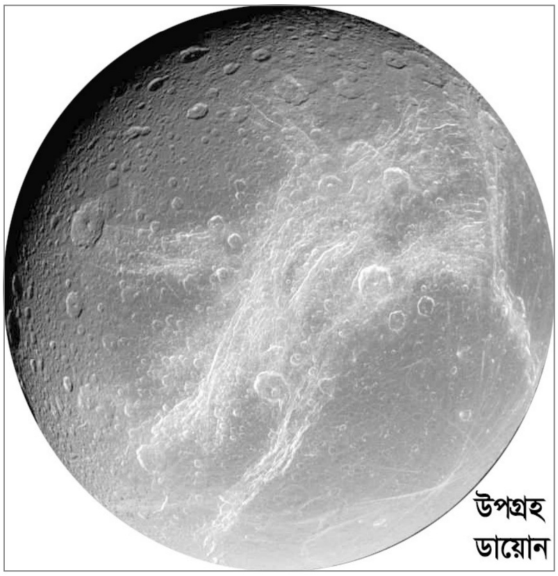


অর্ধেক মাত্র। এ চন্দ্রে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। থাকার মতো যথেষ্ট বস্তু (ম্যাস) থেকে সে বঞ্চিত বলেই বায়ুমণ্ডলহীন উলঙ্গ এ চাঁদটি।

আয়াপিটাস

শনির তৃতীয় বৃহৎ চন্দ্র এটি। সে তার মা-গ্রহ





শনি থেকে গড়ে **৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিমি (২০ লক্ষ ২১ হাজার মাইল)** দূরে অবস্থান করে প্রতি **৭৯ দিনে** একবার প্রদক্ষিণ করে। আয়াপিটাস শনির সর্বাপেক্ষা বড় দূরতম চন্দ্র। সুতরাং তার থেকে আরো দূর-দূরান্তে প্রদক্ষিণরত বেশ ক'টি চন্দ্র আছে যারা আয়তনে ছোট্ট। গোলকাকার এই চন্দ্রের ব্যাস **১৪৬০ কিমি (৯০৫ মাইল)**। আমাদের চন্দ্রের ব্যাসের তুলনায় সে মাত্র অর্ধেক ব্যাসবিশিষ্ট। চন্দ্রটি কিসের তৈরী তা এখনো জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয়, ভীষণ ঠাণ্ডা এই চাঁদ হয়তো হিমায়িত পানির তৈরী হবে।

ভয়েজার-২ থেকে নেওয়া ছবি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এ চাঁদের উপর চারটি বড় আয়তনের পতন-গর্তের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে: **অথোন, অজিয়ার, শারলেমেন ও বাসান**। এগুলোর অর্থ কি আমি জানি না! গ্রীক মিথোলজির চরিত্র ছাড়া আর কি! প্রতিটি গর্তের ব্যাস অন্তত **১০০ কিমি** হবে। আগে আলোচিত চন্দ্র রিয়া ও এটির আবিষ্কারক ইতালিয়ান মহাকাশ বিজ্ঞানী **জিওভানি কাসিনি**। সেই **১৬৭১** সালে তিনি এ দু'টো আবিষ্কার করেন। এই চন্দ্রের মধ্যেও কোন বায়ুমণ্ডল নেই।

ডায়োন

গোলকাকার এই বড়ো চন্দ্রের ব্যাস **১১২০ কিমি (৬৭২ মাইল)**। সে **হেলিনি** নামক অপর আরেক চন্দ্রকে নিয়ে একই কক্ষপথে ঘুরে। অবশ্য একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব বজায় থাকে! শনি থেকে এদের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার কিলোমিটার (২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল)। পৃথিবীর হিসাবে মাত্র ৩ দিনের মধ্যে সে প্রদক্ষিণপথ পাড়ি দেয়। ডায়োন টাইটান থেকে বেশ ছোট্ট। তবে তার মধ্যে বস্তুর ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী। ধারণা করা হয় তার কেন্দ্র মূলত শিলা পাথরের তৈরী। বাইরের অংশ **‘কদাকার বরফে’** আবৃত।

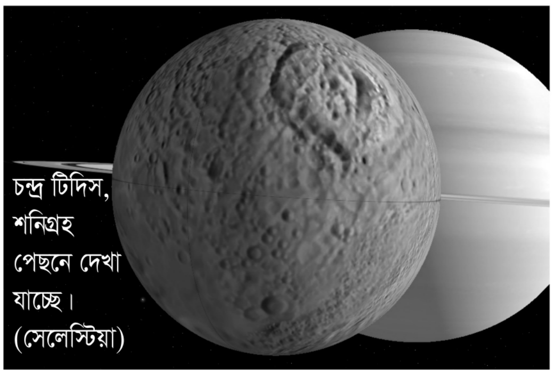
ডায়োনকে তার পেছনদিকে অনেক এ্যাস্টারোইড বম্বার্ড করেছে। অর্থাৎ সে যেদিকে ঘুরে তার বিপরীত দিকের অর্ধগোলকে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য **ইম্পেক্ট ক্রেটার** (পতন-গর্ত)। এ ব্যাপারটি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। অধিকাংশ গ্রহ-উপগ্রহে সৃষ্ট গর্ত সামনের দিকে দেখা যায়। পেছনদিক থেকে এ্যাস্টারোইডদের পতন মানে তাড়া করে আসা! কিন্তু অনেকে মনে করেন, আসলে একে কোন বড় এ্যাস্টারোইড

আঘাত হেনে তার মাথা ঘুরিয়ে ফেলেছে!

যাক, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দু'টি গর্তের নাম **ডিডো** ও **এয়েনিয়াস**। এগুলোর নামকরণের রসহ্যও আমার জানা নেই! সাথী নভোচারী পাঠকদের আহ্বান জানাচ্ছি **'ধারণা'** করতে। প্রথমটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব **১২৫ কিমি (৭৮ মাইল)** আর দ্বিতীয়টির দূরত্ব **১৫০ কিমি (৯৩ মাইল)**। এ চন্দ্রটিও ইতালীয় মহাকাশবিজ্ঞানী **জিওভানি কাসিনি** ১৬৮৪ সালে আবিষ্কার করেন। শনির আরো একটি বেশ বড়ো চন্দ্রের উপর আমরা এখন আলোচনা করবো। এরপর শনি ও তৎপার্শ্ববর্তী মহাশূন্য থেকে বিদায় নেবো।

টিডিস

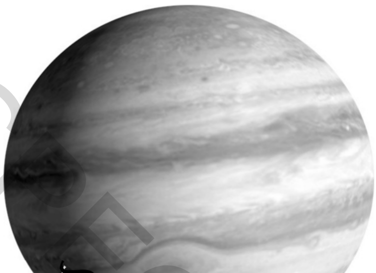
এই চন্দ্রটির আবিষ্কারকও **জিওভানি কাসিনি**। তিনি এটির সন্ধান পান ১৬৮৪ সালে। শনি থেকে টিডিসের গড় দূরত্ব **২,৯৫,০০০ কিমি (১,৭৭,০০০ মাইল)**। পৃথিবীর ২ দিনে সে শনির চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসে। গোলকাকার এ চন্দ্রটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব হলো **১০৬০ কিমি (৬৩৬ মাইল)**। এ হিসাবে সে আমাদের চন্দ্রের তুলনায় তিন-ভাগের এক ভাগ আয়তনবিশিষ্ট মাত্র। টিডিসের অভ্যন্তরীণ বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত। যা জানা গেছে তাতে এটাই নিশ্চত, তার ঘনাঙ্ক খুব একটা



চন্দ্র টিডিস, শনিগ্রহ পেছনে দেখা যাচ্ছে। (সেলেস্টিয়া)

বেশী নয়। মনে করা হয়, এর ছোট্ট কেন্দ্র হিমায়িত পানি ও শিলা-পাথরের তৈরী। তবে টিডিসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো তার সারফেস বা উপরিভাগে ঘন ঘন গর্ত দেখা যায়। এ্যাস্টারোইড পতনের ফলে সৃষ্ট এসব গর্তের কোন কোনটি বেশ বড়। যেমন, **অডিসিয়াস** নামক গর্তটির ব্যাস **৪০০ কিমি (২৪০ মাইল)**। পুরো চন্দ্রের পাঁচ ভাগের একভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই গর্তটির জন্য দায়ী এ্যাস্টারোইড পতনের ফলে চাঁদটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা- কিন্তু হয় নি। কেন হয় নি? সঠিক উত্তর এখনও কেউ জানেন না। ধারণা করা হয়, পতনের সময় হয়তো টিডিস আজকের মতো শিলা-পাথরবিশিষ্ট শক্ত চাঁদ ছিলো না। সেই কলির যুগে অনেকটা নরম তরল পদার্থের সৃষ্ট থাকায় বেঁচে গেছে! তবে বাঁচলেও ফাটল ধরা থেকে রেহাই পায় নি। তার গায়ে একটি দীর্ঘ ফাটল পাওয়া গেছে। অদ্ভুত নামকরণ করার প্রতি আগ্রহশীলরা অবশ্য এই ফাটলটিরও নামকরণ করেছেন- **'ইতাকা চাজমা'**। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন খারাপ না, **ইতাকা** আমেরিকার একটি ছোট্ট শহরের নাম আর **'চাজমা'** শব্দের অর্থ গ্রহ-উপগ্রহে প্রাপ্ত গভীর উপত্যকা বা ফাটল যার উভয়দিক অনেকটা খাড়া। **ইতাকা চাজমা ১০০ কিমি (৬০ মাইল)** চওড়া। এটি **৩ থেকে ৫ কিমি** পর্যন্ত গভীর। আর তার দৈর্ঘ্য প্রায় **২০০০ কিমি (১২০০ মাইল)**। অর্থাৎ টিডিসের এই ফাটল উপগ্রহের পরিধিরেখার দৈর্ঘ্যের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ লম্বা! টিডিসের উপর এই স্থায়ী বড় **'কলঙ্ক'** যে মূলত **অডিসিয়াস** সৃষ্টির এ্যাস্টারোইডের কাজ তা অনেকটা নিশ্চিত। অবশ্য অন্য **'থিওরী'** যে নেই তা কিন্তু নয়। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আসলে এই দূর-দূরান্ত মহাকাশ থেকে এখন আমাদের চলে যাওয়ার পালা। আমাদের দৃষ্টি এখন সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির দিকে। আসুন, আমাদের কল্পনার মহাকাশ যানকে পুনরায় গতিশীল করি।

৬



সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির কাছে

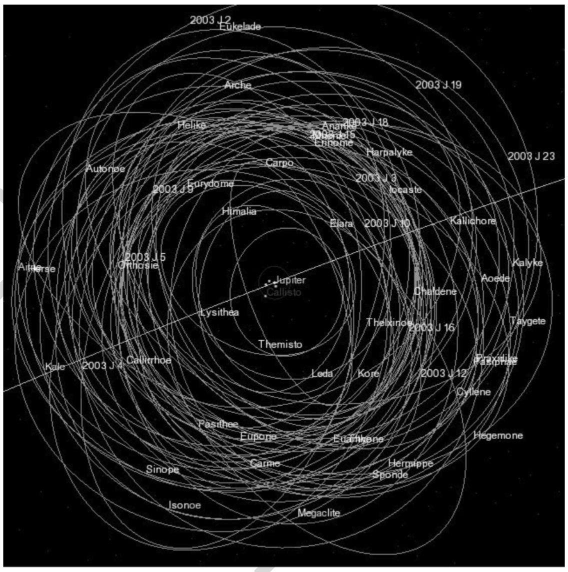
বৃহস্পতি

শনি থেকে এখন আমাদের অবস্থান **৫২,৬৫০ কিলোমিটার** দূরে। তবে আমরা তার রিং থেকে দূরে নয়। নীচের চিত্রে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট দেখাচ্ছে। রিংয়ের ভেতর দিয়ে আমরা সূর্য, শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহ দেখতে পাচ্ছি। তবে এখানে স্থির থাকা আমাদের উদ্দেশ্য নয়- যেতে হবে

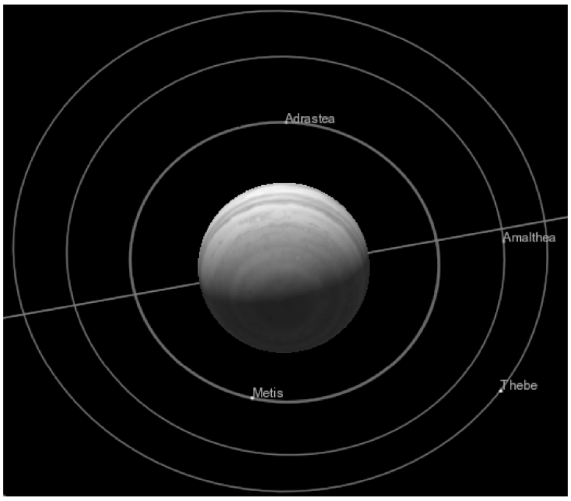


অনেক দূরে। সেলেস্টিয়া বলে দিলো, শনির এই এলাকা থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব **১৪.৪২৪ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (১৩৪,০৭,৯৪,৫৭৫ মাইল)**। সূর্যের দূরত্ব **৯.৭১৯৪ এইউ (৯০,৩৪,৭৪,৬৮০ মাইল)**। বুঝা গেলো আমাদেরকে অপরপ্রান্তে ভ্রমণ করতে হবে। অবশ্য মনে রাখা দরকার এই মুহূর্ত ও স্থানে অবস্থানকালের হিসাব এটি (অর্থাৎ বুধবার, এপ্রিল ৪, ২০১২ ঈসায়ী, সময় ৪.২৪ মিনিট, স্থান: সিলেট শহর, বাংলাদেশ)। আমাদের মূল গাইড প্রোগ্রাম সেলেস্টিয়া গণিতের মাধ্যমে মহাকাশের জানা সকল বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব, তুলনামূলক আয়তন, কক্ষপথে ঘূর্ণন, আহ্নিক গতি ইত্যাদি হিসাব করে কম্পিউটারে ৩ বিস্তৃতি-সম্পন্ন **'মহাকাশের বাস্তবসদৃশ'** ছবি অঙ্কন করে দিচ্ছে। আমাদের প্রতিটি মুভমেন্ট সঠিকভাবে চিত্রিত করে উপস্থাপন করছে। যা হোক, এবার বৃহস্পতির দিকে যাত্রার পালা।

আমরা এক এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) দূরে এসে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম বৃহস্পতির দিকে। **সুবহানাল্লাহ! এতো আরেক বিরাট সৌরজগৎ!** বৃহস্পতির বাইর মহাকাশে ঘূর্ণনরত অসংখ্য চন্দ্র। তাদের কক্ষপথ অঙ্কন করে দেখিয়েছে সেলেস্টিয়া। দেখুন নীচের চিত্রটি। ইংরেজীতে নামও লিখা আছে এদের। কিন্তু আমরা এসব নাম এখানে উল্লেখ করছি না। গ্রন্থের শেষে উপগ্রহের **'টেবিলে'** জানা সকল তথ্যসহ নাম লিপিবদ্ধ করেছি- সুতরাং পুনঃউল্লেখের প্রয়োজন আছে কি? তবে হ্যাঁ, বৃহস্পতিকে ভালো করে সার্ভে শেষে আমরা অবশ্যই তার বৃহৎ ক'টি অতি-আকর্ষণীয় চন্দ্রের উপর আলোচনা করবো। এবার চলুন, গ্রহের আরো একটু কাছে যাই।



বৃহস্পতি থেকে এখন আমরা **৫৩ লক্ষ কিলোমিটার** দূর-মহাকাশে এসে পুনরায় গতিরোধ করলাম। এবার দেখাচ্ছিলো বৃহস্পতির গোলক এবং তার ক'টি অভ্যন্তরীণ উপগ্রহ। সেলেস্টিয়া এদের নামসহ প্রদক্ষিণ পথের রেখা অঙ্কন করে দেখিয়েছে। নীচের চিত্রে তা তুলে ধরেছি- একবার দেখে নিন। সেলেস্টিয়া একটি **'অত্যাশ্চর্য'** কম্পিউটার সিম্যুলেশন প্রোগ্রাম! যাদের কম্পিউটার আছে তাদের প্রতি অনুরোধ,



জগতকে চিনতে-জানতে হলে এই অপূর্ব প্রোগ্রামটি ইন্টারনেট থেকে **'ডাউনলোড'** করুন। এটা দেখে আপনি সত্যিই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবেন না। কী অপূর্ব এ মহাবিশ্ব! কী অপূর্ব **'গ্রান্ড ডিজাইন'!** সৌরজগৎ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার এরচেয়ে অধিক উন্নত কোন সূত্র আমার জানা নেই। সুতরাং আজই ডাউনলোড করুন। গ্রন্থের শেষে ডাউনলোড সাইটের ঠিকানা লিখে দিয়েছি। সেলেস্টিয়া সম্পূর্ণ **'ফ্রিওয়্যার'**। আপনাকে এটি ব্যবহার করতে এক পেনীও **'লাইসেন্স ফি'** দিতে হবে না।

উপরে সেলেস্টিয়া সম্পর্কে যা কিছু প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছি তা যৌক্তিক ও যথার্থ। কিন্তু নভোচারী সহযাত্রীদের এটাও জানিয়ে দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র সেলেস্টিয়ার উপর নির্ভর করে এই গ্রন্থ রচনা করি নি- দু'টি উন্নতমানের **ইনসাইক্লোপিডিয়াসহ** বেশ কিছু গ্রন্থের সহায়তা নিতে হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানের **'ছাত্র'** হিসাবে নিজের জানা অনেক ব্যাপার ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয়েছে এই গ্রন্থ প্রণয়নে। যা হোক, ফিরে আসি আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

বৃহস্পতির অভ্যন্তরীণ ওসব গ্রহের নাম হলো: (গ্রহের নিকট থেকে বাইরের দিকে) **১. মিটিস, ২. এডরাস্টিয়া, ৩. আমলথিয়া, ৪. থিবি, ৫. আয়ো, ৬, ইউরোপা, ৭. গানিমিড ও ৮. কালিস্টো**। আমরা এগুলোর মধ্যে চার-পাঁচটির উপর বিস্তারিত আলোচনা একটু পরই করবো। এবার আসুন, চলে যাই বৃহস্পতির একেবারে নিকটে, কেমন?

সৌরজগতের চারটি **গ্যাস-দৈত্য** গ্রহেরই রিং আছে। এগুলো মূল গ্রহের বায়ুমণ্ডল থেকেও অনেক দূরে মহাকাশে ঘূর্ণনরত। পাতলা থাকায় বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনের রিংগুলো দূর থেকে দেখায় না। একমাত্র শনির রিংই সর্বাপেক্ষা বেশী দৃশ্যমান ও সুন্দর। পৃথিবী থেকেও এগুলো দেখা যায়। বৃহস্পতির রিং খুব পাতলা। ১৯৭৯

সালে **ভয়েজার-১ মহাকাশযান** কাছে থেকে ছবি তুলে। এসব ছবির মধ্যে পাতলা ঐ রিংগুলো থাকার প্রমাণ স্পষ্ট হয়। যা হোক, রিং ও চন্দ্র নিয়ে আলোচনার পূর্বে সর্ববৃহৎ গ্রহটির উপর জানা তথ্যাদি এখন তুলে ধরা যাক।



পৃথিবী থেকেই বৃহস্পতি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু বেশ আগে জানতে পেরেছিলাম। এটি যে সূর্য থেকে বাইরের দিকে পঞ্চম গ্রহ তা লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকেই জানা ছিলো। পৃথিবীর আকাশে বৃহস্পতি চতুর্থতম **'উজ্জ্বল তারা'** হিসাবে দৃশ্যমান। অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে **সূর্য, চন্দ্র** এবং **শুক্র** গ্রহের পরই তার স্থান। সূর্য পরে আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সত্যিকার **'তারকা'** হলো **সিরিয়াস**। কিন্তু গ্রহ হিসাবে বৃহস্পতি এই জ্বলন্ত তারা সিরিয়াস থেকেও প্রায় তিন গুণ উজ্জ্বল দেখায়। রোমানরা তাদের কাল্পনিক **'গডদের'** নামানুসারে আকাশের অনেক বস্তুর নামকরণ করেছিল। তাদের এক বড় গডের নাম **'জুপিটার'**। সুতরাং তারা বৃহত্তম গ্রহের নামকরণ করেছে, জুপিটার। অবশ্য আমরা বৃহস্পতি নামেই সম্বোধন করবো।

সূর্য থেকে গড়ে **৭৭ কোটি ৮০ লক্ষ কিমি (৪৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল)** দূরে থেকে বৃহস্পতি সূর্যকে পৃথিবীর হিসাবে **১১.৯ (অর্থাৎ প্রায় ১২) বৎসরে** একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। তার একদিন বা আহ্নিক গতি হলো মাত্র **৯.৯ ঘণ্টা**।

বৃহস্পতি হলো একটি **'গ্যাস-দৈত্য'**। অভ্যন্তরীণ চারটি গ্রহই **(বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল)** মূলত **'টেরেস্ট্রিয়াল'** (অর্থাৎ শক্ত মাটি সম্বলিত) গ্রহ। বৃহস্পতির উপরিভাগেও গ্যাস-কোন শক্ত মাটি নেই। তবে ধারণা করা হয় তার কেন্দ্রটি শক্ত শিলা-পাথরের তৈরী। কিন্তু কেন্দ্রের বস্তুর পরিমাণ পুরো গ্রহের মোট বস্তুর ৫ শতাংশের উপরে হবে না। তার বিরাটত্বের ফলে উচ্চ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে মহাকর্ষ বিদ্যমান তা-ও কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় আড়াই গুণ বেশী। সুতরাং বৃহস্পতির উপরে আপনি অবস্থান করলে নিজের ওজন অনেক বেশী অনুভব করবেন।

বায়ুমণ্ডলের গ্যাস ও মেঘমালা খুব দ্রুত গতিশীল। এর কারণ এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি। গ্রহের বিষুবরেখা বরাবর উপরে এই গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুততর। বৃহস্পতির উচ্চ আহ্নিক (ঘূর্ণন) গতির ফলে গ্যাস ও মেঘমালাসর্বস্ব পুরো বায়ুমণ্ডল উপরের দিকে **'নিক্ষিপ্ত'** হয়। ব্যাপারটি বুঝার জন্য কোন কাদায় ভরা চাকার ঘূর্ণনক্রিয়া দেখা যেতে পারে। বাইরের দিকে সৃষ্ট গতির ফলে চাকা থেকে চতুর্দিকে কাদা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বৃহস্পতির পুরো বায়ুমণ্ডল এভাবে বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আহ্নিক উচ্চ গতি ও মহাকর্ষের মধ্যে **'ব্যালান্স'** সৃষ্টি হওয়ার ফলে পুরো গ্রহটি বলের মতো না হয়ে ধারণ করেছে অনেকটা কমলালেবুর আকার। উপরের চিত্রটি দেখুন। বিষুবরেখা বরাবর অধিক বেশী ঘূর্ণন গতি থেকে সে অঞ্চল অনেকটা ফুলে ওঠেছে। অপরদিকে উভয় মেরুতে তুলনামূলক নিম্ন আহ্নিক গতির ফলে সে অঞ্চল চাপা পড়ে ধারণ করেছে অনেকটা সমতল আকৃতি। ফলে বৃহস্পতির বিষুবরেখার **ব্যাস ১,৩৪,০০০ কিমি (৮৯,০০০**

মাইল) হলেও তার মেরুর দিকের ব্যাস **১,৩৩,৭০০ কিমি (৮৩,০০০ মাইল)** হয়েছে- যা প্রায় ৬.৫ শতাংশ কম।



দক্ষিণ মেরুর ২ লক্ষ ৮৬ হাজার কিমি উপর থেকে বৃহস্পতি। সৌজন্যে: সেলেস্টিয়া

পর্যবেক্ষণ

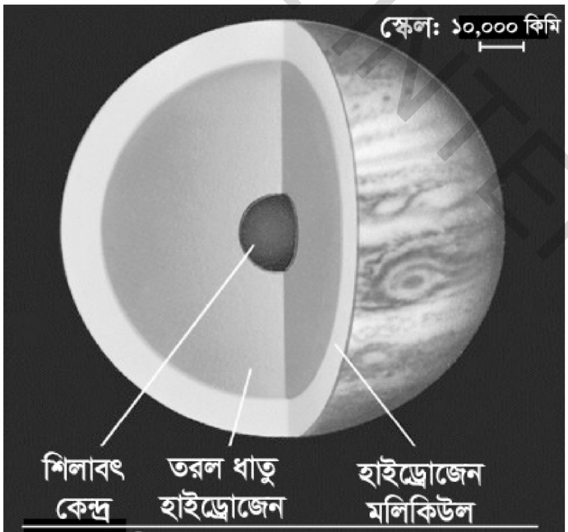
সৌরজগতের এই বৃহৎ গ্রহটি পৃথিবী থেকে খালি চোখে অতি সহজেই দেখা যায়। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ আদি যুগ থেকেই অবগত ছিলো। পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম একে পরীক্ষা শুরু করেন ইতালির **গ্যালিলিও গ্যালিলাই** সেই ১৬১০ ঈসায়ী সালে। তখন পর্যন্ত অনেকে সে-ই দ্বিতীয় ঈসায়ী শতকে প্রতিষ্ঠিত **'পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগৎ'** থিওরীর উপর বিশ্বাসী ছিলেন। **আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমি** নামক এক গ্রীক মহাকাশ বিজ্ঞানী এই থিওরীর জন্মদাতা। সাধারণত পৃথিবীর উপর অপেক্ষাকৃত অতি ছোট্ট আয়তনের মানুষ আমরা, যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন মনে হয়, যেনো পুরো আকাশমণ্ডলী পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভেতর এতো বড় মহাকাশ পুরো এক চক্কর দিয়ে ফেলে! এখন আমাদের নিকট ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সে-যুগে মানুষ মনে করতো এটাই বাস্তবতা। আশ্চর্যের বিষয়, আজকের যুগের কিছু জ্ঞানীরা পর্যন্ত একই ধারণা লালন করেন!

টলেমির **'থিওরী'** শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় ঈসায়ী পনেরো শতাব্দির শুরুতে। এ সময় **নিকোলাস কোপারনিকাস** নতুন এক থিওরী তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, আসলে পৃথিবীসহ সকল গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে, একটা নির্দিষ্ট আইনের আওতায়। **গ্যালিলিও** এই থিওরীকে খুব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তার এই বিশ্বাস আরো শক্তিশালী হলো তিনি নিজের তৈরী টেলিস্কোপ দ্বারা আবিষ্কার করলেন সৌরজগতের বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির, চারটে বড় উপগ্রহ- বা চন্দ্র। ওগুলো গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছিলো। **নিকোলাস কোপারনিকাসের** থিওরী মুতাবিক এদের কক্ষপথ অঙ্ক কষে বের করে দেখা গেল, তা অনেকটা বাস্তবতার কাছাকাছি। সুতরাং এ থেকে **'কোপারনিকান সৌরথিওরী'** বিজ্ঞানমহলে অন্তত গ্রহণযোগ্যতা পেলো। খ্রিস্টান পাদ্রীরা কিন্তু ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন। **গ্যালিলিওকে 'গৃহবন্দী'** করলেন। বাধ্য করলেন, **কোপারনিকাসের** থিওরীকে অস্বীকার করতে। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করলেন অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি। যাক, সে আরেক **'ইউরোপয়ী শক্তিশালী চার্চ শাসিত বিজ্ঞানবিমুখ অন্ধকার যুগের'** ইতিহাস।

ফিরে আসছি এ যুগে। কাল্পনিক ভ্রমণশীপে আমরা এখন বৃহস্পতির নিকটে অবস্থান করছি। এবার বৃহস্পতি সম্পর্কে জানা অন্যান্য তথ্যাদির উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির ওজন (ম্যাস) বেশ আগেই নির্ধারণ করেন। কিভাবে? যে কোন গ্রহের ওজন তার অকৃত্রিম উপগ্রহের প্রদক্ষিণ ও গতিমতি থেকে নির্ণয় করা সম্ভব। অবশ্য এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ। বিজ্ঞানের ভাষায়: **'কোন গ্রহ দ্বারা সৃষ্ট মহাকার্ষিক শক্তি নির্ভর করে তার নিজের**

ওজনের উপর।' সুতরাং বৃহস্পতির ওজন মাপা সম্ভব হয়েছে, তার দ্বারা সৃষ্ট মহাকার্ষিক শক্তি থেকে। এ শক্তি কতটুকু তা তার উপগ্রহের গতি থেকে জানা যায়। এরপরও বিজ্ঞানীরা সর্বাপেক্ষা সঠিক ওজন বের করতে গ্রহের পাশকেটে চলে যাওয়া **কৃত্রিম উপগ্রহ** থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন।

উপরে বর্ণিত উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে বৃহস্পতির অভ্যন্তর সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটি ছবি অঙ্কন করতে পারি। নিম্নে এ ছবিটি তুলে ধরেছি, ইন্টারনেটের সুবাদে- বাংলাকরণ কিন্তু আমার কাজ।

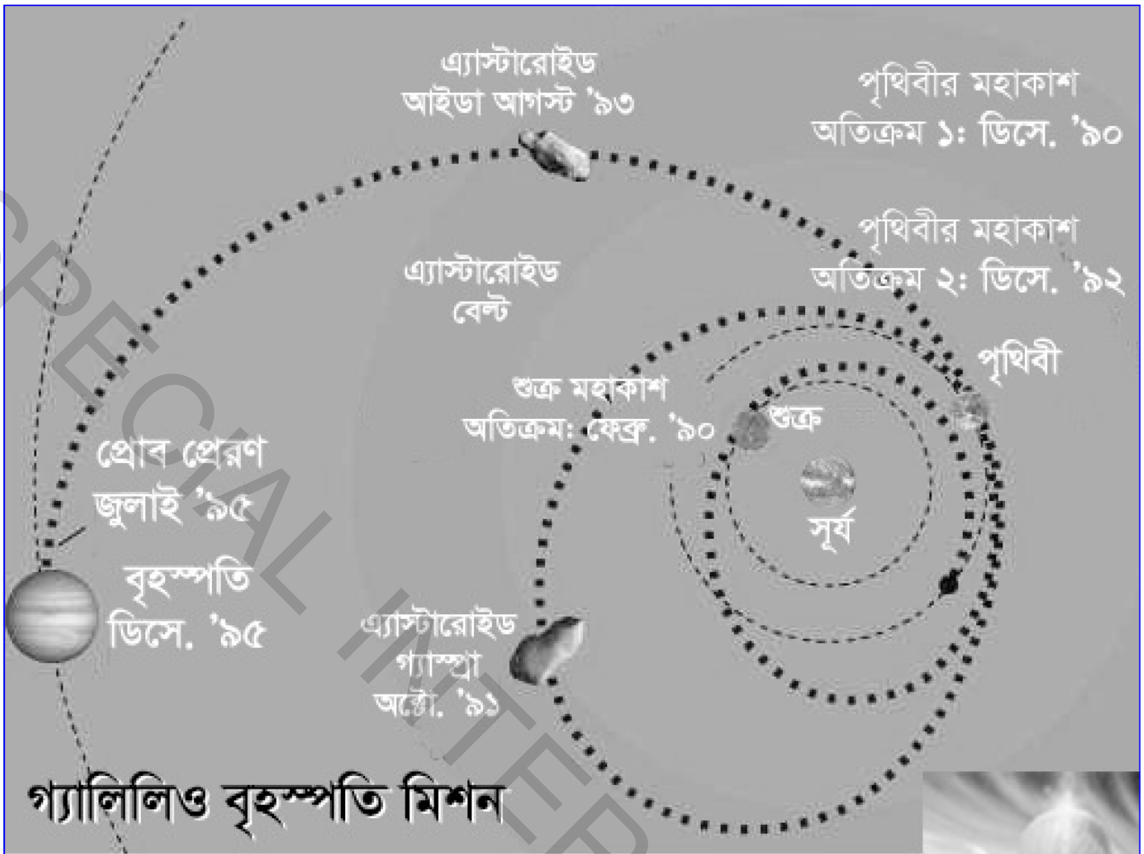


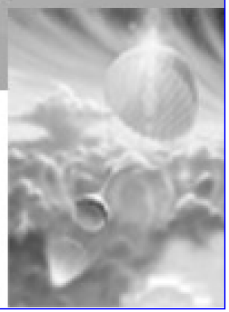
বৃহস্পতি গ্রহের (সম্ভাব্য) অভ্যন্তর

আমরা জানি বৃহস্পতি সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ। কতটুকু? পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো অনুধাবনযোগ্য হবে। বৃহস্পতির ব্যাসার্ধ (গোলকবৃত্তের কেন্দ্র থেকে বাইর পর্যন্ত দূরত্ব) পৃথিবীর তুলনায় **১১.৩ গুণ বেশী**। সুতরাং অঙ্ক কষে দেখা যায়, তার ভলিউম বা ঘনমান আমাদের গ্রহ থেকে **১,৩০০ গুণ বেশী**। অন্যদিকে ওজন বা ম্যাস অপেক্ষাকৃত কম, পৃথিবী থেকে **৩১৮ গুণ বেশী**। তার ঘনাঙ্ক বা ডেনসিটি (বিশেষ ভলিউমে কি পরিমাণ বস্তু আছে) পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। তা হিসেব করে দেখা গেছে যেখানে পৃথিবীর ঘনাঙ্ক **৫.৫২ গ্রাম/সেন্টিমিটার কিউব (5.52 g/cm^3)**, সেখানে বৃহস্পতির ঘনাঙ্ক মাত্র **১.৩৩ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার (1.33 g/cm^3)**। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, বৃহস্পতি মূলত পাতলা গ্যাস **হাইড্রোজেন** ও **হিলিয়াম** দ্বারা সৃষ্ট। বস্তু যতো পাতলা, ঘনাঙ্কও ততো কম।

ঈসায়ী **১৯৯৫** সালে **'গ্যালিলিও'** নামক একখানা মহাকাশযান গ্রহের নিকট-মহাকাশে পৌঁছে। এই উপগ্রহের মধ্যে আরেকটি যান ছিলো যাকে বলা হয় **প্রোব**। আসলে প্রোব বলতে গ্রহের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা যায় এমন **কৃত্রিম চলন্ত-যান** বুঝায়। **গ্যালিলিও** থেকে এটি অবতরণ করে বৃহস্পতির উপর। যানটির মধ্যে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক যন্ত্রপাতি ছিলো। গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে ঢুকে অনবোর্ড এসব যন্ত্রপাতি বেশ কিছু তথ্য প্রেরণ করেছে। আর এ থেকেই আমরা অনেক ব্যাপার জানতে সক্ষম হয়েছি।

বিজ্ঞানীরা জানেন, কোন মহাকাশযান গ্রহের নিকট দিয়ে উড়ে গেলে মহাকর্ষের আকর্ষণ হেতু এর গতি বেড়ে যায়। পৃথিবী থেকে এই গতির মধ্যে রদবদল **'ডপলার ইফেক্ট'** নামক একটি বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট থেকে সনাক্ত করা সম্ভব। এই ইফেক্টের মূলে যা তাহলো, যে বস্তু থেকে সিগনাল আসছে তা যদি প্রাপকের নিকট থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সিগনালের **তরঙ্গদৈর্ঘ্য** দীর্ঘায়িত হবে। অপরদিকে কাছে আসতে থাকলে এই **তরঙ্গদৈর্ঘ্য** হবে খাটো। বৃহস্পতির পাশকেটে উড়ে গেছে এমন একাধিক মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত সিগনাল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা গ্রহের অভ্যন্তরের একটি **'মডেল'** তৈরী করেছেন। উপরের ছবিতে এই মডেলই চিত্রিত হয়েছে।





গ্যালিলিও বৃহস্পতি মিশন: গ্যালিলিও মাহাকাশযানকে পৃথিবী ও শুক্র গ্রহের মহাকর্ষ দ্বারা দ্রুতগতিশীল করা হয়েছিল। উপরের চিত্রে তার ট্রাজেক্টরি (গতিপথ) অঙ্কিত হয়েছে। লক্ষ্য করুণ একে দু'বার পৃথিবীর নিকটে আনা হয়। পথিমধ্যে গ্যালিলিও এ্যাস্ট্রারোইড **'গাসপ্রা'** ও **'আইডা'** সম্পর্কে কিছু তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ডানে গ্যালিলিও যানের **'প্রোব'**-কে দেখা যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একে গ্রহের বায়ুমণ্ডলে পাঠানো হয়।

এতে দেখানো হয়েছে বৃহস্পতির বাইরের স্তর মূলত **হাইড্রোজেন, হিলিয়াম** এবং অল্পমাত্রায় **অক্সিজেনমিশ্রিত এমোনিয়া, মিথেইন, বাষ্পীয় পানি** দ্বারা সৃষ্ট। এই স্তর হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত গাঢ়। এর স্তরের নীচে উচ্চ তাপ ও চাপ বিদ্যমান। ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস হয়েও গ্যাসের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে **'সুপারক্রিটিক্যাল ফ্লুইড'** বলেন। বাংলায় কী বলে জানি না! তবে চেষ্টা করতে বাঁধা কিসের? আমরা বলতে পারি **'অতিসঙ্কটপূর্ণ তরলপদার্থ'**- কারণ **সুপার** শব্দের অর্থ **অত্যধিক, ক্রিটিক্যাল** অর্থ **সঙ্কটপূর্ণ** আর **ফ্লুইড** অর্থ **তরল পদার্থ**। যাক, এই অবস্থায় বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, একই সময় গ্যাস ও তরল পদার্থ হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা। এই স্তর বৃহস্পতির অভ্যন্তরের দিকে **২০ থেকে ৩০ হাজার কিলোমিটার** পর্যন্ত গাঢ়। এ মাপটি পুরো গ্রহের গাঢ়ত্বের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

অতিসঙ্কটপূর্ণ তরল পদার্থের স্তর পেরিয়ে যখন আমরা পরবর্তী স্তরে পৌঁছবো তখন বুঝা যাবে প্রেসার বা চাপ কাকে বলে? মনে রাখবেন আমরা অভ্যন্তরের দিকে যাচ্ছি। সেখানকার চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় **৩০ লক্ষ গুণ**

বেশী! গ্রহের অভ্যন্তরের এই গভীর স্তরে প্রতিটি এটম বা অণু একটা আরেকটার সঙ্গে এতো দ্রুত ও গতিশীল হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত যে, হাইড্রোজেন অণুর মধ্যে মৌলিক রদবদল ঘটে। এগুলো **চার্জড** বা **আয়োনাইজ্‌ড** হয়। এর অর্থ হলো, এটমের কেন্দ্রের **ঋণাত্মক (নেগিটিভ) ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক (পজিটিভ) প্রটন** থেকে ছুটে যায়। **আয়োনাইজড্** হওয়ার প্রক্রিয়া থেকেই বৃহস্পতির মধ্যে একটি শক্তিশালী **ম্যাগনিটোস্ফিয়ার (চুম্বকীয় গোলক)** সৃষ্টি হয়েছে। পুরো এই স্তরটি তরল ধাতুর মতো বিদ্যমান যার ঘনত্ব **৩০ থেকে ৪০ হাজার কিলোমিটার**। এই বড় স্তরটি পুরো গ্রহের ব্যাসার্ধের অর্ধেকের সমান।

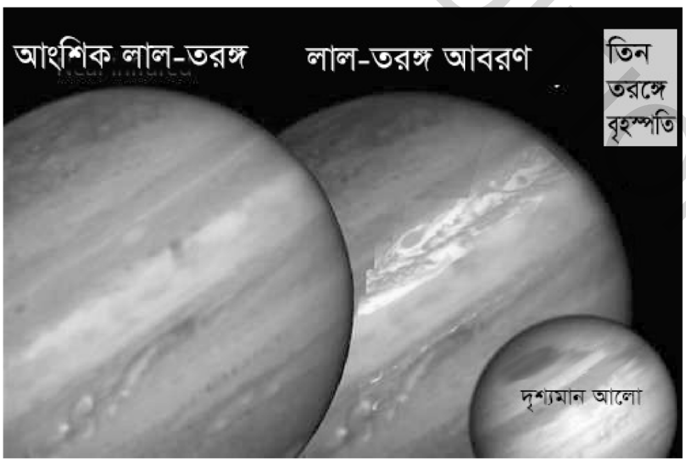
এবার আমরা **গলিত শিলা-পাথরের তৈরী** বৃহস্পতির কেন্দ্রের নিকট পৌঁছেছি। এ স্তরের ব্যাপ্তি ঠিক কেন্দ্র থেকে **১০ হাজার কিলোমিটার বাইরের দিকে।** গ্রহের ব্যাসার্ধের এক-পঞ্চমাংশের সমান। এই স্তরের ওজন বা ম্যাস পৃথিবীর তুলনায় **১০ থেকে ১৫ গুণ বেশী**। শেষ হলো বৃহস্পতির অভ্যন্তরের দিকে আমাদের কাল্পনিক ভ্রমণ। এবার অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল

আমরা যদিও সেলেস্টিয়ার সুবাদে জুপিটারের অতি নিকটে অবস্থান করছি বলে ভাবছি, কিন্তু বাস্তবে তো তা নয়! গ্রহের অবস্থান, দূরত্ব ইত্যাদি প্রোগ্রামটি সঠিকভাবে তুলে ধরলেও গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে যা কিছু তথ্য আমরা সত্যিকার মহাকাশযান কাছে প্রেরণ করে জানতে পেরেছি, তা-ই এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি। সুতরাং আসুন, তলিয়ে দেখি বৃহস্পতির বিরাট বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে এ পর্যন্ত জানা তথ্যাদি।

আমরা জানি সূর্য থেকে আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত-ক্ষণে। আলোকরশ্মির তেজ কিন্তু দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে কমে আসে। আর বৃহস্পতি কম দূরে নয়। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় তা **৫ গুণ বেশী**। ফলে বৃহস্পতির উপরে পতিত সূর্যের আলোকরশ্মির তীব্রতা পৃথিবীর তুলনায় **২৫ গুণ কম**। এ হিসাবে বৃহস্পতি যেটুকু **'সৌর-এনার্জি'** (সূর্য থেকে নির্গত উদ্যম) পায় তা পৃথিবীর তুলনায় **৪ শতাংশ** মাত্র। বিজ্ঞানীরা গ্রহ থেকে নির্গত **ইনফ্রারেড (লাল-তরঙ্গ:** এটি চোখের দৃষ্টিসীমার বাইরের একটি **বিকিরণ**) তরঙ্গ পরীক্ষা করে দেখেছেন। এতে উন্মোচন হয়েছে, বৃহস্পতি যে পরিমাণ এনার্জি সূর্য থেকে পায় তার **১.৬৭ গুণ** বেশী এনার্জি প্রতিবিম্ব করে বাইরের দিকে বিকিরণ করে। এতে বুঝা গেল গ্রহের মধ্যে সংরক্ষিত এনার্জি বিদ্যমান। বাস্তবে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে ঘনত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় তাপশক্তি। এই তাপশক্তিই বাইরের দিকে প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করছে বৃহস্পতি।

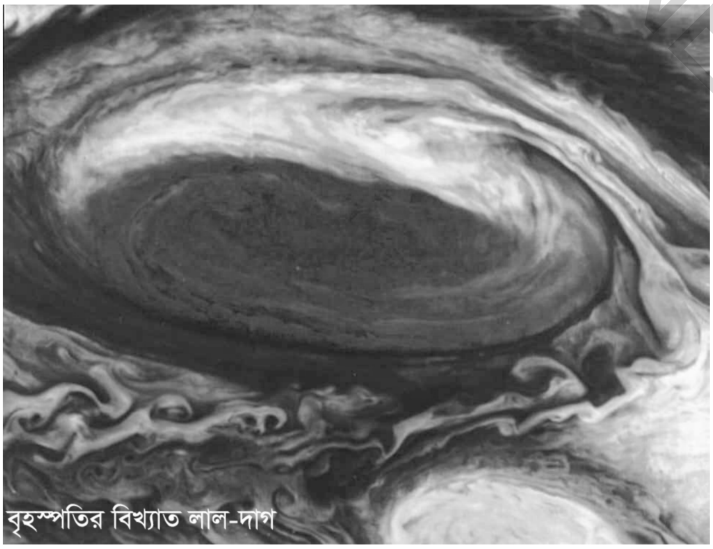
বৃহস্পতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো দূর থেকে দৃশ্যমান বাদামী ও সাদা রংয়ের বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য লাইন। দেখুন নীচের চিত্রটি। অতি নিকট



মহাকাশে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এসব লাইন সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তরা বলেন, **অক্ষাংশের ভিন্নতা** অনুযায়ী গ্রহের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গতিতে মেঘমালা চলন্ত আছে। এ থেকেই দৃশ্য হয় বাদামী-সাদা লাইনগুলো। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে **৬০০ কিমি/ঘণ্টা (৩৭০ মাইল-প্রতি-ঘণ্টা)** পর্যন্ত দ্রুত গতিশীল মেঘমালা চলন্ত আছে। বায়ুমণ্ডলে দৃশ্যমান সাদা-বাদামী লাইনসমূহ থাকার কারণ, এতে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের গ্যাসীয় বস্তু।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল খুব সক্রিয়ও বটে। হঠাৎ করেই বিরাট বড় ঝড়-ঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হয় পুরো বায়ুমণ্ডল। যেখানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনুরূপ ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টির কারণ হলো সূর্যের তাপ থেকে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়া, সেখানে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে যে কারণে তা সৃষ্ট হয় সেটা হলো, অভ্যন্তর থেকে উপরের দিকে ফুটে ওঠা উত্তপ্ত গ্যাসের বুদ্বুদ।

বৃহস্পতির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত **'ঝড়'** -এর



বৃহস্পতির বিখ্যাত লাল-দাগ

নাম হলো **দ্যা গ্রেট রেড স্পট** (বিরাট লাল দাগ)। উপরের চিত্রটি দেখুন। কয়েক শত বৎসর পূর্বে এর উৎপত্তি হয়। এই ঝড় এখনো থামে নি! বিরাট লাল দাগটি সত্যিই এক দৈত্য! সমগ্র পৃথিবীও যদি এর উপর রাখা হয় তবুও একে আবৃত করা যাবে না। বিজ্ঞানীরা এখনো এই বিরাট ঝড় ও দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার সঠিক কারণ খুঁজে পান নি। অনেকের অনেক **'ধারণা'** আছে। আমরা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবো না। তবে এটা নিশ্চিত, অনুরূপ ছোটবড় ঝড় বৃহস্পতিতে সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। ১৯৩৮ সালে তিনটি ছোট ঝড়ের আবির্ভাব হয়। এছাড়া ১৯৯৮ ও ২০০০ সালেও নতুন দু'টি ঝড়ের উৎপত্তি হয়েছে। এগুলোর রংও রদবদল হতে দেখা যায়।

উপগ্রহ

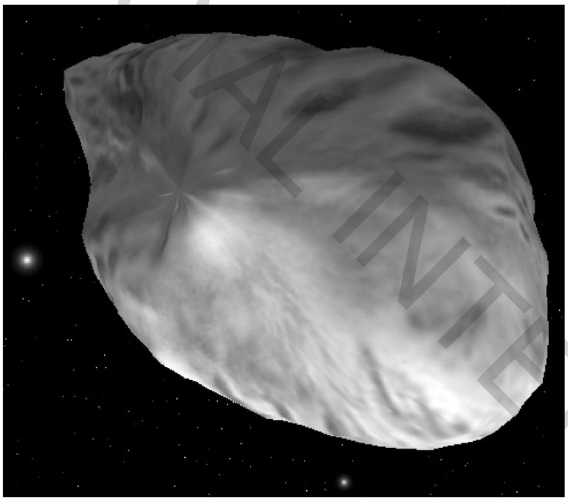
আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি উপগ্রহ বা চন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৃহস্পতির সকল জানা চন্দ্রের উপর তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এখানে সবগুলোর নাম পুনরুল্লেখ বেদরকারী। তাই, আমরা শুধুমাত্র বড় ক'টির উপর আরো কিছু আলোচনা করবো।

বৃহস্পতি থেকে চন্দ্রগুলোর দূরত্ব, এদের নিকট থেকে বৃহস্পতি ও অন্যান্য এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তুর সম্ভাব্য দৃশ্য ইত্যাদির চিত্রাঙ্কন করতে যেয়ে আমাদেরকে সেলেস্টিয়ার উপর পুনরায় নির্ভর করতে হবে। আমরা স্বীকার করছি, যেসব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য এখানে চিত্রিত হয়েছে তা ১০০% সঠিক হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। তবে ভবিষ্যতের **'বাস্তব'** কোন নভোচারী হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, সেলেস্টিয়ার **'সিম্যুলেশন'** আসলে বাস্তবতা থেকে খুব একটা দূরে নয়। যা হোক, আমরা এবার একে একে চন্দ্রগুলোর উপর আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

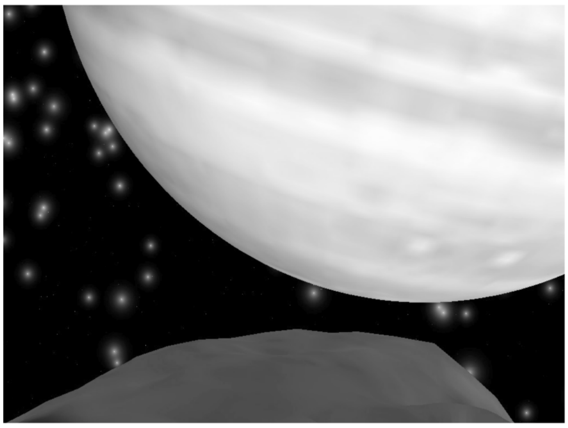
আমলথিয়া

আমরা মোট ৫টি উপগ্রহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। বৃহস্পতির পঞ্চম বৃহৎ চন্দ্র হলো **আমলথিয়া**। নীচের চিত্রটি দেখুন। আমরা একে নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবো।

নিম্নে আলোচিত অন্যান্য উপগ্রহের তুলনায় আমলথিয়া বেশ ছোট্ট একটি চাঁদ। এর আকারও

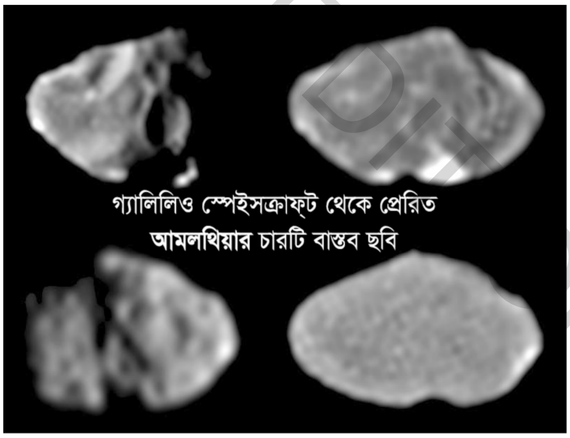


অন্যগুলোর মতো নয়। উপরের চিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। তবে বড়ত্বের দিক থেকে আমলথিয়া বৃহস্পতির পঞ্চম বৃহৎ উপগ্রহ। তার দীর্ঘতম সাইডের মাপ হলো **২৭০ কিলোমিটার (১৭০ মাইল)** এবং স্বল্পতম দৈর্ঘ্যশীল সাইডের দূরত্ব **১৫০ কিমি (৯০ মাইল)**। বড়ত্বের দিক থেকে পঞ্চম স্থানের অধিকারী হলেও বৃহস্পতির পরবর্তী বৃহৎ উপগ্রহ **ইউরোপার** তুলনায় সে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ হবে। আমাদের চাঁদের তুলনায় এটি মাত্র চৌদ্দ ভাগের একভাগ আয়তনবিশিষ্ট। ঈসায়ী ১৮৯২ সালে **এডওয়ার্ড বার্নার্ড** নামক এক আমেরিকান মহাকাশবিজ্ঞানী একে আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর উপর স্থাপিত টেলিস্কোপ দিয়ে খালি চোখে সৌরজগতের সর্বশেষ আবিস্কৃত চন্দ্র এটাই ছিলো। পরবর্তীতে সকল চন্দ্রই টেলিস্কোপ দ্বারা ছবি তুলে কিংবা মহাকাশযান



থেকে প্রাপ্ত ছবি পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। নামকরণ কোত্থেকে আসলো? পাঠকরা **'ধারণা'** করে নিন।

উপরের চিত্রটি সেলেস্টিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতি **১,১০,১৯০ কিলোমিটার (৬৮,৪৬৯ মাইল)** দূরে পেছনের দিকে দেখাচ্ছে। তবে এটুকু দূরত্বে আমলথিয়া সর্বদা থাকে না। এই লেখা রচনার তারিখ ও সময়ে (অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ২০১২, সময় দুপুর ১২:৩৮) উপগ্রহটি প্রদক্ষিণকালে যে অবস্থানে ছিলো, তারই হিসাব এটি। প্রতি **১২ ঘণ্টায়** সে তার মা-গ্রহকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণপথে চলার সময় গ্রহ থেকে দূরত্বের তারতম্য হিসাব করে



গ্যালিলিও স্পেইসক্রাফ্ট থেকে প্রেরিত
আমলথিয়ার চারটি বাস্তব ছবি

বিজ্ঞানীরা গড় দূরত্ব বলেছেন **১,০৮,৩০০ কিলোমিটার (৬৭২৯৫ মাইল)**।

পর্যবেক্ষণ

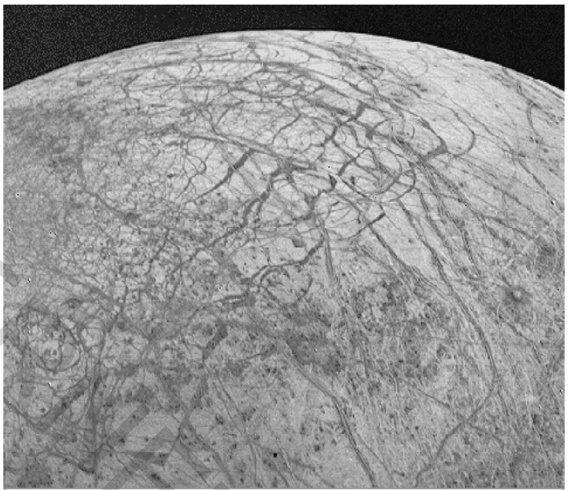
'গ্যালিলিও' নামক মহাকাশযান ২০০২ সালে আমলথিয়ার নিকটতম কৃত্রিম যান ছিলো। মাত্র **১৬০ কিলোমিটার** দূরে থেকে গ্যালিলিও চাঁদটির উপর পরীক্ষা চালিয়ে এর ঘনাঙ্ক নির্ধারণ করেছে। এটা বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে না- তার ম্যাস বা ওজন যথেষ্ট নয়। শিলা পাথরের তৈরী চন্দ্রটি মূলত অনেক জায়গায় ফাঁকা। কিছুটা ফুসফুসের মতো। নিজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম থাকায় এরকম আকার ধারণ করেছে। তার উপরিভাগ কিন্তু উজ্জ্বল লালচে। পার্শ্ববর্তী চন্দ্র **আয়ো** থেকে হয়তো **'সালফার'** গ্যাস এসে একে লালবর্ণ করেছে। চন্দ্রটির উপর অনেক পতন-গর্তও দেখা যায়। **১০০ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট 'প্যান'** নামক একটি বৃহৎ গর্ত আছে। এটি **৮ কিমি** গভীর। এছাড়া আরেকটির নামকরণ করা হয়েছে **'গেইয়া'**। এর ব্যাস **৮০ কিমি ও গভীরত্ব ১৬ কিমি**। **প্যান ও গেইয়া** শব্দদ্বয়ের অর্থ কি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না! একমাত্র আল্লাহ মা'লুম এসব নামের অর্থ কী? এবার চলে যাই পরবর্তী বৃহৎ চন্দ্র **ইউরোপার** নিকট।

ইউরোপা

ইউরোপা শব্দের অর্থ অনেকটা বোধগম্য। মনে হয় এটা **'ইউরোপ'** শব্দের সঙ্গে সামর্থবোধক, তাই না? যা হোক বৃহস্পতির এই বড় চাঁদটি সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু তথ্য জেনেছি। তার বেশ ক'টি ছবিসহ এসব তথ্যের উপর এখন আলোচনা করবো।



সেলেস্টিয়ার সুবাদে আমাদের কাল্পনিক ভ্রমণে আমরা ইউরোপা থেকে **৬,২৪৩ কিলোমিটার** উর্ধ্বে এসে গতিরোধ করলাম। জানতে পারলাম এই বলের মতো চাঁদটির ব্যাসার্ধ **১,৫৬৫ কিমি (৭৯২ মাইল)**। তার মা-



ভয়েজার থেকে প্রেরিত ইউরোপার একটি বাস্তব ছবি

গ্রহ বৃহস্পতি থেকে সে গড়ে **৬,০৩,৬৬০ কিমি (৩,৬৫,০৯৭ মাইল)** দূরে থেকে আমাদের হিসাবে মাত্র **৩.৫৫ দিনে** একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। তার আহ্নিক গতির রেইটও ঠিক **৩.৫৫ দিন**। সুতরাং ইউরোপা আমাদের চন্দ্রের মতো তার একটি অর্ধগোলক সর্বদাই সংশ্লিষ্ট গ্রহের দিকে রাখে। আপনি বৃহস্পতির উপর থেকে কখনো ইউরোপার অপর অর্ধগোলক দেখতে পারবেন না। বৃহস্পতির বিষুবরেখা বরাবর সে প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণপথ সামান্য **ডিম্বাকৃতির**। এটা আমাদের চন্দ্র থেকে সামান্য ছোট। সৌরজগতের ১০টি বড় উপগ্রহের (চন্দ্র) একটি হলো ইউরোপা।

কিসের তৈরী

ইউরোপা মূলত **'সিলিকেট রক'** (বা পাথর-বালি সমন্বিত) বস্তুর তৈরী। এসব পাথরে **সিলিকন** ও **অক্সিজেন** বিদ্যমান। তবে উপগ্রহের বাইরের দিক বা সারফেস পানীয় বরফে আবৃত। পর্যাপ্ত ওজন বা বস্তুর অভাবে স্বভাবতই ইউরোপা স্থায়ী কোন বায়ুমণ্ডল আটকে রাখার যোগ্য নয়। তবে অত্যল্প পাতলা একটি বায়ুমণ্ডল থাকার প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। এ বায়ুমণ্ডলটি অক্সিজেনের তৈরী হলেও আপনি-আমি শ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ে এ চন্দ্রের উপর বাঁচতে পারবো না! যা হোক, আমরা তো আর সেখানে অবতরণ করতে যাচ্ছি না!! বায়ুমণ্ডলে আসলে সর্বদাই কিছু হাইড্রোজেনও সৃষ্টি হয়। তবে উপগ্রহের মহাকর্ষ যথেষ্ট না হওয়ায় তা ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করে দূর মহাকাশে চলে যায়। থাকে শুধু অপেক্ষাকৃত ভারী অক্সিজেন।



ইউরোপার সারফেস থেকে **৫ কিমি (৩ মাইল)** গভীর পর্যন্ত বরফ, সেখান থেকে আরো **৫০ কিমি (৩০ মাইল)** নীচ পর্যন্ত এক বিরাট মহাসাগর থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আজো মিলে নি। চন্দ্রের অভ্যন্তর যে উষ্ণ তা অনেকটা নিশ্চিত। কারণ ইউরোপার মহাকর্ষ শক্তি কম নয়। এছাড়া তাকে নিকটস্থ বড় উপগ্রহ **গানিমিড** ও **আয়ো** এবং মা-গ্রহ **বৃহস্পতির** বিরাট **মহাকার্ষিক ফিল্ড** প্রভাবান্বিত করে। এই প্রভাব থেকে চন্দ্রটির অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ার জন্ম নেয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় তাপ।

ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে বলতে হবে, পৃথিবীর মতো ইউরোপার উপরিভাগ মূলত অল্পদিনের পুরাতন। মাত্র **১০ কোটি বৎসর** হবে। অধিকাংশ ইম্পেক্ট ক্রেটার (পতন-গর্ত) নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্ভবত বরফের নিম্নস্থ পানি হলো এর কারণ। তবে ইউরোপার উপরিভাগে একটি আকর্ষণীয় ফিচার আছে: এর উপর অসংখ্য কমলা রংয়ের রেখা দেখতে পাওয়া যায়। তার বিষুবরেখা বরাবর এসব লাইন খুব ঘন। **ভয়েজার** ও **গ্যালিলিও কৃত্রিম উপগ্রহ** থেকে নেওয়া ছবি গবেষণার মাধ্যমে বুঝা যায়, এগুলো হয়তো বরফের মধ্যে বড় বড় ফাটল হতে পারে।

ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ মিশন

ইউরোপা ইতালির **গ্যালিলিও গ্যালিলাই** **১৬১০** খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। তবে অজানা আরেক জার্মান বিজ্ঞানী **সিমন মারিয়াস** একই সালে এটি স্বাধীনভাবে আবিষ্কারের দাবী করেছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা তার এ দাবী মেনে নিয়েছেন। আবিষ্কারের পর থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপা সম্পর্কে আমরা অতিরিক্ত কিছু জানতে পারি নি।

ভয়েজার-১ ও **২** ঈসায়ী **১৯৭৯** সালে ইউরোপার পাশ-ঘেষে চলে গিয়েছে। এর অনেক পরে **১৯৯৬** সালে গ্যালিলিও মহাকাশযান এই চাঁদের নিকটে যায়। বৃহস্পতির চতুর্দিকে নির্দিষ্ট প্রদক্ষিণপথে চলার সময় এই যানটি কয়েকবার ইউরোপার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ পর্যন্ত বর্ণিত অধিকাংশ তথ্য এই উভয় মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত। আমেরিকার মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থা **'নাসা' (নেশন্যাল এ্যারোনোটিক্স এন্ড**

স্পেইস এডমিনিস্ট্রেশন) -এর বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, খুব শীঘ্র একটি **ইউরোপা মিশন** ডিজাইন করবেন। এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য হবে, ইউরোপার বরফের নিম্নস্থ পানির মহাসাগরে কোন **'প্রাণী'** আছে কি না তা সনাক্ত করা। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। এবার আসুন পরবর্তী চন্দ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এই চন্দ্রের নাম **'আয়ো'**।

আয়ো

এই চন্দ্রটি তার মা-গ্রহ বৃহস্পতির বিষুবরেখা বরাবর ঊর্ধ্বাকাশে গড়ে **৪,২২,০০০ কিমি (২,৬২,২০০ মাইল)** দূরে অবস্থান করে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পৃথিবীর উপর একদিন অর্থ ২৪ ঘণ্টা। এ হিসাবে **আয়ো ১.৭৬৯ বৎসরে (বা ১ বৎসর ২৮১ দিনে)** বৃহস্পতির চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসে। এটা **আয়োর বার্ষিক গতি**। তার আহ্নিক বা দৈনিক গতিও একই। সুতরাং আয়ো'র উপর একদিন সমান এক বৎসর! এ থেকে স্পষ্ট হলো বৃহস্পতি থেকে আয়োর একটিমাত্র গোলার্ধের মুখ দৃশ্যমান। অপর গোলার্ধ সর্বদাই অদৃশ্য থাকে। আয়ো আমাদের চন্দ্রের তুলনায় কিছুটা বড়ো। তার ব্যাসার্ধ **১,৮২০ কিমি (১,১৩০ মাইল)**। আর চন্দ্রের মতো এটাও সৌরজগতের **১০টি বৃহৎ প্রাকৃতিক উপগ্রহের** একটি।

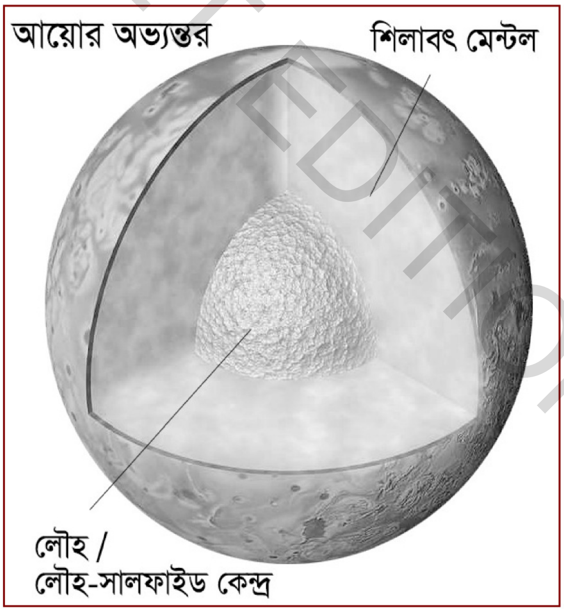
কিসের তৈরী

আয়ো কিসের তৈরী? এ প্রশ্নের জবাব আমরা আধুনিককালে এসে অনেকটা উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছি- তবে সবটুকু মোটেই নয়। ভয়েজার ১ ও ২ এবং গ্যালিলিও মিশন থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা গবেষণার মাধ্যমেই আমরা আয়ো কিসের তৈরী তার মোটামুটি একটি মডেল উপস্থাপন করতে পারি।

প্রথমত আমরা যদি উপগ্রহটির কেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে সেখানে দেখতে পাবো লৌহ-পদার্থের তৈরী বড়, ঘন একটি গোলক। এই গোলককে ঘিরে রেখেছে গলিত সিলিকন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে তৈরী একটি মেন্টল (mantle)। চন্দ্রের বাইরের অংশকে বলে ক্রাস্ট (crust)। মেন্টল স্তর থেকে উপর পর্যন্ত বিস্তৃত

বৃহস্পতির নেচারেল উপগ্রহ
আয়ো



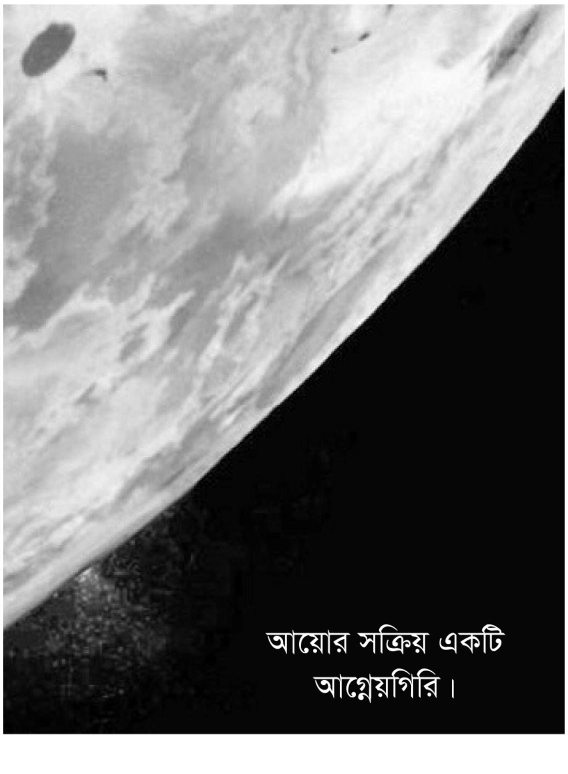


এই অংশ মূলত **'সালফার'** ও অনুরূপ পদার্থের মিশ্রণে সৃষ্ট। এসব পদার্থ থাকার কারণে আয়োর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে **হলুদ, কমলা, লাল, সাদা, নীল, বাদামী** ও **কালো** রং।

সক্রিয় আগ্নেয়গিরির উপগ্রহ

প্রথমেই বলেছি আয়ো সৌরজগতের একটি চিত্তাকর্ষক উপগ্রহ। আমরা আয়োর নিকট গেলে দেখতে পাবো পুরো সৌরজগতের মধ্যে তার মতো আগ্নেয়গিরি দ্বারা সক্রিয় কোন বস্তু নেই। তার পুরো সারফেসে শত শত সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বার বার উত্থিত হচ্ছে। এদের কোনো কোনটি থেকে গলিত সালফার ও সালফার-ডাইওক্সাইড **৩০০ কিলোমিটার (১৮৬ মাইল)** উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। আয়োর আগ্নেয়গিরি থেকে খুব উত্তপ্ত 'লাভা' (lava) বেরিয়ে আসে।

লাভা কি? উত্তরঃ লাভা হচ্ছে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গলিত উত্তপ্ত বস্তু।



আয়োর সক্রিয় একটি আগ্নেয়গিরি।

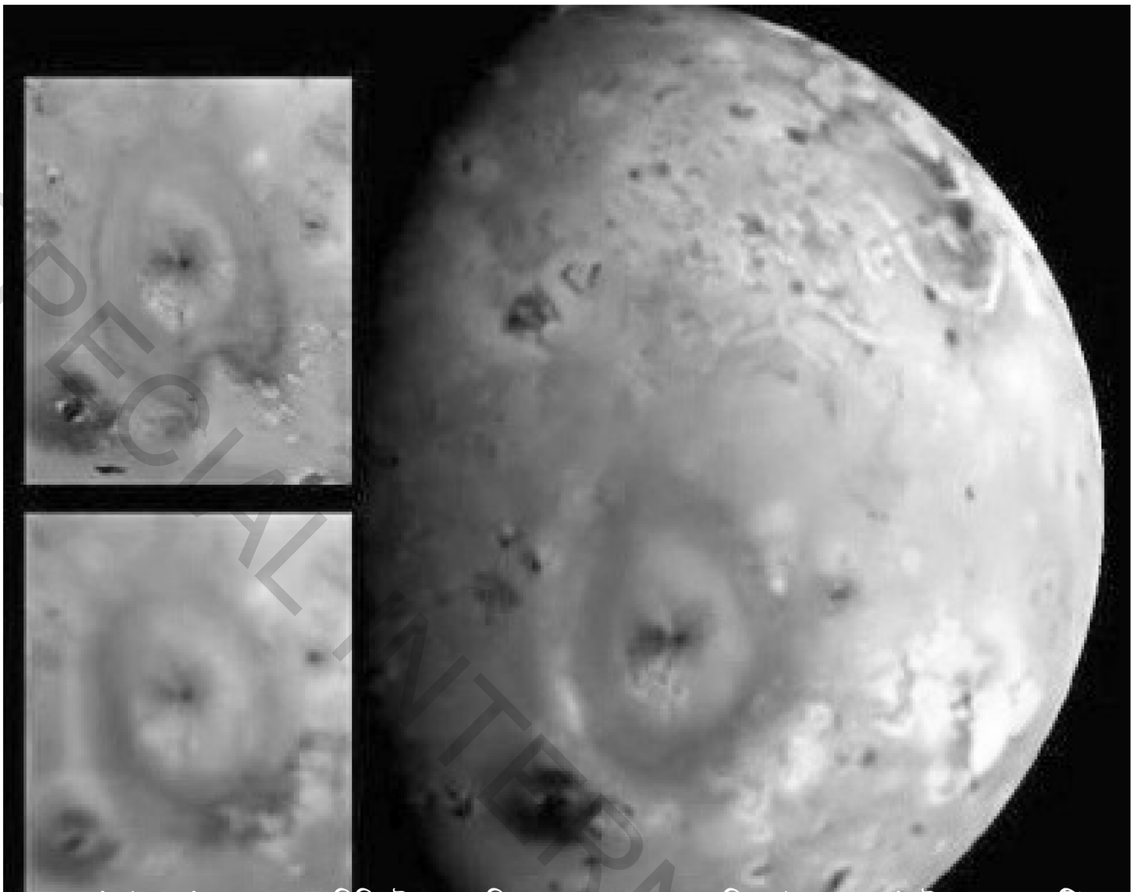
আয়োর মধ্যে বেরিয়ে আসা উর্ধ্বে **১৭২৭** ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৩১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) পর্যন্ত উচ্চতাপ-সম্পন্ন লাভা একটি রেকর্ড। দেখা গেছে এ পর্যন্ত জানা কোন আগ্নেয়গিরি থেকে এতো উচ্চ তাপসম্মন্ন লাভা বের হয় নি। বিজ্ঞানীরা এর কারণও বের করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, মেগনেসিয়াম-সর্বস্ব সিলিকেট লাভা একমাত্র উচ্চতাপ ছাড়া গলে না। আর এই বস্তুটিই হলো আয়োর আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা লাভা।

আয়োর উপর সর্ববৃহৎ আগ্নেয়গিরির নাম **'রা পাটেরা'**। এর মুখ থেকে নিঃসৃত লাভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে উপগ্রহের সারফেসের **৩০০ কিমি (১৮৬ মাইল)** দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। অপর আরেক আগ্নেয়গিরির নামকরণ হয়েছে **'পেলে'**। ভয়েজার ১ ও ২ এবং গ্যালিলিও মহাকাশযান এই আগ্নেয়গিরির ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন। পেলে'র মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লাভার তাপমাত্রা ১৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। সৌরজগতের কোন বস্তুর সারফেসে এরূপ উচ্চতাপ কোথাও পাওয়া যায় নি- অবশ্য সূর্য এ হিসাবের বাইরে।

এভারেস্ট থেকে উঁচু পর্বত ও বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর বুকে সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট। এর উচ্চতা **২৯ হাজার ২৯ ফুট**। আয়োর উপর একটি পর্বত আছে যা এ থেকেও উঁচু। এ পর্বতের নাম **'হেমুস'** (আল্লাহ মা'লুম এর অর্থ কি!)। আয়োর উত্তরমেরুতে এই পর্বতের অবস্থান। উচ্চতায় এটি **১০ কিমি (৬ মাইল)**।

আয়োর একটি পাতলা বায়ুমণ্ডলও আছে। শত শত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত সালফার



আয়ো'র 'পেলে' নামক আগ্নেয়গিরি: উপরের ছবিগুলো ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে 'ভয়েজার-১' (উপরের বায়েরটি), জুলাই ১৯৭৯ সালে 'ভয়েজার-২' (নীচের বায়েরটি) এবং ১৯৯৬ সালে 'গ্যালিলিও' (অপর বড়টি) মহাকাশযান থেকে প্রাপ্ত। তিনটে ছবিতেই সূর্য ছাড়া সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত 'পেলে' আগ্নেয়গিরি দেখাচ্ছে।

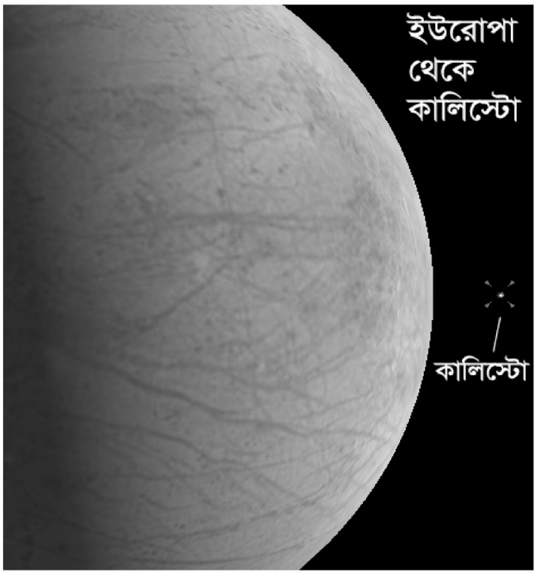
ডাইওক্সাইড গ্যাস এই বায়ুমণ্ডলের মূল বস্তু। এখানে অক্সিজেন তেমন একটা নেই। সুতরাং আয়োর উপর অবতরণ করে **'প্রটেক্টিভ হেলমেট'** খুলে স্বাধীনভাবে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ নেই! কোন কোন সময় দেখা যায় আয়োর উপরে হিমায়িত শ্বেত শিশির। এসব মূলত বরফকণায় পরিণত **সালফার ডাইওক্সাইড**।

পর্যবেক্ষণ ইতিহাস

আয়োকে **'গ্যালিলিয়ান'** উপগ্রহ বলা হয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতির চারটি বড় উপগ্রহ তার নির্মিত টেলিস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন বলে এগুলোর নামকরণ হয়েছে, **গ্যালিলিয়ান উপগ্রহ**। তবে আয়োকে এককভাবে ইতালির গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছেন, কথাটি ঠিক নয়। জার্মানির **সিমন মারিয়াস** নামক অজানা এক বিজ্ঞানীও ঐ একই সালে এটি প্রথম সনাক্ত করেন। আমরা এসব উপগ্রহের নামকরণ নিয়ে কয়েকবার কিছু উক্তি করেছি। এখন পাঠকদের বলে দিচ্ছি কে এসব নামকরণ করেছেন। গ্রীক কাল্পনিক উপাখ্যানের চরিত্রগুলো চিরজ্যান্ত রাখার উদ্দেশ্যে চারটি গ্যালিলিয়ান উপগ্রহের নামকরণ-দাতা ছিলেন এই **সিমন মারিয়াস**। আমরা এসব নামের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করি না। আবিষ্কার যে-ই করুন না কেন, এসব গ্রহ-উপগ্রহ কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। আমরা **'বিকল্প'** নামকরণ করবো। পরিশিষ্টের তালিকায় এসব নামকরণ

দেওয়া হয়েছে। পাঠকরা আশাকরি সমর্থন জানাবেন আমার দেওয়া নামগুলোর প্রতি।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি ভয়েজার **১** ও ২ এবং গ্যালিলিও মহাকাশযান আয়োকে ভিজিট করেছে। **১৯৭৯** সালে উভয় ভয়েজার স্পেইস ক্রাফ্‌ট আয়োর নিকট-মহাকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বেশ কিছু ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে। এরপর **১৯৯৫** সালে বৃহস্পতির নিকট পৌঁছে মহাকাশযান গ্যালিলিও। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত এই ক্রাফ্‌টকে গ্রহ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে প্রদক্ষিণ পথে ঘূর্নমান করা হয়। গ্যালিলিও অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার প্রদক্ষিণ পথে ঘুরতে থাকবে। কৃত্রিম এই উপগ্রহের প্রদক্ষিণপথে সময় সময় বৃহস্পতির অন্যান্য উপগ্রহ নিকটবর্তী হয়। ফলে আমরা **'বোনাস'** হিসাবে ওসব উপগ্রহের ছবিসহ কিছু তথ্য গ্যালিলিও থেকে প্রাপ্ত হই। যেমন **১৯৯৯** সালে আয়োর আগ্নেয়গিরির একটি পরিষ্কার ছবি গ্যালিলিও প্রেরণ করে। অবশ্য পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে প্রদক্ষিণরত **'হাবল'** মহাকাশ টেলিস্কোপ থেকেও আমরা আয়ো সম্পর্কে অনেক তথ্য পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে আরো পাবো।



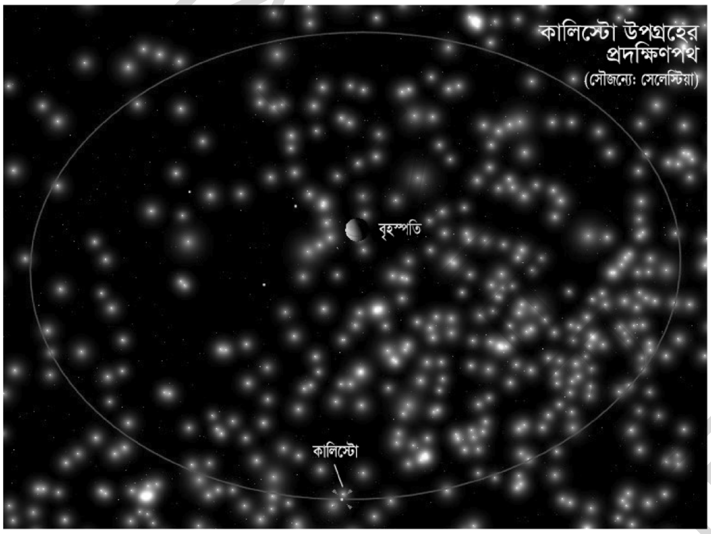
কালিস্টো

আমরা সেলেস্টিয়ার সুবাদে ইউরোপার নিকট-মহাকাশ থেকে এবার ছুটে যাবো বৃহস্পতির আরেক বড় উপগ্রহ **কালিস্টো'**র দিকে। ইউরোপাকে পাশে রেখে আমাদের কল্পিত মহাকাশযানটি কালিস্টো'র দিকে ফিরালাম। দেখলাম, কালিস্টো অনেক দূরে দেখাচ্ছে। সেলেস্টিয়ার হিসাব মতে: এই মুহূর্তে (২৫ এপ্রিল ২০১২, বিকেল ৩:০১:৫২ সময়) কালিস্টো ইউরোপা থেকে **১৯,৭৩,০০০ কিমি (১২,২৫,৯৬৫ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে। নীচের বায়ের ছবিতে সে দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

আমরা ধীরে ধীরে কালিস্টোর দিকে অগ্রসর হলাম। চন্দ্রটি থেকে ২,০৬,৪৩০ কিলোমিটার দূরে থেকে একটি ছবি তুললাম। নীচে এই ছবিটি দেওয়া হয়েছে। সাথী নভোচারী ভাই-বোন লক্ষ্য করুণ, পেছনে বৃহস্পতি দেখাচ্ছে। গ্রহের দৃশ্যতঃ আয়তন চাঁদের তুলনায় খুব বড় মনে হয় না। কিন্তু আসলে বৃহস্পতি আমাদের অবস্থান থেকে অনেক অনেক দূরে। বাস্তবে তা ২০,১২,৪০০ বা বিশ লক্ষাধিক কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। চাঁদ কালিস্টো নিকটে ও সোজা সামনে থাকায় একে তুলনামূলকভাবে বড় দেখাচ্ছে। যা হোক, আর অপেক্ষা নেই। দ্রুত কালিস্টোর নিকটে চলে যাচ্ছি।



এই মুহূর্তে (শুক্রবার ২৭ এপ্রিল ২০১২, সময়: ১১:২২) বৃহস্পতি থেকে **১৮,০৬,০০০ কিলোমিটার** দূরে অবস্থান করছে। তবে তার কক্ষপথ কোন কোন সময় আরো বেশ দূর পর্যন্ত চলে যায়। সুতরাং **এনকার্টা ইনসাইক্লোপিডিয়া**'র দেওয়া হিসাব মতে বৃহস্পতি থেকে গড়ে **১৮,৮৩,০০০ কিমি (১১,৭০,০০০ মাইল)** দূরে থেকে চন্দ্র কালিস্টো বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। এটাই তার বার্ষিক গতি।



এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে **১৬.৬৮৯ পৃথিবী-দিবস**। এই গতি কম না। আমরা একটা হিসাব করে দেখতে পারি।

প্রথমে আমরা প্রদক্ষিণপথের দৈর্ঘ্য বের করবো। কালিস্টো বৃহস্পতির বিষুবরেখা বরাবর প্রায় বৃত্তাকার প্রদক্ষিণপথে ঘুরে। হিসাবে সারল্যতা অনুসরণ করতে যেয়ে আমরা বৃত্তাকার প্রদক্ষিণকে মেনে নিতে পারি। এতে হিসাবে তেমন একটা পার্থক্য হবে না। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই প্রদক্ষিণপথের দৈর্ঘ্য বের করবো। খুব একটা কঠিন নয়। আমরা বৃত্তের পরিধিরেখার মাত্রা বের করে নিলেই হয়। এজন্য একটি ফরমুলা আছে:

পরিধিরেখা = ২*পাই*ব্যাসার্ধ। এখানে পাই (μ) = ৩.১৪১৫৯।

সুতরাং কলিস্টো তার কক্ষপথে ঘুরতে যেয়ে যে দীর্ঘ পথ নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রম করতে হয় তাহলো:

২*৩.১৪১৫৯*১৮৮৩০০০ =
১,১৮,৩১,২২৭.৯৪ কিলোমিটার
(৭,৩৫,১৫৭০.১৩ মাইল)।

এখন আমরা এক ঘণ্টায় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে কালিস্টোর কি পরিমাণ গতির প্রয়োজন তা নির্ণয় করতে পারি:

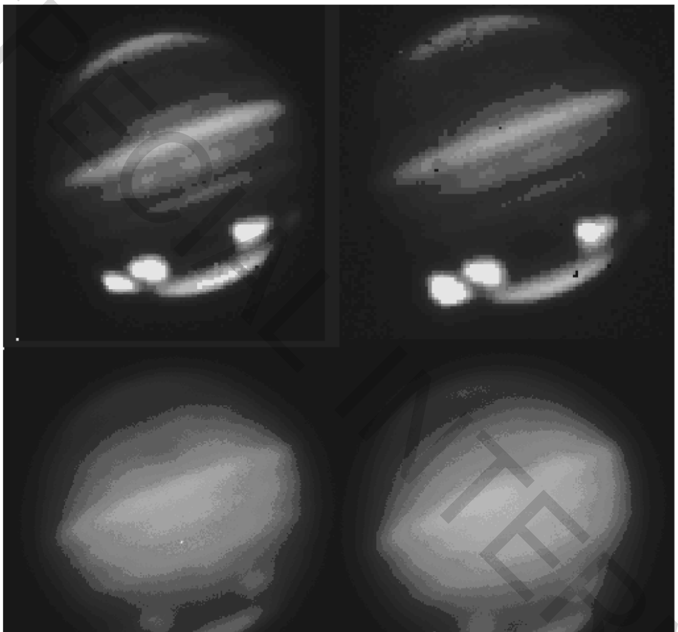
১,১৮,৩১,২২৭.৯৪/১৬.৬৮৯*২৪ = ২৯,৫৩৮.৪৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (১৮৩৫৪.৩৩ মাইল/ঘণ্টা)।

সুবহানাল্লাহ! দেখলেন তো কী উচ্চগতিতে ঘুরছে কালিস্টো। বৃহস্পতির অন্যান্য চন্দ্রও অনুরূপ উচ্চগতিশীল। এর একাধিক কারণ আছে। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বৃহস্পতির বিরাট মহাকর্ষ। এই মধ্যাকর্ষণ দ্বারা সৃষ্ট প্রচণ্ড টান হতে মুক্ত থেকে অস্তিত্ব বজায় রাখতে যে কোন চন্দ্রকে তার নিজের মহাকর্ষ ও দূরত্ব অনুপাতে ঘূর্ণন গতিও সঠিক রাখা চাই। অন্যথায় বৃহস্পতির উপর পতন অনিবার্য। ঠিক যেভাবে রেহাই পায় নি ধূমকেতু **শুমেকার-লেভি-৯**।

শুমেকার-লেভি-৯ ধূমকেতুটি দুর্ভাগ্যবশত ভুল পথে বৃহস্পতির বেশী নিকটে চলে যায়। বিরাট মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হতে না পেরে সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বৃহস্পতির উপর পতিত হয়। ঈসায়ী ১৯৯৪ সালে (জুলাই ১৬-২২) সংঘটিত এই বিরাট এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ঘটনাটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে সরাসরি

সম্প্রচার করা হয়েছিল। আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। নিজের ড্রইং কক্ষের আর্মচেয়ারে বসে চিত্তাকর্ষক এ দৃশ্যগুলো দেখেছি।

পতনের বেশ পূর্বেই বৃহস্পতি একে ভেঙ্গে



বৃহস্পতির উপর ধূমকেতু শুমেকার-লেভি-৯ এর পতন মুহূর্ত (সৌজন্যে: ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস)

চুরমার করে দেয়। এরপর বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃহস্পতির উপর-বায়ুমণ্ডলে পতিত হতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে একেকটি ধূমকেতু-খণ্ড আলোকিত করে তুলে বিরাট এলাকা। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, পতনের সময় এসব খণ্ডের গতি **২,১৬,০০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (১,১৩,০০০ মাইল/ঘণ্টা)** পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে। সুবহানাল্লাহ! এটা বিরাট গতি! বিস্ফোরণের পরই চতুর্পার্শ্বস্থ গ্যাস **৩,০০০ কিমি (১,৯০০ মাইল)** ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ছিটকে পড়ে। এ ঘটনাটির তারিখ ছিলো: **১৮ জুলাই '৯৪**। এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল একটি বিরাট ঘটনার এরূপ অত্যাশ্চর্য দৃশ্যাবলী সরাসরি টিভিতে দেখে সেদিন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। এরূপ ঘটনা আর স্বচক্ষে দেখাবো কি না সন্দেহ আছে। হয়তো কয়েক শত বৎসর পরও আর দেখা যাবে না। যা হোক, ফিরে আসি আমাদের আলোচিত বিষয়ে।

কালিস্টো বৃহস্পতির তৃতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। বলের মতো এই চন্দ্রের ব্যাসার্ধ **২,৪০৩ কিমি (১,৪৯৩ মাইল)**। প্রথম গ্রহ বুধ থেকে এটি আয়তনে তেমন ছোট নয়। তবে শক্ত ধাতু ও পাথরের তৈরী বুধের তুলনায় কালিস্টোর ম্যাস বা বস্তুর মাত্রা অনেক কম। চন্দ্রটি মূলত নিম্ন ঘনাঙ্কবিশিষ্ট হিমায়িত পানি দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং তার ওজন বুধের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হবে। তবে এ চন্দ্রের অভ্যন্তরে পাথর নেই, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পুরো উপগ্রহটি হিমায়িত পানি ও পাথরের মিশ্রণে গঠিত।

কালিস্টোর উপরিভাবে অসংখ্য পতন-গর্ত বিদ্যমান। সৌরজগতের কোন গ্রহ-উপগ্রহে এতো বেশী পতন-গর্ত দেখা যায় না। এ থেকে এটাই স্পষ্ট, কোটি কোটি বৎসর যাবৎ কালিস্টোর মধ্যে তেমন কোন ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফলে সাধারণত বাইরের অংশে রদবদল ঘটে। মুছে যায় গর্তগুলো। কিন্তু তা-তো হয় নি। এটি আয়তনের দিক দিয়ে বৃহস্পতির চারটি বৃহৎ চন্দ্রের একটি। বাকী তিনটিতে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু একমাত্র এটিই সর্বাপেক্ষা নিঝঝুম অবস্থায় কালাতিপাত করছে।

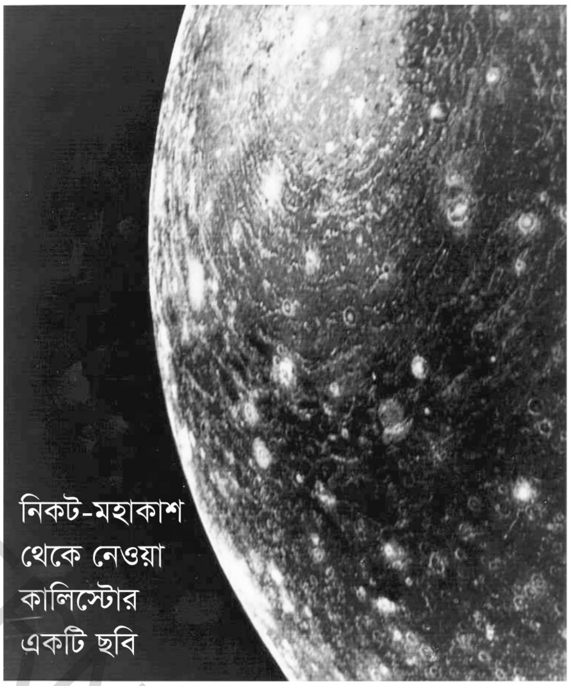
টাগ-অব-ওয়ার

শব্দ তিনটি ইংরেজী (tug-of-war)। অর্থ আপনাদের অজানা নয়। বৃহস্পতি ও তার চন্দ্রগুলোর মধ্যে এই যুদ্ধ সর্বদা চলছে। যুদ্ধে

ইন্ধন দিচ্ছে সদা-সক্রিয় মহাকর্ষ। বৃহস্পতির নিজের টানশক্তি ও চন্দ্রগুলোর বাইরের দিকে গতি সৃষ্টির ফলে টানশক্তি- এটাই হলো চিরন্তন টাগ-অব-ওয়ার। এই যুদ্ধ হেতু সৃষ্টি হয়েছে ব্যালান্স। তবে চন্দ্রের অভ্যন্তরে যদি তরল পদার্থ থাকে তাহলে বৃহস্পতির টানে এতে সৃষ্টি হয় **গতি-ঘর্ষণ-বিদ্যুৎ**। ফলে অভ্যন্তর হয়ে ওঠে সক্রিয়। বৃহস্পতির প্রচণ্ড মহাকার্ষিক টান বেশী ক্রিয়া করে নিকটস্থ উপগ্রহসমূহে। এ দিক থেকে বলতে হবে, বেশ দূরে থাকার ফলে কালিস্টো অনেকটা নিরাপদ। অভ্যন্তরে তরল পদার্থ থাকলেও সেথায় তেমন উচ্চ গতিশীল নড়াচড়া সৃষ্টি হচ্ছে না। সুতরাং উপগ্রহটি অপেক্ষাকৃত শান্ত।

যাক, বেশ নীরব শান্ত একটি চন্দ্র হয়েও কালিস্টো নিজের সৃষ্ট মহাকর্ষ দ্বারা অতি পাতলা একটি বায়ুমণ্ডল ধারণ করে রেখেছে। তবে সেখানে শ্বাসক্রিয়ার জন্য জরুরী কোন **অক্সিজেন গ্যাস নেই**। যা আছে তাহলো, **কার্বন ডাইওক্সাইড**।

আমরা ইতোমধ্যে কালিস্টোর উপর অসংখ্য পতন-গর্তের কথা উল্লেখ করেছি। এসব গতের বৃহৎ ক'টির উপর কিছু আলোচনা করা যায়। এ পর্যন্ত জানা সর্বাপেক্ষা বড় গর্তটির নামকরণ করা হয়েছে **'ভালহালা'**। অনুগ্রহ করে এর অর্থ কি তা জিজ্ঞেস করবেন না! তবে এটির নিম্নভাগ আয়তনে **৩০০ কিলোমিটার (১৯০ মাইল)** হবে। গর্তের চতুর্দিকে রিংসদৃশ উঁচু আইল আছে। আইলের একপ্রান্ত থেকে অপটির দূরত্ব অন্তত **১,৫০০ কিলোমিটার (৯৩০ মাইল)** হবে। এছাড়া বিজ্ঞানীরা ছবি পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন কালিস্টোর উপরে পতন-গর্তের **১২টি চেইন** আছে। সকলের ধারণা, সুদূর অতীতে কোন ধূমকেতু কিংবা এ্যাস্টারোইড বৃহস্পতির পাশকেটে চলার সময় অনেক খণ্ডে ভেঙ্গে যায়- যেভাবে ইতোমধ্যে বর্ণিত ধূমকেতু শুমেকার-লেভি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর ওসব খণ্ড একে একে কালিস্টোর উপর পতিত হয়েছে- সৃষ্টি করেছে গর্তের চেইন। এসব চেইনের মধ্যে


নিকট-মহাকাশ থেকে নেওয়া কালিস্টোর একটি ছবি

সর্বাধিক দীর্ঘ চেইনটির নামকরণ করা হয়েছে **'গিপুল কাটেনা'** (কারো নাম?)। এই চেইনের দৈর্ঘ্য **৬৪০ কিমি (৪০০ মাইল)**।

ইতিহাস

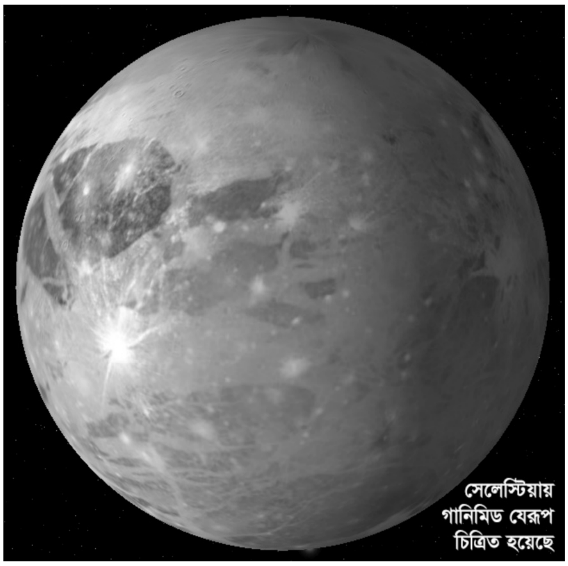
সবশেষে কালিস্টোকে আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি। এটিও স্বাধীনভাবে দু'জন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করেন। এরা হলেন ইতালির **গ্যালিলিও গ্যালেলাই** এবং জার্মানির **সিমন মারিয়াস**। উভয়ে নিজের তৈরী টেলিস্কোপ দ্বারা একে দেখতে পান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। **'গ্যালিলিয়ান মুনস'** এর একটি এ উপগ্রহটির নামকরণ করেন **মারিয়াস**। এই নামকরণের প্রতি আমার আপত্তি আছে। গ্রীক দর্শন ও মিথোলজির উপর **'অন্ধ আকর্ষণ'** হেতু সবাই মহাকাশের সকল বস্তুর নামকরণ করেছেন

গ্রীক অসত্য কাল্পনিক ধর্ম ও পৌরাণিক গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের নামানুসারে। **'কালিস্টো'** এক নারীর নাম- গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে সে **'জিউস'** নামক **'গডের'** প্রেমিকা! বৃহস্পতির **'ইংরেজী'** নামও **'জুপিটার'**। রোমানরা জিউসকেই জুপিটার নামে আখ্যায়িত করতো। সুতরাং নামকরণকারীরা মা-গ্রহ জুপিটারের অধিকাংশ চন্দ্রের নামকরণ করলেন, জুপিটারের কল্পিত প্রেমিকাদের নামে!

আর বেশী বলে আমার প্রিয় নভোচারী সাথীদের মনে কষ্ট দিতে চাই না! আমরা সৌরজগতের সকল বস্তুর উপর একটি টেবিল পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করেছি। প্রিয় নভোচারী সাথীরা! আপনারা আমার দেওয়া **'বিকল্প বাংলা নামগুলোর'** প্রতি সমর্থন জানাবেন এটাই আশা। আর বলবো না। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার আমি আলোচনা করে নিয়েছি। আপনারা ধৈর্যহারা হবেন না, প্লিজ! আবেগাপ্লুত হয়েই আমি কথাগুলো বলে ফেলেছি। আসুন এবার, চলে যাই বৃহস্পতির অপর গ্যালিলিয়ান চন্দ্র গানিমিডের কাছে।

গানিমিড

আমরা বৃহস্পতির বৃহৎ উপগ্রহ গানিমিডের নিকটে ভ্রমণের পূর্বে কালিস্টো থেকে **৮৪৩.১৮ কিলোমিটার** দূরে অবস্থান নিলাম। সামনেই চোখে পড়লো **গানিমিড** এবং বায়ে অদূরে **বৃহস্পতি**। সেলেস্টিয়া মহাকাশে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করে হিসাব করে দেখালো এ মুহূর্তে (২৭ এপ্রিল ২০১২, সময়: বিকেল ৫:৫১) গানিমিড উপগ্রহটি এখান থেকে **৮,১২,৪৫০ কিলোমিটার** দূরে অবস্থান করছে। একই সময় **১৮,০৭,৪০০ কিলোমিটার** দূরে আছে বৃহস্পতি। সুতরাং আমাদেরকে অন্তত সোয়া আট লক্ষ কিলোমিটারের রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। প্রথমে আমরা গানিমিডকে ঠিক সেন্টারে নিয়ে আসলাম



সেলেস্টিয়ায় গানিমিড যেরূপ চিত্রিত হয়েছে

স্ক্রীনের উপর। এরপর **১ এএউ (এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট = ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)** গতিশীল করলাম আমাদের কাল্পনিক মহাকাশযানকে। ব্যস! ছুটে চললাম বৃহস্পতির সর্ববৃহৎ উপগ্রহ গানিমিডের দিকে।

আমরা কাছে এসে গেছি! উপরের ছবি থেকে সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এই বড় চন্দ্রটি কিরূপ দেখায় তা ধারণা করে নিন। নীচে আরেকটি ছবি ছাপা হয়েছে। এটি **'রিয়েল ছবি'**। ১৯৯৯ সালে ছবিটি গ্যালিলিও মহাকাশযান থেকে



চন্দ্র গানিমিড

তোলা। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছবিতে যেসব উজ্জ্বল সমতলভূমি দেখাচ্ছে ওগুলো সম্ভবত হিমায়িত আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত বস্তুর দ্বারা তৈরী। যাক, এই বিরাট চন্দ্রের উপর এবার বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

সর্ববৃহৎ চন্দ্র

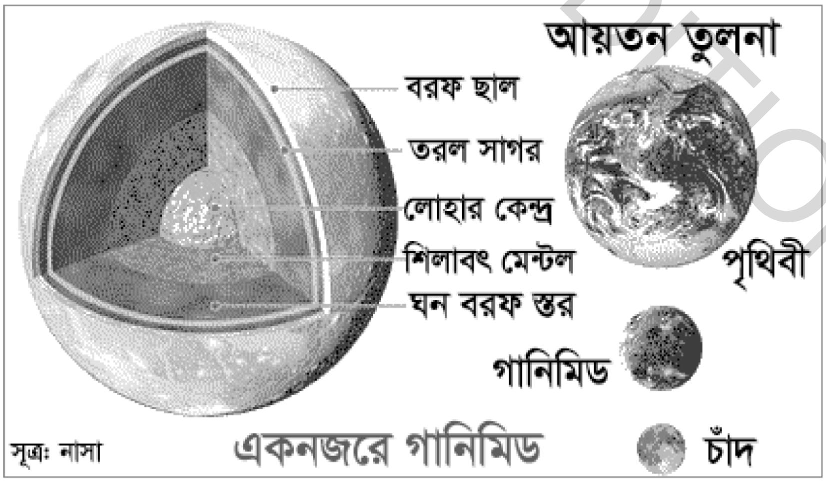
গানিমিড সমগ্র সৌরজগতের সকল চন্দ্র থেকে বড়। গোলাকার এই চন্দ্রের ব্যাসার্ধ **২,৪৩১.২ কিলোমিটার (১৫১০.৬৭ মাইল)**। শুধু চন্দ্র কেন, সৌরজগতের দু'টি **'গ্রহ' প্লুটো** এবং **বুধ** থেকেও সে বড়। তবে ভারী পাথর ও ধাতুর তৈরী বুধ থেকে ওজনে গানিমিড মাত্র অর্ধেক হবে। এর মূল কারণ হলো, তার মধ্যে বেশিরভাগ বস্তু হচ্ছে হিমায়িত পানি। আর পানির ঘনাঙ্ক ধাতু ও পাথর থেকে অনেকটা কম।

প্রদক্ষিণপথ ও চলন গতি

মা-গ্রহ বৃহস্পতির ঠিক বিষুবরেখা বরাবর অনেক ঊর্ধ্ব মহাকাশে গানিমিড প্রদক্ষিণরত আছে। সেলেস্টিয়ার মাধ্যমে আমরা প্রথমে এই বৃহৎ চন্দ্রটির দূরত্ব ও গতিমতি হিসেব করে নেবো। এরপর ইতোপূর্বে বর্ণিত চন্দ্র কালিস্টো'র মতো এই চন্দ্রের ঘূর্ণন গতি নির্ণয় করে দেখবো কী উচ্চগতিতে সে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে।

আমরা সেলেস্টিয়ার হিসাব থেকে জেনে নিলাম গানিমিড গড়ে **১০,০১,৫০০ কিমি ৬,২২,৩০২ মাইল)** দূরে থেকে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে। তার আহ্নিক গতি **৭.১৫৫** দিন। একই সময়ে সে তার মা-গ্রহ বৃহস্পতির চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণও করে আসে। তার উপরিস্থ তাপমাত্রা **১১০ ডিগ্রী কেলভিন (৩৮৩.১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)**। আমরা ফর্মুলা **2*p*r (দুই*পাই*ব্যাসার্ধ)** থেকে প্রদক্ষিণপথের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করলাম। এর মাত্রা হলো **৬২,৯২,৬০৪.৭৭ কিমি**। এ দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে প্রতি ঘণ্টায় গানিমিডকে অতিক্রম করতে হয়: **৬২৯২৬০৪.৭৭/৭.১৫৫*২৪ = ৩৬,৬৪৪.৬ কিমি/ঘণ্টা (২২,৭৭০ মাইল/ঘণ্টা)**। সুবহানাল্লাহ! গানিমিডের গতিও কম না।

পৃথিবীর উপর মানবসৃষ্ট কোন যানকে এখনো এরূপ উচ্চগতিশীল করা যায় নি। অবশ্য সেই বৃহস্পতির বিরাট মহাকর্ষ ব্যবহার করেই **'ভয়েজার-১'** নামক মহাকাশযানকে গেল শতকের শেষের দিকে **৪০ হাজার মাইল/ঘণ্টা** পর্যন্ত উচ্চ গতিশীল করা হয়েছিল। **ভয়েজার-১** এখন সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে। ২০০৩ সালে **'হিলিওপোজ'** অতিক্রম করে সে আন্তঃতারা মহাকাশে প্রবেশ করেছে। ছুটে চলছে ২৫ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত ভেগা নামক তারার দিকে। এই উচ্চগতিও কিন্তু আন্তঃতারা মহাকাশের জন্য কিছুই নয়! **ভয়েজার-১**-কে ভেগায় পৌঁছতে অন্তত **৪০ হাজার বৎসর লাগবে!** দীর্ঘদিন চলার পরও সে সূর্য থেকে **১১২ এইউ (১.৭৭ আলোক-বৎসর)** মাত্র দূরে চলে



যেতে সক্ষম হয়েছে। আমরা তারায় তারায় ভ্রমণে চলে যাবো ভাবছি? তবে হ্যাঁ, দূর ভবিষ্যতে মা-গ্রহ পৃথিবীর উপর মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকলে হয়তো এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করবে, কে জানে। আমরা তো আর আশা ছাড়তে পারি না!

ফিরে আসুন বর্তমানে। আরো তলিয়ে দেখি আমাদের অতি নিকটে (?) অবস্থিত বৃহস্পতির উপগ্রহ গানিমিডকে।

গঠনবস্তু ও সারফেস হাইলাইট

গানিমিডকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। তার বাইরের **ক্রাস্ট (ছাল) ৭৫ কিমি (৪৫ মাইল) গাঢ়**। অতি অল্প তাপমাত্রার ফলে এ

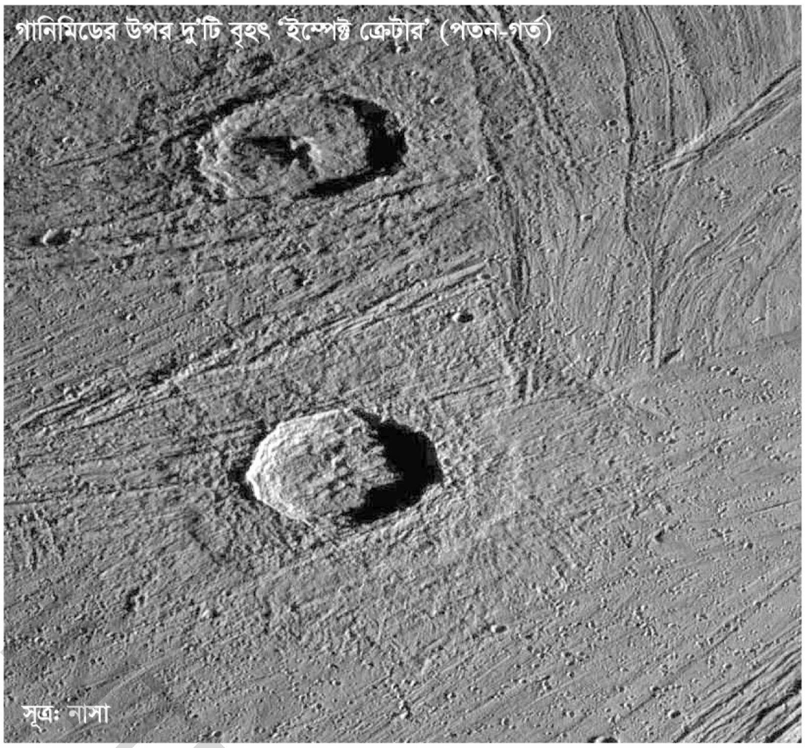


ক্রাস্টটি যে মূলত শক্ত বরফের তৈরী তা নিশ্চিত। ক্রাস্টের নীচের স্তরের নাম **'মেন্টল'**। এই স্তরটিতে পানি থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেকে তা-ই মনে করেন। কাছে থেকে নেওয়া ছবি স্পষ্ট করেছে, চন্দ্রের বাইরে অনেক পুরাতন ঘন পতন-গর্ত আছে। গর্তসর্বস্ব অঞ্চল অনেকটা কালো রংয়ের। অপরদিকে ভূতাত্ত্বিক **'সময়'** চিন্তায়, সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট পতন-গর্তও উপরিভাগে বিদ্যমান। এসব এলাকা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। আমাদের চাঁদটি কঠিন শিলাপাথর ও ধাতুর তৈরী। এর উপরস্থ পতন-গর্ত (ইম্পেক্ট ক্রেটার) স্থায়ী ও গভীর। অপরদিকে সর্ববৃহৎ চন্দ্র গানিমিডের পতন-গর্তের তলদেশ অনেকটা চেপ্টা। তাদের চতুর্দিকের উঁচু আইলও বেশ ঢিলেঢালা। এতে মনে হয়, ধীর গতিসম্পন্ন বরফ দ্বারা গর্তগুলোও ধীরে ধীরে ভরে যাচ্ছে। সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত অঞ্চলের নাম **'গ্যালিলিও রেজিও'**। **'সুলসি'** নামক আইল দ্বারা আবৃত বিরাট এই কালো অঞ্চলটি প্রায় ৪০০ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। দেখুন নীচের বায়ের চিত্রটি।

মহাকার্ষিক টান

ধারণা করা হয়, নিকটস্থ বড় চাঁদ কালিস্টো এবং বৃহস্পতির যৌথ মহাকার্ষিক শক্তির টানে গানিমিডের অভ্যন্তরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। পুরো চাঁদটি তার পড়শী ও মা-গ্রহের নির্মম শক্তির প্রভাবে আক্রান্ত। ভেতরের শিলা পাথরে ঘর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বেড়ে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা। এ থেকে নরম হচ্ছে তার **ক্রাস্ট**। ফলে বিরাট বিরাট বরফখণ্ড একটা আরেকটার উপর পতিত হয়ে সৃষ্টি করছে উপরে বর্ণিত **সুলসি** নামক আইল। অতীতে এই ক্রিয়া অনেকটা বেশী ছিলো। এখন চাঁদটির প্রদক্ষিণপথ প্রায় বৃত্তাকার ধারণ করেছে। কিন্তু প্রাথমিক যুগে সে সময় সময় বৃহস্পতির অতি নিকটে চলে যেতো এবং অন্য সময় বেশী দূরেও ভ্রমণ করতো। ফলে মহাকর্ষের ক্রিয়া তখন এক সময় খুব বেশী আর অন্য সময় খুব কম হতো। এই তারতম্যের কারণে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেকটা বেশী সংঘটিত হয়। অনুরূপ ধূমকেতু বা **'লেজতারা'** সূর্যের নিকটে এসে প্রচণ্ড মহাকর্ষ

ও গতির শিকার হয়। ক্ষয় হয় তার বস্তু। মূলত এই ক্ষয় থেকেই সৃষ্টি হয় কোটি কোটি মাইল দীর্ঘ **'লেজ'**। মহাকর্ষের টানশক্তি এরূপই নির্মম! বৃত্তাকার প্রদক্ষিণপথে চলার ফলে গানিমিড এখন অনেকটা নিরাপদ। তার ক্রাস্ট বেশ শক্ত ও ঠাণ্ডা হতে পেরেছে।


গানিমিডের উপর দু'টি বৃহৎ 'ইম্পেক্ট ক্রেটার' (পতন-গর্ত)
সূত্রঃ নাসা

বায়ুমণ্ডল

প্রিয় নভোচারী সাথীরা! আপনাদেরকে একটু আশার আলো দিচ্ছি। গানিমিডের একটি **বায়ুমণ্ডল** আছে- আর তা **অক্সিজেনের** তৈরী! আশার মাত্রা এটুকুই কিন্তু। কারণ বায়ুমণ্ডল এতোই পাতলা যে, অক্সিজেনের মাত্রা আমাদের মতো জীবীকে **'শ্বাস'** নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং এখানে **'মানব-কলোনি'** হবে না! অক্সিজেন কোত্থেকে আসলো? ধারণা করা হয়, সূর্যের আলো থেকে সৃষ্ট গ্রেফতারকৃত চার্জকরা কণা বৃহস্পতির শক্তিশালী মহাকার্ষিক ফিল্ড ভেঙ্গে **অক্সিজেনে** রূপান্তর করে। এই পাতলা গ্যাস যখন গানিমিডের কাছে আসে তখন সে তার নিজস্ব মহাকর্ষ দ্বারা একে গ্রেফতার করে নেয়। আর গানিমিডের ম্যাস ও ওজন একটি বায়ুমণ্ডল মেইনটেইন করার জন্য যথেষ্ট। আরেক চমক! ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে প্রদক্ষিণরত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের মতো গানিমিডেরও একটি **'ওজোন'** স্তর আছে। **ওজোন মূলত অক্সিজেনের তৈরী একটি মলিকিউল**।

নিকট মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ

গানিমিড সম্পর্কে প্রাপ্ত অধিকাংশ তথ্য এসেছে তার কাছ-ঘেষে চলে যাওয়া একাধিক মহাকাশযান থেকে। ১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম **ভয়েজার-১ মহাকাশযান** গানিমিডের কাছে যায়। একই বছর **ভয়েজার-২** নামক আরেকটি অনুরূপ স্পেইস ক্রাফ্ট একে ভিজিট করে। উভয় ক্রাফ্ট গানিমিডের কিছু স্পষ্ট ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিল। আমরা ইতোমধ্যে এক দু'টো ছবি দেখেছি। এরপর **গ্যালিলিও** নামক মহাকাশযান জুন ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো গানিমিডের নিকট দিয়ে উড়ে যায়। সে মাত্র **২৬০ কিলোমিটার (১৬২ মাইল)** দূরে অবস্থান করে, তিন মাস পর একই বছরের সেপ্টেম্বরে। পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীতে বেশ কিছু ছবি। এ ছবিগুলো পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা চাঁদের উপর **১৩টি গর্ত** আবিষ্কার করেন। এগুলো যে একটিমাত্র **'ধূমকেতু'** ভেঙ্গে পতিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে, তা


চিত্রশিল্পীর কল্পনায় গানিমিড থেকে বৃহস্পতি গ্রহের দৃশ্য

নিশ্চিত। আরো জানা গেছে, অতীতে হয়তো আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলে চাঁদের উপর গরম পানির অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু পরে তাপমাত্রা কমে আসায় তা বরফে পরিণত হয়েছে। গ্যালিলিও স্পেইস ক্রাফটের অপর আবিষ্কার হলো, গানিমিডের **ম্যাগনেটিক ফিল্ড**। মেপে দেখা গেছে সৌরজগতের কোন চন্দ্রেই গানিমিডের সমপরিমাণ শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই।

ইতিহাস

সৌরজগতের সর্ববৃহৎ এই চন্দ্র সম্পর্কে আমাদের তথ্যানুসন্ধান প্রায় শেষ। এখন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে বৃহস্পতির মহাকাশ থেকে বিদায় হবো আমরা। গ্যালিলিয়ান অপর তিনটি চন্দ্রের মতো (এগুলো হলো, আয়ো, কালিস্টো ও ইউরোপা) গানিমিডও যৌথভাবে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং জার্মান বিজ্ঞানী মারিয়াস আবিষ্কার করেন সে-ই ১৬১০ ঈসায়ী সনে। নামকরণ! ভাববেন না, এখন আর তেমন মন্তব্য করতে যাচ্ছি না। মারিয়াস এর নাম রেখেছিলেন, গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র জিউসের প্রেমিকা **'গানিমিড'** -এর নামানুসারে।

বৃহস্পতির নিকট-মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ

আমেরিকার নেশন্যাল **এ্যারোনোটিক্স এন্ড স্পেইস এডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)** সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতিকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে গেল শতকের শেষের দিকে বেশ ক'টি মহাকাশযান প্রেরণ করে। এর প্রথমটির নাম ছিলো **'পাইওনিয়ার-১০'**। ঈসায়ী ১৯৭২ সালের মার্চে পৃথিবী থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহ তার দীর্ঘ ভ্রমণ শুরু করে। এক মাস পর এপ্রিল ১৯৭২ সালে উড্ডয়ন করে **'পাইওনিয়ার-১১'**। অতি সাধারণ এ দু'টো ক্রাফ্ট থেকে আমরা বৃহস্পতির **মহাকর্ষ, ম্যাগনিটোস্ফিয়ার** এবং **উর্ধ্ব-স্ট্রাটোস্ফিয়ার** সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়েছি। সফল এই মিশন হেতু নাসা


গানিমিডের কম্পিউটার সৃষ্ট ভূমি

আরো একটি মিশন কয়েক বৎসর পর পুনরায় বৃহস্পতির দিকে প্রেরণ করে। ঈসায়ী ১৯৭৯ সালে প্রেরিত হয় **ভয়েজার-১** ও **ভয়েজার-২** মিশন।

পাইওনিয়ার মিশন থেকে **ভয়েজার মিশন** অনেকটা উন্নত ছিলো। বিজ্ঞানীরা এই উভয় ক্রাফ্ট বৃহস্পতির নিকটে নিয়ে প্রদক্ষিণ করান এবং দীর্ঘদিন এ দু'টো থেকে ছবিসহ অনেক তথ্য প্রাপ্ত হন। ক্রাফটের ক্যামেরা ও যন্ত্রাদি তিনটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে গ্রহের ম্যাপ বানিয়ে পৃথিবীতে

প্রেরণ করে। এই তিনটি তরঙ্গ হলো **আলট্রাভায়োলেট (ইউভি), দৃশ্যমান (ভিজিবুল)** এবং **ইনফ্রারেড (আইআর)**। এগুলোর মধ্যে সবার জানা তরঙ্গটি হলো দৃশ্যমান। এই তরঙ্গেই আমরা সবকিছু চোখে দেখি। সাধারণ ক্যামেরা এই তরঙ্গেই ছবি তোলে। তবে জগতে আরো অনেক তরঙ্গ আছে যা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। বস্তু থেকে দৃশ্যমান তরঙ্গে আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে পড়ে- ফলে আমরা বস্তুটি দেখি। অনুরূপ বস্তু থেকে দৃশ্যমান তরঙ্গের ব্যাপ্তির বাইরের তরঙ্গেও রশ্মি প্রতিবিম্ব হয়- কিন্তু আমাদের চোখ দ্বারা তা দেখতে পারি না। বিজ্ঞানীরা এসব **'অদৃশ্য'** তরঙ্গকে **'দৃশ্যমান'** করার কিছু কৌশল বা প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে দু'টি হলো **ইউভি ক্যামেরা** এবং **আইআর ক্যামেরা**।

উল্লেখিত ভয়েজার মহাকাশযানে তিনটি ক্যামেরা ছিলো: **সাধারণ, ইউভি ও আইআর ক্যামেরা**। সুতরাং তিন-তরঙ্গে পুরো বৃহস্পতির ছবি প্রেরণ করেছে ভয়েজার মহাকাশ-যানদ্বয়। আর ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না! তবে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশ করতে হচ্ছে। বর্ণিত তিনটি তরঙ্গে যেসব তথ্য বস্তু থেকে বেরিয়ে আসে তা ভিন্ন। সুতরাং তিনটি একসাথে মিলিয়ে দেখলে বস্তুটি সম্পর্কে আমরা অনেক বেশী অবগত হতে পারি। আর এ উদ্দেশ্যেই ভয়েজারে তিন-তরঙ্গের ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল।

দৃশ্যমান ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের মেঘমালার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পেয়েছেন। ইউভি ছবি থেকে জানতে পেরেছেন সৌরবাতাসের সঙ্গে বৃহস্পতির ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে সে সম্পর্কে অনেক তথ্য। আর আইআর ক্যামেরা থেকে নেওয়া তথ্যাদি দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি কোন্ উপায়ে উপরস্থ বায়ুমণ্ডল থেকে তাপশক্তি মুক্ত হয় এবং উপর-বায়ুমণ্ডল কি কি বস্তুর তৈরী।

উলিসেস (Ulysses) নামক একটি মহাকাশযান ১৯৯০ সালে নাসা প্রেরণ করে। সূর্যকে কাছে থেকে গবেষণা ছিলো এটি প্রেরণের উদ্দেশ্য। সূর্যের উভয় মেরুর উপরে **উলিসেস** এর কক্ষপথ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। নির্দিষ্ট এই কক্ষপথে ক্রাফ্টকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবহৃত করা হয় বৃহস্পতির বিরাট শক্তিশালী মহাকার্ষিক ফিল্ড। সুতরাং বিজ্ঞানীরা দু'বার বৃহস্পতির নিকটে উলিসেসকে নিয়ে যান। ১৯৯২ ও ২০০৪ সালে এই নিকট-সাক্ষাৎ ঘটে মহাকাশযান ও বৃহস্পতির মধ্যে। এই সাক্ষাৎদ্বয় সূর্যের মেরুর উপর প্রদক্ষিণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হলেও ক্রাফ্টটি বোনাস হিসাবে বৃহস্পতির **ম্যাগনিটোস্ফিয়ার** ও **মহাকার্ষিক** ফিল্ডের বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

উলিসেস প্রেরণে পূর্বে ১৯৮৯ সালে নাসা **'গ্যালিলিও মিশন'** বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। ১৯৯৫ সালে গ্যালিলিও মহাকাশযান বৃহস্পতির কাছে পৌঁছে।

এছাড়া **'কসিনি-হাইজেন্স' মিশন** ২০০০ সালের ডিসেম্বরে বৃহস্পতির নিকট-মহাকাশে ঘেষে যাওয়ার সময় অনেক তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এ মিশনটি ছিলো শনিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত। অপর আরেক মহাকাশযান **'নিউ হরাইজন'** ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বৃহস্পতির পাশঘেষে উড়ে যাওয়ার সময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য হলো ২০১৫ সালের দিকে দূরতম গ্রহ প্লুটোর নিকট পৌঁছা। নাসা **'জুপিটার পোলার অরবিটার'** মিশন, সংক্ষেপে 'Juno' নামক আরেক মিশন ২০১১ সালে প্রেরণ করেছে। আশা করা হচ্ছে ২০১৬ সালে এই মিশন তার গন্তব্যস্থল বৃহস্পতিতে পৌঁছবে। আমরা অপেক্ষায় রইলাম। এবার আসুন, পৃথিবীর বাইরের পড়শী মঙ্গলের দিকে আমরা ভ্রমণ শুরু করি।



৭

এ্যাস্টারোইড বেল্ট

রোমাঞ্চকর গ্রহ মঙ্গলের দিকে

সহযাত্রী নভোচারী ভাইবোন! সৌরজগতের বাইর থেকে আমরা সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি পর্যন্ত ইতোমধ্যে ভ্রমণ করেছি। বৃহস্পতি ও তার ক'টি বড়ো চন্দ্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের কল্পিত মহাকাশযানটি ঘুরিয়ে পৃথিবীর বাইর-পড়শী গ্রহ মঙ্গলের দিকে ফেরাবো। মঙ্গল অনেক অনেক দূরে। সেলেস্টিয়া থেকে জানা গেলো লাল গ্রহ মঙ্গল এই মুহূর্তে (২৮ এপ্রিল ২০১২, সময়: ৩:৪০) **৬.৩ এইউ (৫৮,৫৬,২১,৫৯০ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে। সুতরাং আমাদেরকে এই দীর্ঘ আন্তঃগ্রহ মহাশূন্য পাড়ি দিতে হবে।



এ্যাস্টারোইড বেল্ট

আমরা ছুটে চললাম মঙ্গলের দিকে। পথিমধ্যে ছোটবড়, আকারে আলুর মতো কালো রংয়ের গতিশীল বেশ কিছু বস্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলো। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝপথে বিশাল এক অঞ্চলজুড়ে অবস্থানরত এসব বস্তুর একটি বেল্ট বিদ্যমান। একে বিজ্ঞানীরা **'এ্যাস্টারোইড বেল্ট'** নামে আখ্যায়িত করেছেন। সূর্য থেকে **২ ও ৩ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** দূরত্বে এই বেল্টের অবস্থান। দেখুন, নীচের চিত্রটি।

সেরেস

এ পর্যন্ত হাজার হাজার এ্যাস্টারোইড আবিস্কৃত হয়েছে। সর্ববৃহৎ বস্তুটির নাম **সেরেস**। গোলকাকৃতির এই এ্যাস্টারোইডকে এখন বিজ্ঞানীরা **'বামন গ্রহ'** হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। পরের পৃষ্ঠার প্রথম ছবিতে আমরা হাবল মহাকাশ-টেলিস্কোপ থেকে নেওয়া সেরেসের একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি। সেরেসের ব্যাসার্ধ **৮৪৭.৫ কিমি (৫২৭ মাইল)**। সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব **২.৮৫৪৮ এইউ (২৬,৫৩,৭০,২৪০ মাইল)**। তার আহ্নিক গতি **৯.০৭৪** ঘণ্টা। সূর্যের চতুর্দিকে তার অনেকটা ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে **৪.৬ বৎসর**।



হাবলের তোলা সেরেসের ছবি

সেরেসকে কেনো **'ডর্ফ প্লানেট'** হিসাবে ঘোষণা করা হলো? মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর গবেষণাকারী একদল বিজ্ঞানী **'ইন্টারনেশন্যাল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন'** (International Astronomical Union) নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংস্থার আইনানুযায়ী আমাদের বা অন্য সৌরজগতের যে কোন বস্তু **'গ্রহ'** হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে তার আকার, আয়তন ও ওজন যথেষ্ট হতে হবে। সে তার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে- অন্য কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করলে চলবে না। **সেরেস, এরিস ও প্লুটোকে** এসব বিষয় বিবেচনা করে এখন **বামন গ্রহ** (dwarf planet) হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে **আইএইউ**। যাক, আমরা কোনটি গ্রহ কিংবা নয়- সে দরবারে যেতে চাই না।

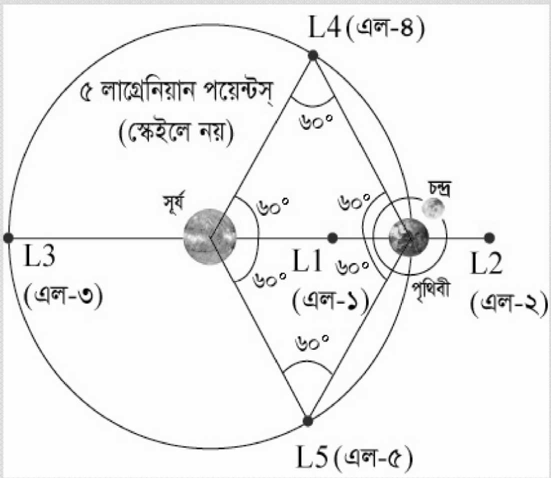
এ পর্যন্ত জানা আরো দু'টো বড় এ্যাস্টারোইড হলো **পালাস** এবং **ভেস্টা**। উভয়টির ব্যাস অন্তত **৫৩০ কিমি (৩২৯ মাইল)** পর্যন্ত হবে। দু' শতেরও অধিক এ্যাস্টারোইড সনাক্ত করা হয়েছে যাদের ব্যাস **৯৭ কিমি (৬০ মা)** বা বেশী হবে। তবে আরো হাজার হাজার ছোট্ট আয়তনের এ্যাস্টারোইড ভেসে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ এ্যাস্টারোইড নিজেদের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে **৫ থেকে ২০ ঘণ্টায়** একবার ঘুরে আসে। এটাই তাদের আহ্নিক গতি।

ট্রজান এ্যাস্টারোইড

নীচের কল্পিত চিত্রে বৃহস্পতির আগে ও পিছে দু'দল এ্যাস্টারোইড দেখানো হয়েছে। এ উভয় দলকে বলে **'ট্রজান'** এ্যাস্টারোইড। মেপে দেখা গেছে সামনের দল বৃহস্পতির প্রদক্ষিণপথ থেকে **৬০ ডিগ্রী অগ্রে** ও পেছনের দল **৬০ ডিগ্রী পিছে** ঘূর্ণমান আছে। এছাড়া অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গ্রহ নেপচুনের নিকটে একদল ট্রজান এ্যাস্টারোইডের সন্ধান পেয়েছেন। এই দলের সদস্যসংখ্যা বৃহস্পতির ট্রজান দল থেকেও বেশী। আরেক নামকরা এ্যাস্টারোইড হলো **কিরন** (Chiron)। ১৯৭৭ সালে আবিস্কৃত এই বড় এ্যাস্টারোইড শনি ও ইউরেনাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

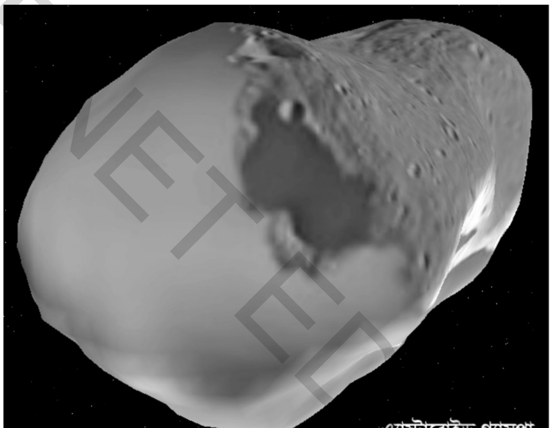


লাগ্রেনিয়ান পয়েন্টস্ (Lagrangian points)**:** মহাকাশে যে কোন গ্রহ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ৫টি পয়েন্ট আছে যেগুলো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসব পয়েন্টকে বলে **লাগ্রেনিয়ান পয়েন্টস্**। এই নামকরণটি ইতালীয়-ফসারী গাণিতিক **জসেফ লুই লাগ্রেন (১৭৩৬-১৮১৩)** এর নামানুসারে করা হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম এরূপ বিশেষ পয়েন্টস্ মহাকাশে থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এসব পয়েন্টে স্থাপিত কোন কম-ওজনবিশিষ্ট বস্তু যেমন এ্যাস্টারোইড কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহ নিকটস্থ গ্রহের সমপরিমাণ গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম। অন্য কোথাও সমপরিমাণ গতিতে চলা সম্ভব নয়। কারণ হলো, সূর্যকে কোন্ গতিতে প্রদক্ষিণ করতে হবে তা নির্ভর করে সূর্য থেকে বস্তুর দূরত্ব ও তার ওজন (ম্যাস) ইত্যাদির উপর। এ কারণেই বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের বার্ষিক গতি ভিন্ন। সাধারণত সূর্যের যতো কাছে থাকবে ঘূর্ণন গতিও ততো তাড়াতাড়ি হবে। লক্ষ্য করুন, বুধের গতি ৮৮ দিন, শুক্রের গতি ২২৫ এবং পৃথিবীর গতি ৩৬৫ দিন। এই তারতম্যের কারণ হলো গ্রহদের ওজন ও সূর্য থেকে দূরত্ব।



প্রদক্ষিণপথ অতিক্রমকারী এ্যাস্টারোইড

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সময় সময় কিছু এ্যাস্টারোইড বিভিন্ন গ্রহের প্রদক্ষিণপথ অতিক্রম করে যায়। গ্রহ মুতাবিক এসব 'ক্রস-করনেওয়ালা' এ্যাস্টারোইডকে বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন: ১. মঙ্গলের প্রদক্ষিণপথ অতিক্রমকারীদের নাম 'এ্যমোর্স' (Amors), ২. যারা পৃথিবীর প্রদক্ষিণপথ ক্রস করে তাদের নাম 'এ্যাপোলোজ' (Apollos) এবং ৩. যেসব এ্যাস্টারোইডের প্রদক্ষিণপথ পৃথিবী থেকেও কম তাদেরকে বলে 'এ্যাটেন্স' (Atens)। বিজ্ঞানীদের ধারণা এসব ক্রস-করনেওয়ালা এ্যাস্টারোইড দ্বারা অতীতে আমাদের গ্রহ বম্বার্ডমেন্টের শিকার হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হতেও পারে।


এ্যাস্টারোইড গ্যাস্প্রা

এ্যাস্টারোইড থেকে মিটিওর শাওয়ার

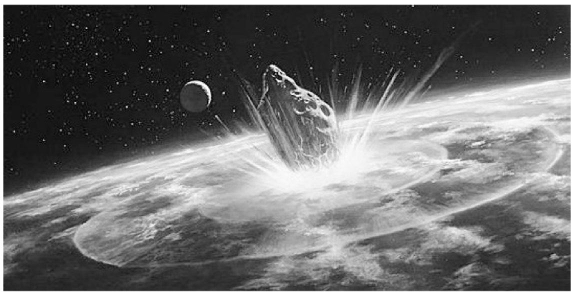
আমরা অনেকেই দেখেছি। আকাশে খুব দ্রুত গতিতে **'উজ্জ্বল তারাদের'** ক্ষণস্থায়ী দৌড়। এগুলো আসলে তারকা নয়- **উল্কা**। তবে রাতের আকাশে তথাকথিত এই 'উল্কা বর্ষণ' (meteor

shower) কেন হয়? অধিকাংশ মতে **ধূমকেতু ও এ্যাস্টারোইড** হলো এর কারণ। পৃথিবীর নিকট-প্রদক্ষিণপথ অতিক্রমকালে ধূমকেতু ও এ্যাস্টারোইড রেখে যায় অসংখ্য ছোট-বড় উল্কা। পৃথিবী যখন তার বার্ষিক গতিপথে ওসব বস্তুর সাক্ষাৎ পায় তখনই শুরু হয় এই **মিটিওর শাওয়ার**। যেসব উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে যায় তারাই হলো **'মিটিওর'**। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যখন এসব উল্কা প্রবেশ করে তখন প্রচণ্ড গতিশীল থাকে। বায়ুমণ্ডলের বস্তুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে অধিকাংশ ছোট্ট আয়তনের উল্কা জ্বলে যায়। এ কারণে এগুলোকে ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল অগ্নিবর্ণ দেখায়। তবে সময় সময় বেশ বড় খণ্ডের উল্কারও আবির্ভাব পৃথিবীর আকাশে ঘটে থাকে। এগুলোকে বায়ুমণ্ডল জ্বালিয়ে শেষ করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা ভূপাতিত হয় প্রচণ্ড বেগে। সময় সময় মাটির মধ্যে বেশ বড়ো গর্তও করে এগুলো। এরূপ **'পতন-উল্কা'** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়ই পাওয়া যায়। পতিত উল্কাকে ইংরেজীতে **'মিটিওরাইট'** বলে।


মিটিওর শাওয়ারের একটি ছবি

পর্যবেক্ষণ

এ্যাস্টারোইড খুব একটা আকর্ষণীয় বস্তু নয়। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো পর্যবেক্ষণ করা জরুরী- অন্তত পৃথিবীর নিকট মহাকাশে এদের আগমন মনিটর করা সত্যিই সমগ্র মানবজাতির জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। নভোচারী সহযাত্রী! আপনি বুঝতে পারছেন কারণটা কি? ইতোমধ্যে মহাকাশ থেকে আগত বড় **উল্কা, ধূমকেতু** কিংবা **এ্যাস্টারোইড** দ্বারা আমাদের পৃথিবী বম্বার্ডমেন্টের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ কতোই না চিন্তিত! এমনকি **হলিউড** এ ব্যাপারে একাধিক **চলচিত্রও** বানিয়েছে। বাস্তবে, বড় কোন এ্যাস্টারোইড দ্বারা পৃথিবী আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া খুব একটা সচরাচর ঘটনা নয়। কিন্তু সুদূর অতীতে এরূপ মহাবিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রমাণ মিলেছে। আর এ কারণেই সতর্কতা। নীচের কাল্পনিক ছবিটি দেখুন।



বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত **৩০০ এ্যাস্টারোইডের সন্ধান পেয়েছেন যারা পৃথিবীর প্রদক্ষিণপথ ক্রস করে যায়।** তবে কারো কারো ধারণা এরূপ **নিয়ার-আর্থ এ্যাস্টারোইডের** সংখ্যা অন্তত কয়েক হাজার হবে। এদের মধ্যে পনেরো শতাধিক থাকতে পারে যাদের আয়তন বেশ বড়। আর এ কারণেই সতর্কতা। এরূপ বড় আয়তনবিশিষ্ট একটি মাত্র এ্যাস্টারোইড উচ্চ গতিতে পৃথিবীর উপর ভূপাতিত হলে লঙ্কা কাণ্ড ঘটে যাবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ঠিক এরূপ একটি মহাকাণ্ড ঘটেছিল আজ থেকে সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে। বিরাট আকারের এই এ্যাস্টারোইড পৃথিবীতে ভূপাতিত হয়ে সমগ্র গ্রহব্যাপী অবিশ্বাস্য কিয়ামত-কাণ্ড ঘটায়। সে যুগের বিরাট বিরাট প্রাণী ডাইনাসোরসহ পৃথিবীর উপরস্থ সকল জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ পর্যন্ত যা বললাম, তা কিন্তু এখনো **'থিওরী পর্যায়ের ধারণা'** মাত্র। সুতরাং, প্রিয় পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, চিন্তামগ্ন হবেন না- **রিলাক্স,** অনর্থক ভেবে স্বাস্থ্য নষ্ট করতে নেই! থিওরী প্রদানকারী ঐ বিজ্ঞানী সাহেবরাই বলছেন, বড় আয়তনের

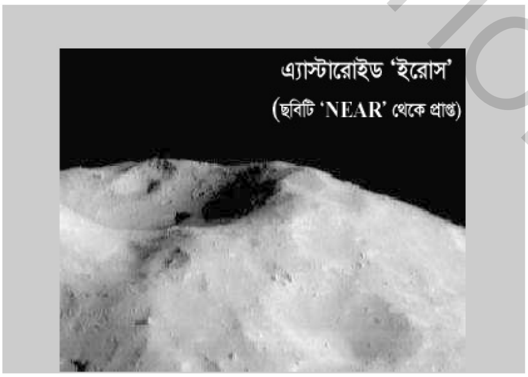
এ্যাস্টারোইড পৃথিবীতে পতনের চান্স খুব কম! প্রতি ৩ লক্ষাধিক বৎসরে তা একবার ঘটতে পারে। তবে অতীতে যে এ্যাস্টারোইড বা বড় আকারের মিটিওর পৃথিবীর উপর পতিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। এ পর্যন্ত জানা **১৭৬টি পতন-গর্তের সন্ধান মিলেছে**। নীচে আমরা একটি ছবি তুলে ধরেছি, এতে তিনটি ইম্পেক্ট ক্রেটার চিত্রিত হয়েছে।

গেছে পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে ভ্রমণরত এই বস্তুটির ব্যাস **৬০ কিমি (৩৭ মাইল)**। এরপর নিয়ার-শুমেকার ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার গন্তব্যে পৌঁছে। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত এই ক্রাফ্‌টকে বিজ্ঞানীরা কৌশলে ইরোসের চতুর্দিকে একটি কক্ষপথে ঘুরাতে থাকেন। শুরু হয় কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ। দীর্ঘ ১ বৎসর স্থায়ী এই পর্যবেক্ষণ থেকে ইরোস সম্পর্কে অনেক তথ্য



আমেরিকার **'নাসা'** মহাকাশ সংস্থা **১৯৯৬** সালে এ্যাস্টারোইড কাছে থেকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন মহাকাশযান উড্ডয়ন করে। 'Near-Earth Asteroid Rendezvous (NEAR)' নামক এই ক্রাফ্‌টকে পরে 'NEAR-Shoemaker' নামকরণ করা হয়। নিয়ার-শুমেকার মহাকাশে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো ইরোস (Eros) নামক এক এ্যাস্টারোইডের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পথিমধ্যে মহাকাশযান **'৪৫৩ মেথাইলড্‌'** নামক আরেক এ্যাস্টারোইডের নিকট দিয়ে উড়ে যায়। জুন ১৯৯৭ সালে এই সাক্ষাৎ ঘটে। মেপে দেখা

পাওয়া গেছে। এ্যাস্টারোইডের গঠনপ্রণালী, সম্ভাব্য বয়স, কিসের তৈরী ইত্যাদি জানা গেছে। সর্বোপরি ইরোসের ছবিও নিয়ার-শুমেকার পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। নীচের ছবিটি দেখুন।



এ্যাস্টারোইডের উপর প্রথম অবতরণ

মানুষ চন্দ্রের উপর অবতরণ করেছে। কৃত্রিম মহাকাশযান মঙ্গলসহ অন্যান্য গ্রহের উপরও অবতরণ করেছে। বাকী ছিলো এ্যাস্টারোইডের উপর ল্যান্ডিং। এটাও এখন ইতিহাস। নিয়ার-শুমেকার তার নির্ধারিত মিশন-কাল শেষ করে ২০০১ সালের শুরুতে। নাসা'র বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, একটা ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়। সিদ্ধান্ত নিলেন ইরোসের উপর ক্রাফ্টকে **'নিয়ন্ত্রণ বিধ্বস্ত'** করবেন। পৃথিবী থেকে সিগনাল প্রেরিত হলো নিয়ার-শুমেকারে। ধীরে ধীরে ক্রাফ্টটি ইরোসের উপর ল্যান্ডিং করলো সফলভাবে। ইতিহাস লিখিত হলোঃ **২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ একটি এ্যাস্টারোইডের উপর অবতরণ করেছে। দেখুন, সেই মুহূর্তের ঐতিহাসিক ছবিটি (নীচে)।**

অন্যান্য মিশন

এ্যাস্টারোইড সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। প্রথম **এ্যাস্টারোইড-ল্যান্ডিং** পরে আমেরিকার নাসা মহাকাশ সংস্থা **ডীপ স্পেইস-১** (Deep Space-1) নামক ক্রাফ্ট ১৯৯৯ সালে ছোট্ট **এ্যাস্টারোইড ৯৯৬৯ ব্রেইলি'**র নিকট পাঠায়। এরপর জাপানি মহাকাশযান **'হাইয়াবুসা'** ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে এ্যাস্টারোইড **ইটোকাওয়া**-কে ভিজিট করে। নাসা ২০০৭ সালে আরেক মিশন প্রেরণ করেছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যপথে অবস্থিত **এ্যাস্টারোইড বেল্টের** দিকে। উদ্দেশ্য হলো বড় আয়তনের কয়েকটি এ্যাস্টারোইড সম্পর্কে আরো জানা। **ডন** (Dawn) নামক একটি মহাকাশযান **ভেস্টা** ও **সেরেস** নামক এ্যাস্টারোইডদ্বয়কে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভিজিট করার কথা।



অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে 'NEAR' প্রেরিত ইরোসের পৃষ্ঠদেশের সর্বশেষ ছবি

সহযাত্রী! এবার আসুন আমাদের কাল্পনিক মহাকাশযানকে নিয়ে যাই রোমান্টিক গ্রহ মঙ্গলের নিকটে। সফলভাবে এ্যাস্টারোইড বেল্ট পাড়ি দিয়ে আমরা ছুটে চললাম আন্তগ্রহ মহাশূন্যে। মঙ্গল বেশ ছোট্ট একটি গ্রহ। আমরা তার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য **১৪৫ এইউ (১,৩৪৭,৮৫,৯২,১৫৯ মাইল)** উপরে এসে গতিরোধ করলাম। নীচের চিত্রে অভ্যন্তরীণ চারটি গ্রহের অবস্থান ও কক্ষপথ তুলে ধরা হয়েছে। এই চিত্রটি কাল্পনিক কিন্তু গ্রহের প্রদক্ষিণপথ ও অবস্থান বাস্তব। আসলে ২৯ এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দের দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটের সময় গ্রহগুলো যে অবস্থানে ছিলো তা-ই চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে।



চার 'শক্ত ভূমি'র টেরেস্ট্রিয়্যাল গ্রহ





৮

রোমান্টিক গ্রহ মঙ্গলের কাছে

অভ্যন্তরীণ গ্রহ মঙ্গল

আমাদের সৌরজগতের আটটি (অতীতে ন'টি: **প্লুটো** এখন তথাকথিত **'ডোর্ফ প্লানেট'** হিসাবে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে) গ্রহের চারটি অভ্যন্তরীণ গ্রহ শক্ত **শিলা-পাথর** ও **মাটির তৈরী**। এগুলোকে একত্রে **'টেরেস্ট্রিয়্যাল প্লানেট'** (terrestrial planet) বলে। ইংরেজী terrestrial শব্দের অর্থ পৃথিবীর মতো। আসলে অন্য তিনটি গ্রহ ঠিক পৃথিবীর মতো নয়। হলে তো ওগুলো প্রাণী বসবাসের যোগ্য হতো। যাক, আমরা এবার চলে যাবো মঙ্গলের নিকটে।

নীচের চিত্রে মঙ্গল ও তার দু'টো চন্দ্রের কক্ষপথ দেখা যাচ্ছে। ভেতরের চন্দ্রের নাম **ফবোস** ও বাইরেরটি **ডাইমোস**। আমরা মঙ্গলের উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি। এক পর্যায়ে এ দু'টো চন্দ্রের উপরও আলোচনা হবে। প্রথমে মঙ্গল সম্পর্কে সেলেস্টিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি তুলে ধরছি। অবশ্য এসব তথ্য সত্যায়ন করতে যেয়ে আমরা সময় সময় **'এনকার্টা ইনসাইক্লোপিডিয়া'**, **'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'**, **'সাইন্স ক্রনোলজি'**, **'দ্যা ইন্টারনেট'** এবং অন্যান্য সূত্র তলিয়ে দেখবো।



সূত্র: সেলেস্টিয়া

মঙ্গলের উপর থেকে এই মুহূর্তে (২৯ এপ্রিল ২০১২, সময়: ৩:৩৩ মিনিট) সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করেছি। তা **১.৬৩৯৬ এইউ (১৫,২৪,১০,৩৪৩ মাইল)**। তবে সে সর্বদা এটুকু দূরত্বে থাকে না। সূর্য থেকে মঙ্গলের গড় দূরত্ব হলো **২২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার (১৪ কোটি ১৭ লক্ষ মাইল)**। তার বার্ষিক গতি **১.৯ বৎসর**। সে প্রতি ঘণ্টায় **৫৩,৭০০ মাইল** বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এ গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় কম। সূর্যের চতুর্দিকে **৬৭,০০০ মাইল** প্রতি ঘণ্টায় গতিশীল আছে পৃথিবী। মঙ্গলের আহ্নিক (দৈনিক) গতি পৃথিবীর একদিন থেকে একটু বেশী: **১.০২৬ দিন**। তার ব্যাসার্ধ **৩,৩৯৬ কিলোমিটার (২১১০ মাইল)**। মঙ্গলের উপর গড় তাপমাত্রা মাত্র **২১২ ডিগ্রী কেলভিন (-৬১.১৫**

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)। প্রাথমিক এসব তথ্য জানার পর আমরা এবার বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারি।



লালচে গ্রহ মঙ্গল

মঙ্গল গ্রহের উপর বিজ্ঞানীদের আকর্ষণ বিরাট। এটা অনেকটা পৃথিবীর মতোই। এর মধ্যে আছে একটি বায়ুমণ্ডল, পরিবর্তনশীল ঋতু ও আবহাওয়া। সারফেসে আদি যুগের পানি, সাগর, মহাসাগর ও নদী-নালা ইত্যাদির নিদর্শনও বিদ্যমান। মঙ্গলে অতীতে বা বর্তমানে প্রাণী ছিলো কিংবা আছে কি না এটা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের **'সিক্সটি ফোর মিলিওন ডলার কুয়েস্‌শন?'**। প্রশ্নের সুরাহা এখনো হয় নি। যদিও অনেক **'রিপোর্ট'** শোনা যায়। মূলত এ প্রশ্নের জবাব বের করতে যেয়েই সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে একটি মাত্র গ্রহের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী মহাকাশযান ও মিশন প্রেরণ করা হয়েছে ইতোমধ্যে। ভবিষ্যতে আরো প্রেরণের পরিকল্পনা আছে।

পৃথিবীর আকাশে একে দেখতে অনেকটা অগ্নিবর্ণ লাগে- তা-ই তাকে **'লাল গ্রহ'** বলে সম্বোধন করা হয়। আসলে এর উপর কোন আগুন নেই- অন্তত এখন নেই। মঙ্গলের মাটির রংই লাল। মহাকাশযান তার উপর অবতরণ করে ছবি প্রেরণ করেছে- এ থেকে ব্যাপারটি স্পষ্ট। আপনারা সবাই মঙ্গলের ছবি দেখেছেন নিশ্চয়ই। মাটির রং লাল হওয়ার কারণ হলো জঙ্গ-ধরা অগ্নিবর্ণের **লৌহ-অক্সাইড** ধূলোবালিতে পুরো গ্রহের উপরিভাব আবৃত।

মঙ্গল খুব একটা বড় ওয়ার্লড নয়। পৃথিবীর তুলনায় তার ব্যাস অর্ধেকের মতো। তাছাড়া ওজন বা ম্যাস মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ হবে। মনে করুন ৭২ কেজি ওজনবিশিষ্ট স্লিম হ্যান্ডসাম ব্যক্তি আপনি (আমি এটাই আশা করি!)। নভোচারী সেজে মঙ্গলে যেয়ে অবতরণ করলেন। কি মনে করেন? আপনি নিজেকে পাতলা, ভারী না অপরিবর্তিত অনুভব করবেন? ম্যাস বা বস্তু কম হওয়ার কারণে মঙ্গলের মহাকর্ষ (যার কারণে ওজন অনুভূত হয়) পৃথিবীর তুলনায় আট ভাগের তিন ভাগ মাত্র। এবার নিশ্চয় জেনে নিয়েছেন, আপনার ওজন ওখানে কি হবে- মাত্র **৩*(৭২/৮) = ২৭ কেজি!** প্রায় সত্যি কথা হলো, মঙ্গলের মহাকর্ষ চন্দ্রের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। তার ব্যাসার্ধও চন্দ্রের তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীর উপর ১ কেজি ওজনবিশিষ্ট বস্তুর ওজন কি হবে তার একটি টেবিল পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করেছি। কেন এ পার্থক্য এবং কিভাবে অঙ্ক কষে তা বের করতে হয়, ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। পাঠ করবেন, ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক বৈকি।

মঙ্গলের পুরো সারফেস এরিয়া ও পৃথিবীর শুষ্ক সারফেস এরিয়ার পরিমাণ প্রায় সমান। এছাড়া মানে করা হয়, মঙ্গল ও পৃথিবীর বয়স প্রায় একই- **৪.৬ বিলিয়ন (৪৬০ কোটি) বৎসর**। এটা একটি থিওরী। সৌরজগৎ সৃষ্টির বিভিন্ন থিওরীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো গ্রন্থের শেষের দিকে। আমরা তখন সূর্যের কাছে থাকবো। সৌরজগৎ শব্দটি কিছুটা দুর্বোধ্য। কেউ

কেউ এ শব্দটি দ্বারা পুরো মহাবিশ্বকে বুঝেন- আসলে তো তাই নয়। ইংরেজী শব্দ **'সোলার সিস্টেম'** (solar system) এর আক্ষরিক অনুবাদ **সৌর+জগৎ** নয়। বরং **সৌর+কাঠামো,** অর্থাৎ **'সৌরকাঠামো'**। সোলার শব্দের অর্থ সূর্য-সম্পর্কিত। **সৌরসিস্টেম** বলতে মূলতঃ সূর্য ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন **গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, এ্যাস্টারোইড, অর্ট ক্লাউড, কাইপার বেল্ট,**


কাছে থেকে মঙ্গলদৃশ্য
একটি দীর্ঘ উপত্যকা

এ্যাস্টারোইড বেল্ট, সৌর বাতাস ইত্যাদি সবকিছু বুঝায়। কিন্তু আমাদের এই সৌরজগতটা মহাবিশ্বের অসংখ্য **'গ্যালাক্সির'** মধ্যে একটি- **'মিল্কিওয়ে'** এর মধ্যস্থ নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট একটি অঞ্চল মাত্র। যাক, এসব নিয়ে আমরা এ পর্যায়ে মাথা ঘামাবো না! সূর্যের উপর আলোচনাকালে বিস্তারিত বলবো। ফিরে আসি মঙ্গলের নিকট।

মঙ্গল পর্যবেক্ষণ

মঙ্গলকে আদি যুগ থেকে পৃথিবীর মানুষ দেখে আসছে। অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল তারকাসদৃশ এই গ্রহটি পৃথিবীর আকাশে প্রতি রাতেই কোথাও না কোথাও দৃশ্যমান হয়। আমাদের পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে দূরত্বে বেশকম হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মুহূর্তে (৩০ এপ্রিল ২০১২, সময়: সকাল ৯:৪০ মিনিট) সেলেস্টিয়ার হিসাব অনুযায়ী মঙ্গল পৃথিবী থেকে **০.৯৩৬৩৬ (৮,৭০,৪০,১০০ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে।

গত আগস্ট ২০০৩ সালে মঙ্গল ও পৃথিবী একে অন্যের সর্বাপেক্ষা কাছে অবস্থান করে। এ সময় উভয় গ্রহের মধ্যে দূরত্ব ছিলো **০.৩৯২৬৬ এইউ (৩,৬৫,০০,০২৮ মাইল)**। ২২৮৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মঙ্গল ও পৃথিবী আর এতো কাছে আসবে না।

মঙ্গলকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখতে অনেকটা লাল-কমলা বর্ণের বৃত্তের মতো লাগে। মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফের ক্যাপ আছে যা অনেকটা আমাদের পৃথিবীর উভয় মেরুর মতো। এই বরফও টেলিস্কোপের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফের মতো মঙ্গলের মেরুর বরফও প্রতি বৎসর আয়তনে ছোট-বড় হয়- অর্থাৎ, গলে ও শক্ত অবস্থা ধারণ করে। তবে তার দেহের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে অতীতে **'ভুল তথ্য'** পরিবেশন


মঙ্গলের মেরু অঞ্চল

করেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী। এ থেকেই মঙ্গলে **'নদী-নালা'**, কৃত্রিমতার নিদর্শন ইত্যাদি থাকার ধারণা জন্মেছে। **এইচ.জি. ওয়েলস** নামক এক বৃটিশ বিজ্ঞানী গত শতকের ত্রিশের দশকে **'ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্লডস'** নামক উপন্যাস লেখেন। মঙ্গলে **'এলিয়েন'** সুপার-বুদ্ধিমান জাতি বাস করে এবং তারা পৃথিবীতে এসে হামলা চালায়। ইত্যাদি **'রোমাঞ্চকর'** কাহিনী থেকে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে, হয়তো মঙ্গলে সুপার-ইন্টেলিজেন্ট না হলেও অন্তত কোন ধরনের প্রাণী থাকবে নিশ্চয়ই। আর এরূপ ধারণার ফলে মহাকাশ অনুসন্ধান যুগের শুরু থেকেই মঙ্গলে বিশেষ মিশন প্রেরিত হওয়া শুরু হয়।

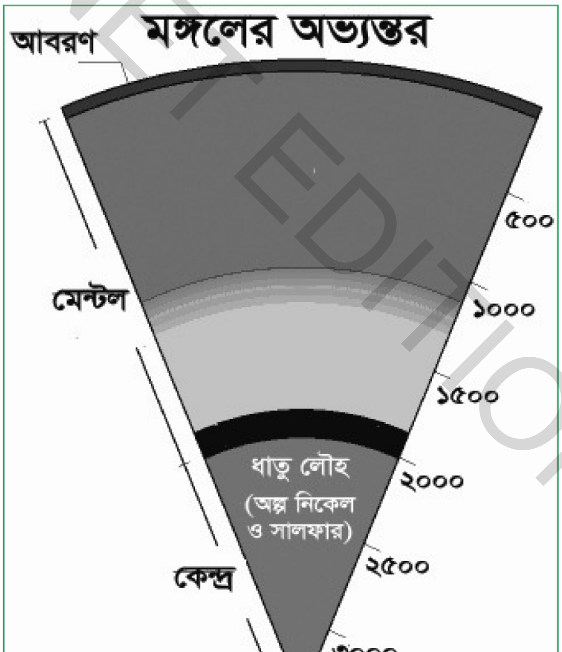

মঙ্গলের একটি উপত্যকা

মঙ্গলের অভ্যন্তর

মঙ্গল কিসের তৈরী? এ প্রশ্নের আংশিক জবাব ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। উভয় মেরুতে **বরফ, শক্ত মাটি, কঠিন শিলা-পাথরের ক্রাস্ট** ইত্যাদি মঙ্গলের বস্তু। গ্রহটির গড় ঘনাঙ্ক পৃথিবীর তুলনায় **৩০% কম**। যেখানে পৃথিবীর ঘনাঙ্ক হলো **৫.৫২ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার,** সেখানে মঙ্গলের মাত্রা **৩.৯৪ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার**। মহাকাশযানের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলের লৌহসর্বস্ব কেন্দ্র এবং মেন্টল বেশ ছোট্ট আয়তনবিশিষ্ট। ফলে গ্রহের মহাকর্ষের শক্তিও অনেকটা কম। তবে মঙ্গলের ক্রাস্ট (বাইরের স্তর) পৃথিবীর তুলনায় অনেকটা গাঢ়। **তারসিস বাল্‌জ** নামক আগ্নেয়গিরিতে সক্রিয় উত্তর-গোলার্ধে একটি অঞ্চল আছে। এখানকার ক্রাস্টের গাঢ়ত্ব **১৩০ কিমি (৮০ মাইল)** পর্যন্ত গভীর। অপরদিকে আমেরিকান মহাকাশযান **ভাইকিং-২** এর অবতরণস্থলে ক্রাস্টের গাঢ়ত্ব মাত্র **১৫ কিমি (৯ মাইল) এর** বেশী নয়। এতে বুঝা যায় বাইরের স্তরে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

মঙ্গলের কেন্দ্র বা কৌর মূলত পৃথিবীর কৌরের মতোই। এর প্রধান উপাদান লৌহ ও নিকেল। আরো আছে সালফার। পৃথিবীর কৌরের বস্তু তরল অবস্থায় বিদ্যমান। এই তরল কৌরের মধ্যে বস্তুর গতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর **ম্যাগনেটিক ফিল্ড**। মঙ্গলের **ম্যাগনেটিক ফিল্ড** নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানীরা এ থেকে ধারণা করেন, মঙ্গলের কৌর তরল নয়- শক্ত।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে সবকিছু বুঝতে সহজ হয়। **'প্লেট টেকটোনিক'** নামক থিওরী থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বাইরের স্তর বা ক্রাস্টে কয়েকটি বড় অংশ বিদ্যমান। এগুলো চলন্ত।



এদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধে। ফলে আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবীর বিভিন্ন চিহ্নিত অঞ্চলে ভূমিকম্পসহ ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া। মঙ্গলে অনুরূপ কোন ক্রিয়া এখন হচ্ছে না। অতীতে হয়ে থাকলে তা আমরা জানি না। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, মঙ্গল সম্ভবত **'এক প্লেইটের গ্রহ'** হবে। অর্থাৎ মূল থেকেই এর ক্রাস্ট পৃথিবীর মতো একাধিক অংশের তৈরী নয়। তবে অভ্যন্তরে অতীতে প্রচণ্ড তাপমাত্রা ছিলো। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই মঙ্গলের উপরে বেশ ক'টি বিরাট আকার ও আয়তনের **'আগ্নেয়গিরির তৈরী'** পাহাড় থেকে।

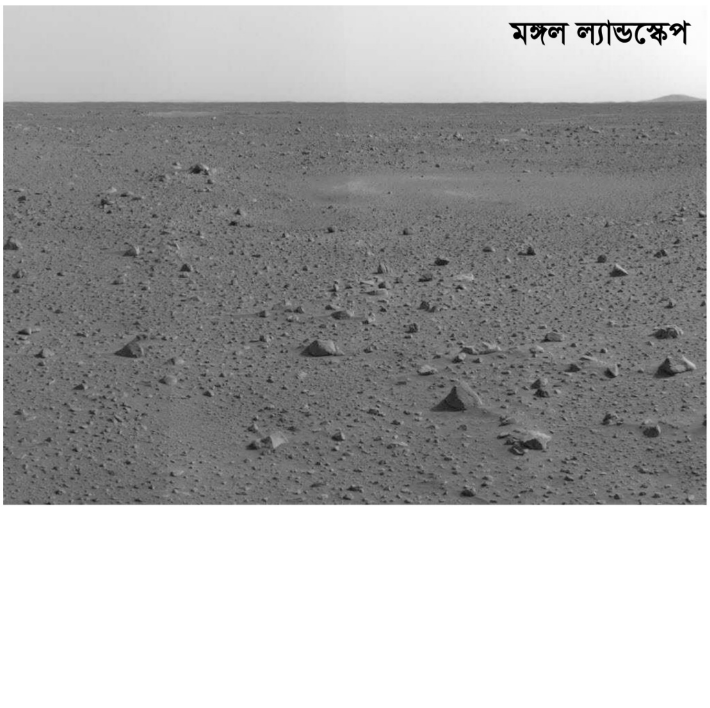
মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ

মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ কিরূপ? বৃক্ষ-তরু-লতাহীন, শুষ্ক মরুভূমিসদৃশ লালচে মাটি দ্বারা পুরো গ্রহটি আবৃত। এই মহা-মহা মরুভূমিতে আপনার-আমার বসবাস কিন্তু খুব একটা আনন্দদায়ক হবে না। তবে- প্রাণশূন্য মরুভূমি হলেও সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র এই গ্রহের মাটিই অনেকটা পৃথিবীর কিছু অঞ্চলের মাটির মতো। কিন্তু তাপমাত্রা একটি বড় সমস্যা। সূর্য থেকে বিরাট দূরত্ব থাকায় কোনমতে **-৫৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-৬৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট)** পর্যন্ত উষ্ণ হয় মঙ্গলের উপর। **'উষ্ণ'** ঠিক নয়- অনেকটা পৃথিবীর উভয় মেরুর ভীষণ ঠাণ্ডা অঞ্চলের মতো। লক্ষ্য রাখবেন তাপমাত্রার পূর্বে **'মাইনাস'** চিহ্ন। এই ভীষণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা কিছুই নয়। কোন কোন অঞ্চলে তাপমাত্রা নেমে **-১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে** যেয়ে পৌঁছে।

মঙ্গলের উপর বেশ আকর্ষণীয় কিছু অঞ্চল আছে। এর মধ্যে অত্যন্ত স্বতন্ত্র দু'টি গোলার্ধ; তারসিস-বাল্জ নামক এক বিরাট স্ফীত উঁচু এলাকা, যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট পাহাড় ও গর্ত; অতীতে পানির গতি থেকে সৃষ্ট অসংখ্য **'চ্যানেল'** বা নদী-নালা; এবং উভয় মেরুতে সংরক্ষিত শক্ত বরফের **'টুপি'** ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক মঙ্গল-বৈশিষ্ট্য।

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গোলার্ধদ্বয়

মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে বিদ্যমান আলাদা বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ গোলার্ধে অসংখ্য পতন-গর্ত (ইম্পেক্ট-ক্রেটার) বিদ্যমান। বিপরীত গোলার্ধের তুলনায় এখানকার জমিন অনেকটা উঁচু। এই অঞ্চলটি অনেকটা আমাদের চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের মতো। এই গোলার্ধে **'হেলাস প্লানিশিয়া'** নামক এক বিরাট পতন-অববাহিকা (ইম্পেক্ট-বেসিন) আছে। দূর অতীতে বেশ বড় একটি এ্যাস্টারোইড এখানে পতিত হয়ে এই অববাহিকা সৃষ্টি করেছে। অববাহিকার গভীরত্ব ৬ কিলোমিটার **(৩.৮ মাইল) এবং ব্যাস ২,০০০ কিমি (১২৫০ মাইল)**। মঙ্গলে এটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গভীরতম ইম্পেক্ট-বেসিন। চন্দ্রসদৃশ এই দক্ষিণ গোলার্ধে আরো হাজার হাজার ছোট-বড় পতন-গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গভীর-অগভীর অববাহিকা।



মঙ্গল ল্যান্ডস্কেপ

অপরদিকে উত্তর গোলার্ধের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে আছে বিরাট বিরাট আকর্ষণীয় ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। বড় আকারের আগ্নেয়গিরি, এক বিরাট ফাটল-উপত্যকা এবং কয়েক ধরনের নালা। উত্তর গোলার্ধে আরো আছে সমতল মরুভূমিসদৃশ খুব বড় বড় অঞ্চল। মঙ্গলের নিকট-মহাকাশে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের গবেষণা **'রাডার'** ও ছবি দ্বারা করেছে। উত্তর গোলার্ধের এসব ম্যাপিং থেকে জানা গেছে, ভূপৃষ্ঠের সমতল ভূমির নীচে অনেক পতন-গর্ত বিদ্যমান। এগুলো পরে ভরে গেছে। এখনো গবেষণা হচ্ছে- কেন উভয় গোলার্ধের মধ্যে এই পার্থক্য তা বুঝার জন্য? নিঃসন্দেহে অচিরেই আমরা মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কে আমরা আরো জানবো।

তারসিস স্ফীত অংশ ও অলিম্পাস মন্‌স

সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আগ্নেয়গিরির নাম **'অলিম্পাস মন্‌স'**। মঙ্গলের উপর একটি বিরাট স্ফীত অঞ্চল আছে। একে বলে **'তারসিস বাল্‌জ'**। পুরো এলাকা চতুর্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি থেকে **১০ কিমি (৬ মাইল) উঁচু** এবং এর প্রশস্ততা **৪,০০০ কিমি (২৪৮৬ মাইল)** পর্যন্ত বিস্তৃত। স্ফীত এই ভূ-অঞ্চলের সর্বত্র বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরি ও উপত্যকা বিদ্যমান। উপরে উল্লেখিত আগ্নেয়গিরি **'অলিম্পাস মন্‌স'** এই তারসিস-স্ফীত অঞ্চলেই অবস্থিত। নীচের চিত্রটি দেখুন।

অলিম্পাস মনস **২১ কিমি (১৩ মাইল) উঁচু!** আমাদের পৃথিবীর উপর সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট। তার উচ্চতা **২৯ হাজার ২৯ ফুট**। অলিম্পাস মনস এই এভারেস্ট থেকেও অনেক উঁচু। কারণ **১৩ মাইল = ৬৮,৬৪০ ফুট!** অর্থাৎ দ্বিগুণ থেকে অনেক বেশী। অলিম্পাস মনসের অতি নিকটে আরো তিনটি আগ্নেয়গিরি আছে। এগুলোও প্রায় একই উচ্চতা ও বিরাট আয়তনের। এদের নামকরণ করা হয়েছে: **'আরসিয়া মনস', 'পাভোনিস মনস'** এবং **'আসক্রিয়াস মনস'**। একমাত্র আল্লাহ মা'লুম এসব নামের অর্থ কি! এগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে এক বিশেষ রেখায় অবস্থিত। তারসিস অঞ্চলের এই চারটি আগ্নেয়গিরি হচ্ছে অত্র অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ভূ-বৈশিষ্ট্য।


সৌরজগতের সর্ববৃহৎ আগ্নেয়গিরি 'অলিম্পাস মন্‌স'

তারসিস অঞ্চলে **'আলবা পাটেরা'** নামক আরেক আগ্নেয়গিরি আছে। এটি অন্যদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। তার উচ্চতা **৬ কিমি (৪ মাইল)** ও ব্যাস **১,৬০০ কিমি (১,০০০ মাইল)**। বর্ণিত কোন আগ্নেয়গিরিই বর্তমানে সক্রিয় নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা এগুলো ১০ থেকে ৩৫ কোটি বৎসর অতীতে সক্রিয় ছিলো। কোন কোন আগ্নেয়গিরি মাত্র ২০ লক্ষ বৎসর পূর্বেও শ্বাস-নিশ্বাস

নিয়েছে বলে কেউ কেউ বলেছেন। যাক, এসব ব্যাপার সুদূর অতীতের। আমাদের মূল আকর্ষণ বর্তমানের দিকে।


মঙ্গলের পানিসৃষ্ট একটি চ্যানেল

ভালিস মারিনারিস (মারিনার উপত্যকা)

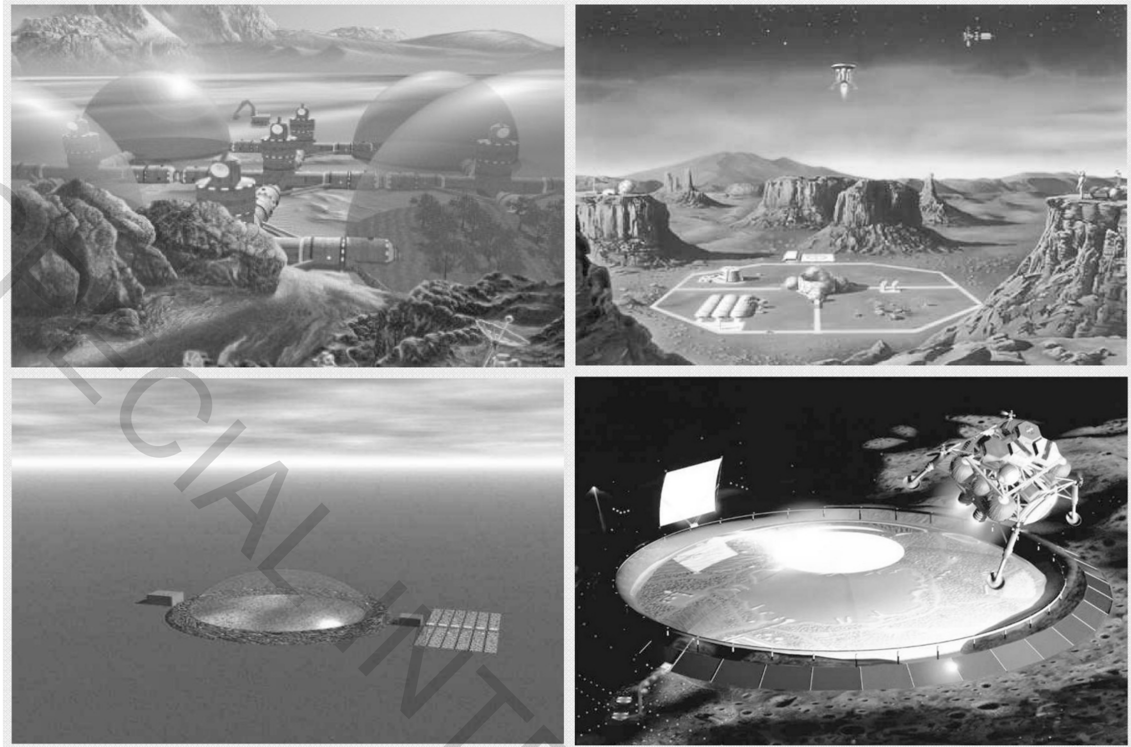
উপরে বর্ণিত **'তারসিস-স্ফীত'** অঞ্চলে আরেক চিত্তাকর্ষক মঙ্গল-ভূবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এটা এক দীর্ঘ উপত্যকা। আমেরিকার মঙ্গল মহাকাশযান 'মারিনার' এটির আবিষ্কারক- তাই কৃত্রিম এই উপগ্রহের নামেই এর নামকরণ হয়েছে। এই বিরাট উপত্যকা ও অববাহিকা তারসিস অঞ্চল থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মঙ্গলের পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছেছে। দৈর্ঘ্যে এটি **৪ হাজার কিমি (২৫০০ মাইল)** হবে- যা গ্রহের পূরো পরিধিরেখার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দীর্ঘ উপত্যকার প্রশস্ততা কোন কোন অঞ্চলে **২০০ কিমি (১২০ মাইল)** পর্যন্ত বিস্তৃত। তার গভীরত্বও কম না- সর্বোচ্চ গভীরতা **৭ কিমি (৪ মাইল)** পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পৃথিবীর বুকে আমেরিকার **'গ্রান্ড ক্যানিওন'** থেকেও এটা অনেক বড়। এর তুলনায় ভালিস মারিনারিসের দৈর্ঘ্য নয় গুণ, প্রস্থ ৭ গুণ এবং গভীর চার গুণ বেশী।

মঙ্গলের পানিসৃষ্ট শুষ্ক নদী-নালা

মঙ্গল গ্রহে অতীতে ভূপৃষ্ঠে পানি ছিলো। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। নিকট মহাকাশ থেকে প্রেরিত ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুই ধরনের নদীনালা বিদ্যমান। প্রথমটি হলো উপত্যকা নেটওয়ার্ক এবং দ্বিতীয়টি বাইরের দিকে প্রবহমান নালা। অতীতে তরল পানির স্রোত থেকে এ উভয় প্রকার নদী-নালা সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দেখতে তা-ই লাগে।

উপরে বর্ণিত প্রথমোক্ত **'উপত্যকা-নেটওয়ার্ক'** পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট জলধারার মতো। এগুলো মঙ্গলের দক্ষিণ উর্ধ্ব এলাকায় অবস্থিত। ধারণা করা হয় মঙ্গলের অতীত ইতিহাসে বায়ুমণ্ডল অনেকটা গাঢ় ছিলো। তরল অবস্থায় তখন পানি ভূপৃষ্ঠে প্রবহমান হতো। **মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার উপগ্রহ** থেকে নেওয়া উচ্চ-রেজুলুশনের ছবি থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, অতীতে হয়তো মঙ্গলে বৃষ্টিপাতও হয়েছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এখনো মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের গভীরে পানি থাকতে পারে। আর তা-ই


সন্ধ্যার আলোয় 'ভালিস মারিনারিস'



দূর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহের উপর 'মানব কলোনি তৈরীর' কয়েকটি প্রেরণাদীপ্ত ভাব।

যদি হয় তাহলে সুদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলের উপর **মানব-কলোনি** (উপনিবেশ) হয়তো অনেকটা সম্ভাব্য হবে।

আউটফ্লো চ্যানেল বা বাইরের দিকে প্রবহমান নদীনালা সাধারণত বিরাট বিরাট বন্যা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মঙ্গলের দক্ষিণ ও উত্তর উচ্চভূমির সীমান্তে এবং উত্তর সমতল ভূমিতে এসব চ্যানেল দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালে নাসা'র **মার্স পাথফাইন্ডার মহাকাশযান 'আরেস ভালিস'** নামক স্থানে অবতরণ করে। এই অঞ্চলটিও উক্ত অউটফ্লো চ্যানেলের অংশ।

বরফাবৃত মেরুদ্বয়



মঙ্গলগামী মানব-মিশনের একটি কল্পিত চিত্র

আগেই বলেছি, মঙ্গলের উভয় মেরুয় পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ মেরুর মতো বিরাট এলাকা জুড়ে বরফের টুপি বিদ্যমান। ভাইকিং নামক মহাকাশযান মঙ্গলের হাজার হাজার ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। উভয় মেরুর ছবিও এদের মধ্যে অন্যতম। আমরা নিম্নে কয়েকটি ছবি সন্নিবেশিত করেছি।

উভয় মেরুর বরফ-টুপির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। দক্ষিণ মেরুর বরফ-

টুপি অন্তত **১ হাজার কিলোমিটার (৬২০ মাইল)** ব্যাসবিশিষ্ট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মৌলিকভাবে এটি পানি থেকে সৃষ্ট বরফ। তবে এই স্থায়ী বরফ-টুপিতে ঋতুর পরিবর্তনে কিছু হিমায়িত **কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস**ও এসে মিশ্রিত হয়। উত্তরমেরুর উপরস্থ বরফ-টুপিও স্থায়ী। তবে এটি আয়তনে অরপটির তুলনায় ছোট্ট, এক-তৃতীয়াংশ হবে। দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরুতে মঙ্গল-গ্রীষ্মকাল অনেকটা উষ্ণতর। এ কারণেই মেরুর উপরস্থ বরফ-টুপির আয়তন কম।



মার্স অডিসি অরবিটার মেরু অঞ্চলের উপরে

মার্স এক্সপ্রেস নামক মহাকাশযান রাডার দ্বারা পরীক্ষা করেছে উভয় মেরু। উত্তর মেরুর গভীরে পানির তৈরী বরফের সন্ধান মিলেছে এই রাডার গবেষণা থেকে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখন যদি মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যায় তাহলে পুরো গ্রহ অন্তত **১১ মিটার (৩৬ ফুট)** পানির নীচে নিমজ্জিত হবে!

সম্প্রতি **মার্স অডিসি প্রদক্ষিণযান** থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা বুঝা গেছে, মঙ্গলের মধ্য-অক্ষাংশে মাটির নীচে বড় বড় পানির তৈরী বরফ লেক বিদ্যমান। কোন কোন স্থানে উর্ধ্বে অর্ধেক পরিমাণ উপরস্থ স্তরের মাটিতে বরফ আছে। যাক, মঙ্গলের অভ্যন্তরে ও উভয় মেরুতে বরফাকারেও পানি থাকাটা খুব আশাব্যঞ্জক বৈকি। এতে বুঝা যায়, এই গ্রহ হয়তো দূর-ভবিষ্যতে মানুষ বসবাসের উপযোগী হবে। আর মানুষকে বেঁচে থাকার প্রধান উপদাই হলো পনি। এজন্যই বলে, পানির অপর নাম জীবন।

বায়ুমণ্ডল

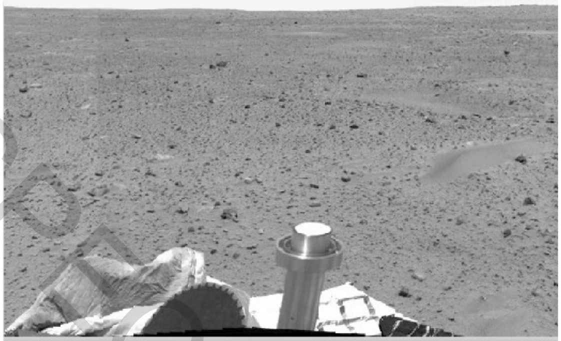
যে কোন এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তুর বায়ুমণ্ডল থাকাটা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। এর মধ্যে একটি হলো যথেষ্ট পরিমাণ ওজন বা ম্যাস থাকা। বায়ুমণ্ডল সৃষ্টির পর তাকে ধরে রাখার জন্য এই ম্যাস জরুরী। কারণ, ম্যাস যথেষ্ট না হলে বাতাসের মতো পাতলা বস্তুকে আটকে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত মহাকর্ষ সৃষ্টি হবে না। মঙ্গলের ওজন যথেষ্ট। সুতরাং একটি অপেক্ষাকৃত পাতলা হলেও, বায়ুমণ্ডল সে ধরে রাখতে পেরেছে।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে আছে ৯৫% **কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস**। আরো আছে ৩% **নাইট্রোজেন,** প্রায় ২ পার্সেন্ট **আরগন** এবং অতি ক্ষুদ্রাংশ পরিমাণ **অক্সিজেন, কার্বন মনোক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অজোন** এবং **অন্যান্য গ্যাস**। বায়ুমণ্ডলের চাপ ঋতুর সঙ্গে রদবদল হয়। মেপে দেখা গেছে এই পার্থক্য ৬ থেকে ১০ মিলিবার (**মিলিবার:** চাপ মাপার ইউনিট) পর্যন্ত হয়ে থাকে। চাপ অবশ্য উচ্চতার সঙ্গেও বেশ-কম হয়। যেমন অলিম্পাস মন্সের উপর হেলাস প্লানিশিয়া নামক সমতল ভূমির তুলনায় চাপ প্রায় ১০ গুণ কম।



মঙ্গলের পাতলা বায়ুমণ্ডল

স্পিরিট অব অপোরটিউনিটি থেকে মঙ্গলদৃশ্য



মঙ্গলে বায়ুমণ্ডলে মেঘমালা বিদ্যমান। পৃথিবীকেন্দ্রিক টেলিস্কোপ ও নিকট মহাকাশযান থেকে এই মেঘমালা সৃষ্টি ও ক্ষয়ের উপর গবেষণা হয়েছে। তরঙ্গ-মেঘ, ঘূর্ণবাত মেঘ ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের মেঘমালা দেখা গেছে। এছাড়া আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট পর্বতমালার উপর মেঘ ও শিশিরের মতো মেঘমালাও বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল মোটামুটি সক্রিয়।

মঙ্গলের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কিরূপ? আমরা সেলেস্টিয়ার সুবাদে এই উভয় দৃশ্য দেখতে পারি। তবে তা ১০০% সঠিক নয়। নীচে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ছবি তুলে ধরেছি। তবে মঙ্গলে অবতরণ করেছে এমন এক দু'টো **'রোবার'** থেকেও আমরা বাস্তব ছবি পেয়েছি।

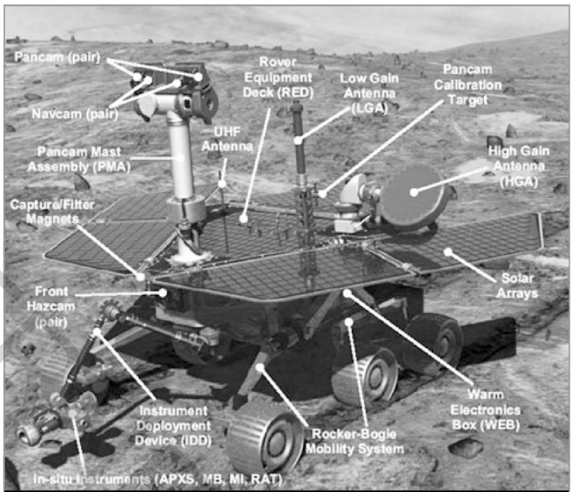


মঙ্গলিয়ান সূর্যাস্ত

এই উভয় দৃশ্যের ছবি পৃথিবীর মানুষ দেখেছেন। আপনি যদি তা দেখে না থাকেন তাহলে এই তো চান্স! নীচে (পৃষ্ঠার কোণে) চিত্রিত বাস্তব মঙ্গল-সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে নিন।

আধুনিক যুগে মঙ্গল মিশন

আমরা ইতোমধ্যে মঙ্গল গ্রহের প্রতি বিজ্ঞানীদের বিশেষ আকর্ষণের উপর আলোচনা করেছি। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরুর যুগ বেশি পুরাতন নয়-



'মঙ্গলযান' (mars rover): নাসা'র স্পিরিট এন্ড অপোরটিউনিটি 'মঙ্গলযান' এবং তার বিভিন্ন যান্ত্রাংশের নাম। (এনকার্টা ইন.)

বলতে হবে এখনও শুরুর পর্যায়ে আমরা অবস্থান করছি। তবে এই শুরু থেকেই আমেরিকার নাসা মহাকাশ অনুসন্ধান এজেন্সি মঙ্গল গ্রহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

মঙ্গল গ্রহে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ চাট্টিখানি কথা হয়। সে-ই ১৯৬০ এর দশক থেকেই এই চেষ্টা চলছে। অনেক চড়াই-উৎরাই এবং ব্যর্থতার পর অবশেষে বেশ ক'টি সফল মঙ্গল মিশন হয়েছে। এ থেকে আমরা পৃথিবীর এই লাল পড়শী গ্রহটি সম্পর্কে অসংখ্য ব্যাপার অবগত হয়েছি। প্রাথমিক

দিনগুলোতে নাসা **'মারিনার'** ও **'ভাইকিং'** নামকরণে দু'টি মিশন মঙ্গলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে কিছু সফলতা অর্জিত হয়। এরপর আর্থিক কারণে নাসা মঙ্গল মিশন বেশ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখে। **১৯৯০** দশকের শুরুতে আবার মিশন চালু হয় এবং তা এই একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অব্যাহত আছে।



মহাকাশযান মারিনার



মঙ্গলের উপর ভাইকিং ল্যান্ডার

মারিনার মিশন

১৯৬৪ সালে **মারিনার-৩** ও **৪** নামক দু'টি কৃত্রিম উপগ্রহ সর্বপ্রথম লাল গ্রহের দিকে প্রেরিত হয়। তবে **মারিনার-৩** সফল হয় নি। **মারিনার-৪** মঙ্গলের নিকট-মহাকাশে যেয়ে পৌঁছে **১৯৬৫** সালে। এই ক্রাফট্‌টি সর্বপ্রথম গ্রহের নিকটে থেকে কিছু ছবি প্রেরণ করে। এসব ছবি ছিলো মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের। মানুষ ভাবছিলো, মঙ্গল থেকে প্রাপ্ত ছবি সেখানকার কল্পিত **'অতিবুদ্ধিমান সভ্যতার'** প্রমাণ দেখাবে! কিন্তু তাতো ছিলো না? ছবিতে শুধুমাত্র পতন-গর্ত দেখাচ্ছিলো। এমনকি পৃথিবীর মতো কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যই এসব ছবিতে প্রকাশ পায় নি। এরপর **১৯৬৭** সালে **মারিনার-৬** ও **৭** মঙ্গলের কাছঘেষে উড়ে যায়। উভয় ক্রাফ্‌ট মঙ্গল গ্রহের আরো বেশ কিছু ছবিসহ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রেরণ করে। বিশেষ করে গ্রহের **মাধ্যাকর্ষণ**, বায়ুমণ্ডলের



মারিনার-৬ থেকে প্রাপ্ত মঙ্গলপৃষ্ঠের ছবি

বস্তুর স্বরূপ ও মাত্রা ইত্যাদি তথ্য পাঠিয়ে দেয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য। কিন্তু এরপরও গ্রহের আসল চেহারা আমাদের নিকট অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে যায়।

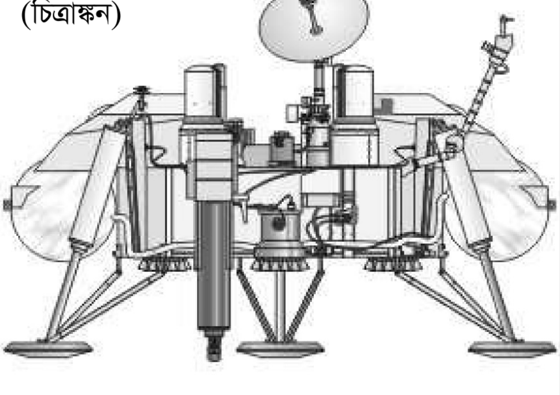
মারিনার মিশন তখনো শেষ হয় নি। **১৯৭১** সালে **মারিনার-৯** মিশন প্রেরিত হয়। এটাই ছিলো প্রথম মহাকাশযান যেটি লাল গ্রহকে **'প্রদক্ষিণ'** করতে সক্ষম হয়। ফলে মঙ্গলের বিরাট বিরাট **আগ্নেয়গিরি, ফাটল, নদী-নালা** ইত্যাদি আকর্ষণীয় ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু বিধি বাম, মঙ্গলের উপর এক প্রচণ্ড ঝড়-তুফান শুরু হয় **১৯৭১** সালে। ফলে **মারিনার-৯** এর মিশন

আংশিকভাবে সফল হলো মাত্র। এরপরও **মারিনার-৯** এটাই আমাদেরকে জানালো, মঙ্গল গ্রহ অনেকটা পৃথিবীর মতোই। চন্দ্রের মতো বায়ুমণ্ডলহীন মৃত গ্রহ নয়।

ভাইকিং মিশন

এরপর **১৯৭৫** সালে নাসা একটি **'উচ্চাকাঙ্ক্ষী'** মিশন মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করে। এই মিশনের মূল অংশ হিসাবে ছিলো **ভাইকিং-১** ও **ভাইকিং-২** নামক দু'টি উন্নতমানের ডিজাইনের মহাকাশযান। সফল এই মিশন থেকে গ্রহের অসংখ্য উচ্চ মানের ছবি পৃথিবীর মানুষ দেখতে পান। গ্রহকে প্রদক্ষিণ করার জন্য ভাইকিং **'প্রোব'** (মূল মহাকাশযান থেকে প্রেরিত আরেক ছোট্ট মহাকাশযান) ছিলো। এই প্রোব পুরো গ্রহের ম্যাপ তৈরী করে। এছাড়া গ্রহের উপর অবতরণের জন্য ছিলো **'ল্যান্ডার'** (অবতরণযান)। ফলে অন্য একটি গ্রহে কৃত্রিম মহাকাশযান সর্বপ্রথম সফলভাবে অবতরণ করে। অবতরণযান গ্রহের মাটি, ও বায়ুমণ্ডলের পদার্থ সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়ে আমাদেরকে তথ্য দেয়। বিশেষ পরীক্ষা-যন্ত্র দ্বারা মাটির মধ্যে কোন ধরনের **'প্রাণী'** আছে কি না তা-ও নির্ণয় করার চেষ্টা চালায়। তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত মিলে নি। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের যেসব ছবি ভাইকিং অবতরণযান প্রেরণ করে তা দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোন শুষ্ক মরুভূমির ছবি হবে- কিন্তু মাটির রং অনেক বেশী লাল।

ভাইকিং ল্যান্ডার
(চিত্রাঙ্কন)



মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার মহাকাশযান

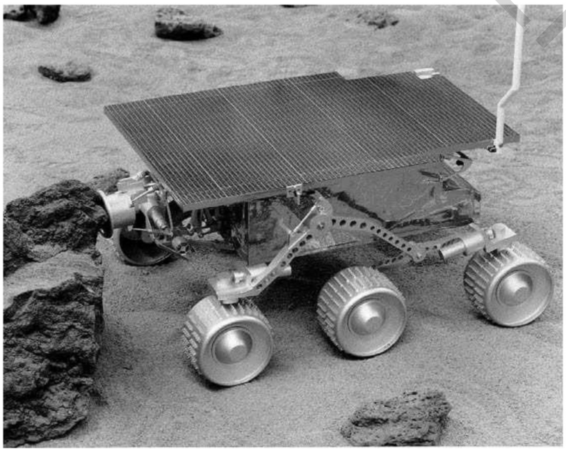


সূত্র: নাসা

এরপর চলে যায় দীর্ঘ **১৭** বৎসরের রেস্ট। **১৯৯২** সালে নাসা মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থা প্রেরণ করে **'মার্স অবজারভার'** মিশন। কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছার মাত্র তিন দিন পূর্বে অবজারভার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পরবর্তীতে **'মার্স গ্লোবেল সার্ভেয়ার'** নামক একটি মিশন প্রেরণ করে নাসা **১৯৯৬** সালে। এই ক্রাফ্‌ট সফলভাবে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ শুরু করে **১৯৯৭** সালে। **এমজিএস** (সার্ভেয়ার মিশনের সংক্ষেপ) মিশন ২০০৬ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলো। এসময় হঠাৎ প্রদক্ষিণরত এই ক্রাফটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে ইতোমধ্যে এমজিএস যেসব তথ্য প্রেরণ করে তার উপর গবেষণা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় পর্যন্তও বিজ্ঞানীরা এমজিএস প্রেরিত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন।

মার্স পাথফাইন্ডার মিশন

১৯৯৭ সালে **মার্স পাথফাইন্ডার** মহাকাশযান সফলভাবে মঙ্গলের উপর অবতরণ করে। এটি ছিলো তৃতীয় সফল অবতরণ-মিশন। পাথফাইন্ডার একটি অবতরণযান ও চলমানযান (রোবার) সাথে নিয়ে যায়। **সোজর্নার** নামক রোবার **'মাইক্রওয়েভ অভেন'** এর মতো আয়তনবিশিষ্ট একটি যান। এটি অবতরণযান থেকে বের হয়ে মঙ্গলের উপর চলন্ত হয়। দৈনিক সে কয়েক মিটার মাত্র চলতো। অবতরণযানের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সে ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এছাড়া তার **অন-বোর্ড** যন্ত্রাদি দ্বারা মঙ্গলের মাটি ও বায়ুমণ্ডলের বস্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে ফলাফল আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। দীর্ঘ **৮৩ মঙ্গল-দিবস** যাবৎ পাথফাইন্ডার মিশন সফলভাবে তার কাজ চালিয়ে যায়। নীচে সোজর্নারের একটি ছবি দেখুন।

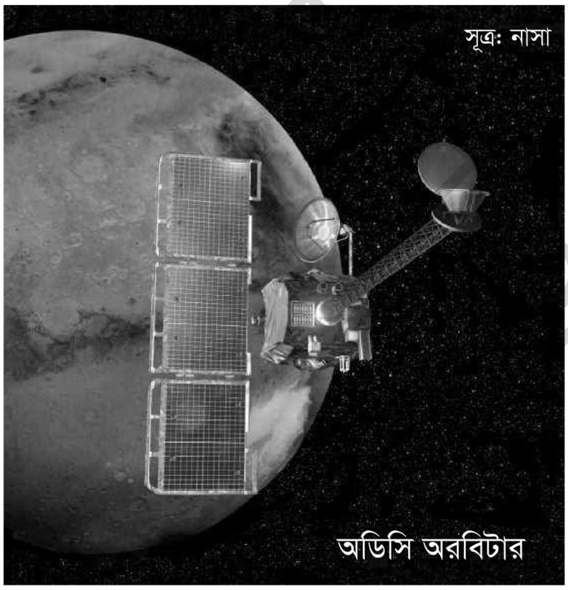


পাথফাইন্ডার মিশন সফল হওয়ার পর নাসা আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মিশন মঙ্গলে প্রেরণ করে। কিন্তু উভয়টি ব্যর্থ হয়। প্রথমটি ছিলো **'মার্স ক্লাইমেট অরবিটার'** এবং দ্বিতীয়টি **'মার্স পোলার ল্যান্ডার'** মিশন। প্রথম মহাকাশযান পৃথিবী থেকে উড্ডয়ন করে **১৯৯৮** সালে। দ্বিতীয়টি ভ্রমণ শুরু করে **১৯৯৯** ঈসায়ী সনে। ক্লাইমেট অরবিটার **১৯৯৯** সালে মঙ্গলে যেয়ে পৌঁছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে **ক্রাশ-ল্যান্ডিং** করে ধ্বংস হয়ে যায়। ক্রাফটের **'ন্যাভিগেশন্যাল এ্যারোর'** এর জন্য দায়ী করা হয়। কথা ছিলো প্রদক্ষিণ করার কিন্তু মাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে প্রেরিত এই উন্নতমানের ক্রাফট্‌টি। যাক, পরে দ্বিতীয় মিশনও একই পরিণতির শিকার হয়। উভয় মিশন এভাবে ব্যর্থ হওয়ার কারণ বের করতে নাসা তদন্ত শুরু করে।

মার্স অডিসি মিশন

উপরোক্ত মিশনদ্বয় ব্যর্থ হওয়ার পর নাসা কর্তৃক প্রেরিত **'মার্স অডিসি'** মহাকাশযান **২০০১** সালের শেষের দিকে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করে। পুরো গ্রহকে এই ক্রাফ্‌ট সফলভাবে ম্যাপিং করে। সে তার কাজ ২০০২ সালের শুরুতে আরম্ভ করে এবং এমজিএম মিশন থেকেও আরো সূক্ষ্ম গবেষণা চালায়। এই মিশন থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের নীচে পানি জমা আছে।

এরপর আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

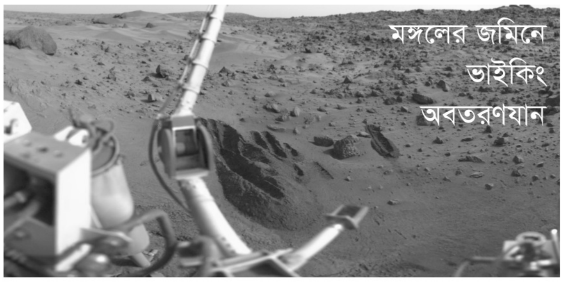


অডিসি অরবিটার

নাসা **'মার্স রিকোনাইসেন্স অরবিটার'** (আগষ্ট ২০০৫) ও **'মার্স এক্সপ্লোরেশন রোবার'** (জুন ২০০৩) মিশন প্রেরণ করে। উভয় মিশনই সফল হয়েছে। প্রথমটি প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বায়ুমণ্ডলের উপর গবেষণা এবং পরবর্তী মিশনের অবতরণযানের জন্য উপযোগী অবতরণস্থল নির্ণয় করা। সফল এই মিশন থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মঙ্গলের উপর অনেক তথ্য বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন।

উপরোক্ত দ্বিতীয় মিশনটি ছিলো আরো আকর্ষণীয়। এতে **'স্পিরিট'** ও **'অপরচ্যুনিটি'** নামক দু'টি ক্রাফ্‌ট সক্রিয় ছিলো। **স্পিরিট** ২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারী মঙ্গলের উপর নিরাপদে অবতরণ করে। গুসেভ নামক একটি পতন-গর্ত ছিলো তার অবতরণস্থল। এই চলমানযান ১৫ জানুয়ারী ২০০৪ সালে তার কাজ শুরু করে। **অপরচ্যুনিটি** অবতরণযান ২৪ জানুয়ারী ২০০৪ সালে নিরাপদে মঙ্গলের আরেক গভীর গর্তে অবতরণ করে। ৩১ জানুয়ারী থেকে সে কাজে যোগ দেয়।

প্রায় একই ডিজাইনের উক্ত মঙ্গল-চলমানযান দু'টি আগে প্রেরিত **পাথফাইন্ডার মিশনের সোজর্ন চলমানযান** থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ও অনেক উন্নতমানের। **স্পিরিট** ও **অপরচ্যুনিটি** দীর্ঘপথ ভ্রমণের ক্ষমতা রাখে। উভয় যানে নিজস্ব অন-বোর্ড টেলিযোগাযোগ যন্ত্র আছে। তারা প্রাপ্ত তথ্যাদি পৃথিবীতে সরাসরি প্রেরণ করতে সক্ষম। আগের যান প্রথমে ডাটা **মাদার-অবতরণযানে** প্রেরণ করতো। তারপর সেটি থেকে আমরা তা প্রাপ্ত হতাম। উভয় **এক্সপ্লোরার চলমানযান** ২৬ সেন্টিমিটার উঁচু পাথরের উপর দিয়েও তাদের ছ'টি পা দ্বারা হোচট না খেয়ে চলতে সক্ষম। তারা ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত কাত হয়ে চলতে জানে- পড়ে যায় না। সম্ভবত এরূপ উন্নতমানের **'হাই-টেক'** কোন **'রোবট'** আজ পর্যন্ত তৈরী হয় নি।

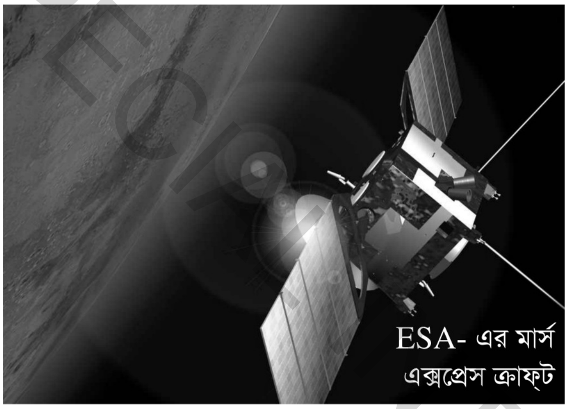

মঙ্গলের জমিনে ভাইকিং অবতরণযান

৯০ মঙ্গল-দিবস পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো স্পিরিট ও অপরচ্যুনিটি রোবার দু'টির কার্যকাল। কিন্তু তারা দীর্ঘ ১,০০০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সফলভাবে। এরপর এক দু'টো সফটওয়ার ও মেকানিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়। এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় তাদের কর্মের ইতি ঘটে। উভয় যান থেকে অসংখ্য তথ্য পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। এসব ডাটা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের খোরাকে পরিণত হয়েছে।

আমেরিকার **'নাসা'** মঙ্গল গ্রহে অধিকাংশ মিশন প্রেরণ করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য দেশ- বিশেষ করে রাশিয়াও এই গবেষণা থেকে গাফিল নয়। **১৯৬০** থেকে **১৯৭১** সাল পর্যন্ত তখনকার **ইউএসএসআর ১২**টি মহাকাশযান মঙ্গলে প্রেরণ করে। এরপর **১৯৭৩** সালে **মার্স-৪** থেকে **মার্স-৬** এ তিনটি যান তাদের মিশন সফল করে। এর দীর্ঘদিন পর **১৯৮৮** সালে **ফবোস মিশন** মঙ্গলের দিকে প্রেরিত হয়। নাম থেকেই বুঝা যায়- এই মিশনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিলো **ফবোস** নামক মঙ্গলের চাঁদের উপর গবেষণা চালনা। **ফবোস-১** আন্তঃগ্রহ মহাকাশে হারিয়ে যায়। কিন্তু **ফবোস-২** সফলভাবে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে এবং ডাটা পাঠিয়ে দেয়।

ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি (ইএসএ) এবং জাপানও মঙ্গল অনুসন্ধানে শরীক হয়েছে। তারা হয় নিজেদের তত্ত্বাবধানে মহাকাশযান প্রেরণ করেছে, না হয় আমেরিকা ও রাশিয়ান মঙ্গল

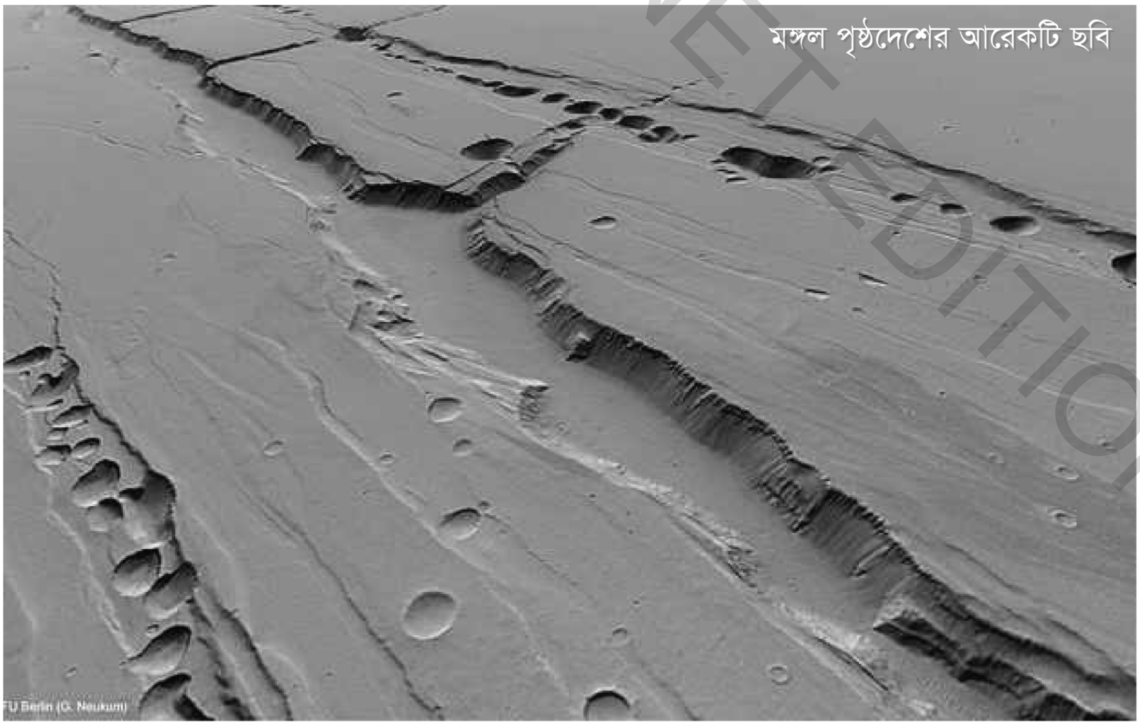
মিশনে যন্ত্রাদি বানিয়ে সহযোগিতা করেছে। **ইএসএ** প্রেরিত **'মার্স এক্সপ্রেস'** নামক একটি মহাকাশযান ২০০৩ সালে জুন মাসে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ শুরু করে। কিন্তু **'বিগল-২'** নামক একটি **প্রোব** মার্স এক্সপ্রেস থেকে আলাদা হয়ে অবতরণের সময় হারিয়ে যায়।



ESA- এর মার্স এক্সপ্রেস ক্রাফ্‌ট

জাপান একাধিক মহাকাশযান মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করেছে কিন্তু এখনো সফল হয় নি। **'নাযোমি'** নামক একটি ক্রাফ্‌ট জুলাই **১৯৯৮** সালে উড্ডয়ন করে। প্রথমে এটা সফলভাবে পূর্বপরিকল্পনা মুতাবিক সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ২০০৩ সালে এটি মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথহারা হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টার পর একে সঠিক **'ট্রাজেকটরি'**-তে নিয়ে আসা যায় নি। বিজ্ঞানীরা শেষে হতাশ হয়ে সকল চেষ্টা ছেড়ে দেন।

প্রিয় নভোচারী ভাইবোন! মঙ্গল সম্পর্কে উপরে বর্ণিত মিশন থেকে অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলে পৃথিবী থেকে বেশ কয়েকটি স্পেইস-ক্রাফ্‌ট মিশন প্রেরিত হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভবিষ্যতে **মানব-উপনিবেশ** তৈরীর একটি সুযোগ্য গ্রহ হলো মঙ্গল। সম্ভবত অচিরেই **'মানব'** মঙ্গল মিশন প্রেরিত হবে। তবে আমরা তো এখনই সেলেস্টিয়ার সুবাদে **'কাল্পনিক'** মহাকাশযান দ্বারা শুধু মঙ্গল কেনো পুরো সৌরজগৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি! এবার আসুন, মঙ্গলের দু'টি চাঁদের উপর কিছু আলোচনা করি।



মঙ্গল পৃষ্ঠদেশের আরেকটি ছবি

মঙ্গলের দু'টি চাঁদ

বাস্তবে এগুলো সচরাচর চাঁদ নয়- দু'টি আলু! ফবোস নামক চন্দ্রটি মঙ্গলের অতি নিকটে থেকে প্রদক্ষিণ করে। সেলেস্টিয়া জানালো, এ মুহূর্তে (২ মে ২০১২, সময়: বিকেল ২:৫১ মিনিট) মঙ্গল থেকে **৫,৮৫৬ কিলোমিটার (৩,৬৩৯ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে। তার ব্যাসার্ধ **১৩ কিলোমিটার** এবং তার আহ্নিক গতি **৭.৫৬৪ ঘণ্টা**। একই গতিতে সে মঙ্গলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণও করে- অর্থাৎ তার বার্ষিক গতিও **৭.৫৬৮ দিন**। আরো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মা-গ্রহ হতে দূরত্বের দিক থেকে **সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ উপগ্রহ ফবোস**। অন্য সকল গ্রহের উপগ্রহ এটির মতো এতো কাছে নেই। এছাড়া মঙ্গলের মহাকর্ষ ফবোসকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে এই চাঁদটি প্রতি শতবৎসরে **১.৮ মিটার (৬ ফুট)** করে কাছে যাচ্ছে মঙ্গলের। সুতরাং কোন একদিন এটি হয়তো মঙ্গলের উপর পতিত হবে, না হয় ভেঙ্গে মঙ্গলের অদূর মহাকাশে রিং সৃষ্টি করবে। যাক, সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য এই ঘটনাটির উপর বেশী লিখে কাগজ নষ্ট করার দরকার নেই!



মঙ্গলের কাছে থাকায় তার মধ্যে প্রদক্ষিণ গতি খুব দ্রুত হয়েছে। সে দৈনিক তিনবার গ্রহের চতুর্দিকে চক্কর দেয়। সুতরাং আপনি যদি মঙ্গলে অবস্থান করেন তাহলে বৎসরে ফবোসকে ১,৩০০ বার মঙ্গলে ফবোস কৃত **'সূর্যগ্রহণ'** দেখতে পাবেন। চন্দ্রটি **'তারঙ্গিকভাবে তালাবদ্ধ'** আছে। এর অর্থ সে তার একটি মুখ সর্বদাই মঙ্গলের দিকে আর অপরটি সর্বদা বিপরীত দিকে লুকিয়ে রাখে। অনুরূপ তালাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের চাঁদটিও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।



আমরা ইতিমধ্যে বলেছি, এটি দেখতে আলুর মতো। এতো ছোট্ট এই **'ইরেগুলার'** (অমসৃণ) উপগ্রহের উপর একটি ১০ কিমি চওড়া **'স্টিকনি'** নামক পতন-গর্ত বিদ্যমান। সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ **'ইম্পেক্ট বস্তু'** বা পতন-বস্তুর বম্বার্ডমেন্ট থেকে অতীতে রেহাই পায় নি। কোন এক সময় যে সমগ্র সৌরজগতব্যাপী অসংখ্য শক্ত বস্তু ছুটোছুটি করেছে তা নিশ্চিত। এসব ইম্পেক্ট ক্রেটার ওসব বস্তুর পতন থেকেই সৃষ্ট।

ফবোসের পৃষ্ঠদেশ ১ মিটার গাঢ় ধূলোবালি দ্বারা আবৃত। এর প্রমাণ মিলেছে আমেরিকার মহাকাশযান **'মার্স গ্লোবাল সর্ভেয়ার ৯৬'** থেকে। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ছোট্ট আয়তন বিশিষ্ট অসংখ্য এ্যাস্টারোইড ফবোসের উপর পতিত

হয়ে এই ধূলো সৃষ্টি করেছে। অন্তত বিজ্ঞানীদের এটাই ধারণা। আসল কারণ সুস্পষ্টভাবে জানার কোন পথ কেউ জানেন না।

ইতিহাস

আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞানী **আসাফ হল**। ১৮৭৭ সালে তাঁর টেলিস্কোপে এটি ধরা দেয়। ফবোস নামের অর্থ কি তা বলার দরকার নেই। এ ব্যাপারে আপনি পাঠকের **'ধারণা'** আমার ধারণার মতোই, কিংবা আরো ভালো হবে! তবে **আসাফ হলের** স্ত্রীর বিবাহপূর্ব নামানুসারে ইতোমধ্যে ক্রেটার **'স্টিকনি'** -এর নামকরণ করা হয়েছে। এরূপ নামকরণে কোন ভেজাল নাই। সাবাস! অন্তত একজন **'বাস্তব'** মানুষের নামে কোন একটি এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তুর বৈশিষ্ট্যের নামকরণ করলেন আন্তর্জাতিক এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন! তবে এ মহিলার অবদান আছে। **আসাফ হল** মঙ্গলের চাঁদ খুঁজতে খুঁজতে ফেডাপ (হয়রান) হয়ে গেলেন। কিন্তু স্ত্রী তাকে উৎসাহ দান করেন এবং বলেন, **"হানি! ডন্ট গিভ আপ! ইউ উইল সাকসীড, সুন!'**।

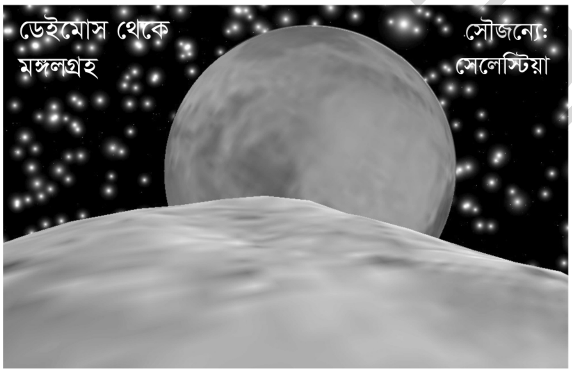
দ্বিতীয় চন্দ্র

মঙ্গলের অপর উপগ্রহের নাম **ডেইমোস**। এটি মঙ্গল থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে। এটিও ছোট্ট আলুসদৃশ একটি চন্দ্র। এই মুহূর্তে (মে ২, ২০১২, সময়: বিকেল ৩:৪১ মিনিট) ডেইমোস মঙ্গল থেকে **২০,৫০০ কিমি (১২৭৩৮ মা)** দূরে অবস্থান করছিলো। তার গড় ব্যাসার্ধ **৭.৯ কিমি (৪.৯১ মা)** মাত্র। **১.২৬২ দিন** হলো তার আহ্নিক গতি। পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা মাত্র **২১৬ কেলভিন (-৫৭.১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস)**। ফবোসের তুলনায় ডেইমোসের প্রদক্ষিণ গতি আরো ক্ষিপ্র। সে নিজের মধ্যশলাকার উপর একবার ঘুরতে যে সময় নেয় ঠিক একই সময়ে মঙ্গলের চতুর্দিকেও একবার ঘুরে আসে। সুতরাং এই চন্দ্রটিও **'তারঙ্গিকভাবে তালাবদ্ধ'**। সে তার একটি মুখ মঙ্গলের দিকে আর অপরটি বিপরীত দিকে সর্বদাই লুকিয়ে রাখে। আপনি মঙ্গল থেকে ছোট্ট এই চাঁদটি দেখবেন খুব দ্রুত আকাশে চলন্ত আছে।



মঙ্গলের ২য় চন্দ্র ডেইমোস

এ চাঁদটিও দেখতে আলুর মতো। তার পৃষ্ঠদেশ **ইরেগুলার (অমসৃণ)**। আমাদের চন্দ্রের মধ্যম আয়তনের একটি গর্তে পুরো ডেইমোসকে রাখা যাবে। ধূসর **কার্বন-সর্বস্ব শিলা পাথরের** তৈরী এই ছোট্ট চন্দ্রটি। এরূপ বস্তু বাইর এ্যাস্টারোইড বেল্টে অনেক পাওয়া যায়। তাই অনেকের ধারণা মঙ্গলের উভয় চন্দ্র মূলত **'গ্রেফতারকৃত এ্যাস্টারোইড'** ছাড়া আর কিছু নয়। যাক, অন্তত দু'টি চাঁদ দ্বারা মঙ্গলের লালচে আকাশ কিছুটা অলংকৃত হয়েছে। আমাদের তো মাত্র একটি, আর অভ্যন্তরীণ গ্রহদ্বয়- **বুধ ও শুক্র**



ডেইমোস থেকে মঙ্গলগ্রহ

সৌজন্যে: সেলেস্টিয়া

তো সম্পূর্ণ চাঁদশূন্য। অনুসন্ধানী সহযাত্রী! কেমন লাগতো পৃথিবীর আকাশ- যদি শশিশূন্য হতো?

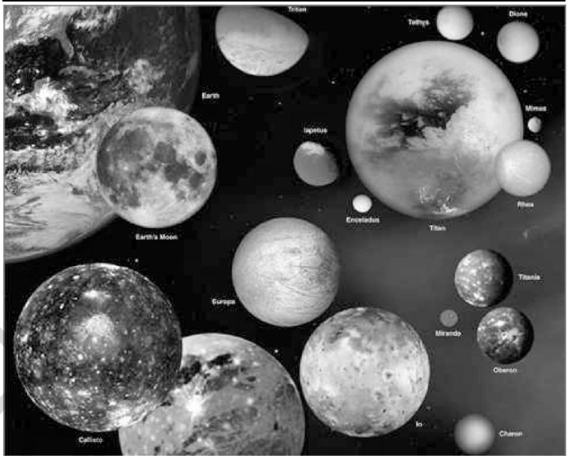
ডেইমোসের গাঁ অতীতে অসংখ্য ছোট্ট এ্যাস্টারোইড দ্বারা বম্বার্ডমেন্টের শিকার হয়েছে। তবে অপর চন্দ্র ফবোসের তুলনায় তার পৃষ্ঠদেশ অনেকটা মসৃণ। এরপরও **'সুইফট'** ও **'ভলটেয়ার'** নামক দু'টি পতন-গর্ত আছে যারা চওড়ায় ৩ কিলোমিটার হবে। আহ্‌হা! আরো দু'টি নাম **'বাস্তব'** মানুষের নামানুসারে! সত্যিই সাপ্রাইজের কথা। নয় কি?

ডেইমোসের পৃষ্ঠদেশ **'রিগোলিথ'** নামক একটি শক্ত পাথরসদৃশ বস্তু দ্বারা আবৃত। ১৯৭০ দশকে আমেরিকার **'ভাইকিং'** মহাকাশযান ডেইমোসের কিছু ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এতে দেখা যায় বড় বড় বোল্ডার উপগ্রহের উপর বসে আসে। মঙ্গলের উভয় চন্দ্রই বায়ুমণ্ডল ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না- এগুলো বেশী ছোট্ট। এছাড়া উভয়টির উপর বা অভ্যন্তরে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ নীল।

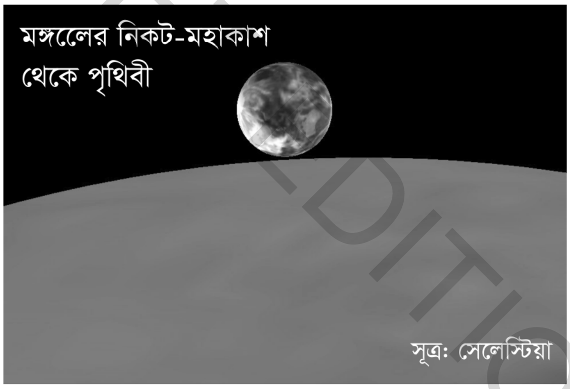
উপরে **আসাফ হল** কর্তৃক ফবোস আবিষ্কারের কথা বলেছি। তিনি ডেইমোসও ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন। মঙ্গল ও তার দু'টি চাঁদের উপর আমাদের আলোচনা এখানে শেষ হবে। তবে অনুসন্ধান এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ও চলছিলো। তাই অদূর ভবিষ্যতে আমরা আমাদের এই লাল পড়শী গ্রহ সম্পর্কে যে আরো অনেক কিছু জানবো তা নিশ্চিত। তাছাড়া কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ পর্যন্ত প্রাপ্ত **'যাবতীয়'** তথ্য আমাদের আলোচনায় অবশ্যই আসে নি। আপনার মধ্যে যদি আরো জানার ইচ্ছে উঁকি-ঝুঁকি দেয় তাহলে ইন্টারনেটে যেয়ে সন্ধান করুন। এবার চলুন, বাড়িতে যাই! হ্যাঁ, আমাদের নিজের মা-গ্রহ এখন আমাদের গন্তব্য স্থলঃ **পৃথিবী**।



ডেইমোসের একচি ছবি (সূত্রঃ নাসা)



সৌরজগতের কয়েকটি বড়ো উপগ্রহ (চাঁদ)
সূত্রঃ নাসা



মঙ্গলের নিকট-মহাকাশ থেকে পৃথিবী

সূত্রঃ সেলেস্টিয়া

৮



জুলাই '৭৯ সালে এ্যাপোলো থেকে প্রাপ্ত ছবি

সূত্রঃ নাসা

মহাশূন্যে ভাসমান নীল এ গ্রহে

মা-গ্রহ পৃথিবীর নিকটে

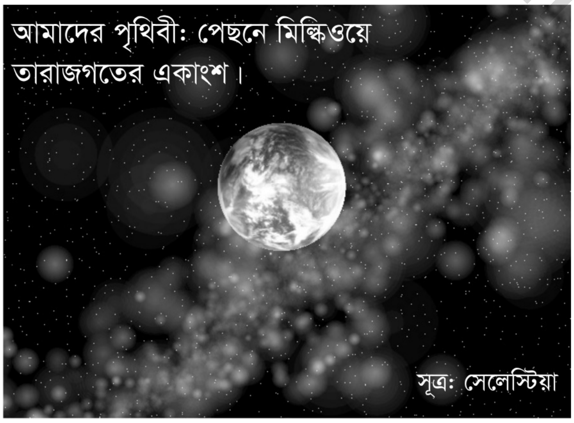
আমরা বাইর-সৌরজগতের সুদূর **অর্ট-ক্লাউড** ও **কাইপার বেল্টে** একসময় ছিলাম। **সেডনাকে** দেখেছি, দেখেছি **প্লুটো-ক্যারন**। এরপর ছুটে এসেছি চার গ্যাসের সৃষ্ট দৈত্যগ্রহের একটি **নেপচুনে**। ঘুর দেখেছি তার বেশ ক'টি চাঁদও। আমাদের ভ্রমণ থামে নি। সূর্যের দিকে পরবর্তী আরেক গ্যাস দৈত্য **ইউরেনাসকে** ভিজিট করেছি। দেখেছি তার কয়েকটি বড় চাঁদকেও। আমরা শান্ত হই নি! আরো জানা, আরো চেনার ভীষণ আগ্রহ নিয়ে আমরা **সেলেস্টিয়ার** সুবাদে কল্পনার মহাকাশযানে ভেতরের দিকে ছুটে চললাম। ঘুরে দেখলাম রিংসর্বস্ব সুদৃশ্য অপর গ্যাস দৈত্য **শনিকে**। তার ক'টি চন্দ্র নিয়েও চালিয়েছি গবেষণা। এরপরও থেমে নেই। আমরা সূর্য পর্যন্ত যাবো। তাই ছুটে আসলাম সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্যাস দৈত্য **বৃহস্পতির** নিকট। এখানে অনেক তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছি। দেখেছি বৃহস্পতির ষাটেরও অধিক চাঁদও। যেনো **'সৌরজগতের ভেতর আরেক সৌরজগৎ'** বৃহস্পতি সিস্টেম। নভোচারী ভাইবোন! আপনারা রেস্ট নেন নি। বৃহস্পতির মহাকাশ ছেড়ে **এ্যাস্টারোইড বেল্ট** পাড়ি দিয়ে চলে আসলেন আমার সঙ্গে লাল, রোমাঞ্চকর গ্রহ **মঙ্গলে**। সর্বশেষ আমাদের থামার স্থান ছিলো মঙ্গলের নিকট-মহাকাশ। আমরা মঙ্গলকে দেখেছি কাছে থেকে, দেখেছি তার দু'টি আলুর মতো ছোট্ট চাঁদকেও। এবার বেড়ে ওঠেছে আমাদের অন্তরের উদ্গ্রীবতা! আমরা যেতে চাই আমদের নিজস্ব নীলাম্বরী গ্রহের নিকট। আমাদের **মা-গ্রহ পৃথিবীর** মহাকাশে।



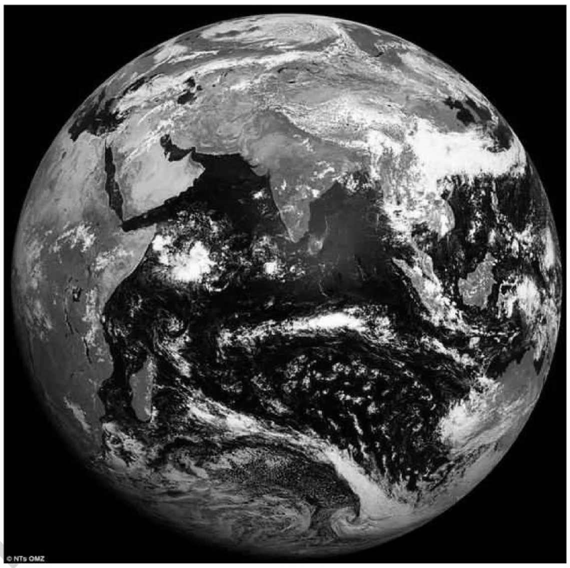
কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর একাংশের দৃশ্য

আমরা পৃথিবীকে একটি **'গ্রহ'** হিসাবেই দেখবো। এর উপরস্থ বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু বলবো না। কারণ তা যদি বলতে যাই তাহলে এই গ্রন্থটি হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাবে! যা আদৌ প্রিন্ট করা সম্ভব হবে না। সৌরজগতের একটি একক **'প্রাণবন্ত'**, **'প্রাণীজীবন'** ও **'সবদিক থেকে আরামদায়ক'** এই গ্রহের উপর আমরা **'এলিয়েন'** হিসাবে তথ্যানুসন্ধান চালাবো। সুতরাং আসুন, ঘুরে দেখি দূর আকাশ থেকে আমাদের গ্রহটিকে।

গ্রহ হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর স্থান তিনে। ঠিক **১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** দূরে সে অবস্থান করছে। হ্যাঁ, সূর্যের সেন্টার থেকে পৃথিবীর সেন্টার পর্যন্ত দূরত্বকেই বলে ১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট। বাস্তবে কিলোমিটারের হিসাবে তা **১৪,৯৫,৯৭,৮৭০ কিমি (৯,২৯,৫৫,৮০৮ মাইল)**। তবে এই মুহূর্তে আমাদের গ্রহটি সূর্য থেকে কতটুকু দূরে অবস্থান করছে তা দেখে নিতে পারি। কিভাবে? আমাদের সহায়ক কম্পিউটার প্রোগ্রাম **সেলেস্টিয়া** ব্যবহার করে। আমরা পৃথিবীর উপর থেকে দূরত্ব মেপে দেখলাম সূর্য এখন (মে ৩, ২০১২, সময়ঃ সকাল ১১:৫৫ মিনিট) **১.০০৮১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** দূরে আছে। একে যদি কিলোমিটারে রূপান্তর করি তাহলে তা দাঁড়ায় **১৫,০৮,০৯,৬১৩ কিমি-এ (৯,৩৭,০৮,৭৫০ মাইল)**।


আমাদের পৃথিবীঃ পেছনে মিল্কিওয়ে তারাজগতের একাংশ।
সূত্রঃ সেলেস্টিয়া

মহাকাশ থেকে আমাদের গ্রহটি দেখতে কিরূপ? খুব সুন্দর। পুরো সৌরজগতে এমন সুন্দর গ্রহ আর নেই। বড়, নীল মার্বেল সদৃশ গোলক ঝুলন্ত আছে মহাকাশে। উজ্জ্বল শ্বেত মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে বিরাট বিরাট মহাসাগরের উপর- এ হচ্ছে অপূর্ব এই দৃশ্যের অতি সামান্য বর্ণনা। মহাকাশে সশরীরে না যাওয়া পর্যন্ত অপূর্ব এই গ্রহের অপূর্ব দৃশ্য কখনো কেউ অনুধাবন করতে পারবেন না। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি- ছবি, চিত্র ও ভাষায় তুলে ধরতে- সে হৃদয়াকর্ষক দৃশ্যটুকু।



পৃথিবী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ডাটা গ্রন্থের শেষে তুলে ধরা হয়েছে। এরপরও এখানে ধারাবাহিক বর্ণনার খাতিরে ওসব হিসাবের কিছুটা সময় সময় পুনরুল্লেখ হবে। যেমন ইতোমধ্যে সূর্য থেকে দূরত্ব উল্লেখ করেছি। **পৃথিবী হলো সৌরজগত, তারাজগত ও বিশ্বজগতের একটি সদস্য**। মহাকাশের যে স্থানে তার অবস্থান, তা অনুধাবন খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। ভাই নভোচারী সহযাত্রী! দেখুন, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! কতো শত **'সঠিক'** এর সমন্বয় হেতু পৃথিবী যেরূপ আছে সেরূপ আছে। আমাদের মতো প্রাণীজীবন রক্ষার্থে এ আয়োজন। সূর্য থেকে **সঠিক দূরত্ব, সঠিক গতি, সঠিক ঘূর্ণন, সঠিক ম্যাস (ওজন), সঠিক পরিমাণ পানি, সঠিক বায়ুমণ্ডল, সঠিক মহাকর্ষ, সঠিক ম্যাগনিটোস্ফিয়ার, সঠিক ...**। আর কতো বলবো... ...।

পৃথিবীর বিভিন্ন গতি

পৃথিবীর বুকে আমরা দাঁড়িয়ে কী দেখি? আমরা দেখি বিরাট এক সূর্য পূর্বে উদয় হয় দৈনিক। এরপর পশ্চিমে অস্ত যায় প্রায় ১২ ঘণ্টা পর। এরপর আবার সে আরো ১২ ঘণ্টা পরে পূর্বে পুনরায় উদয় হয়। এভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরের পর বছর চলছে- বিরামহীন। আমরা যখন রাতের আকাশে তাকাই, দেখতে পাই গণনাতীত তারা ও আমাদের চাঁদ পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে ধীর গতিতে চলে যেতে। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা বলে উঠি- আহ! সমগ্র আকাশমণ্ডল ঘুরছে- পূর্ব থেকে পশ্চিমে তা সদাচলমান। কথাটা ঠিক, অন্তত তা-ই দৃশ্যমান বলে মনে হয়। বাস্তবে তা কিন্তু আংশিক সঠিক।



আসলে পৃথিবীও স্থির নেই, স্থির নেই সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র এমনকি পুরো মহাবিশ্বের কিছুই স্থির নেই। **সব গতিশীল, ঘূর্ণমান**। কিছু নির্দিষ্ট স্বাভাবিক আইনের আওতাভুক্ত থেকে সবকিছু যারতার পথে ঘুরাফেরা করে। আসলে এসব গতি **‘অস্তিত্বরক্ষার’** স্বার্থে- বৈ কিছু নয়। মৌলিক কিছু **স্বাভাবিক ফিজিক্যাল আইন** দ্বারা এসব গতি নিয়ন্ত্রিত। এই আইন থেকে ব্যতিক্রম হয় না। সমগ্র মহাবিশ্বের সর্বত্র সকল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তুই এই আইনের সীমানার মধ্যে থেকে মহাবিশ্বে গতিশীল আছে। এই গ্রন্থে আমাদের **‘সৌরজগৎ’** বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে **‘সৌরকাঠামো’**র উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। সুতরাং বাইর মহাবিশ্ব সম্পর্কে যা কিছু এখানে বলা হচ্ছে তা প্রাসঙ্গিকক্রমে আসছে মাত্র। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমার রচিত **‘সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’** এবং **‘ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা’** গ্রন্থদ্বয়ে হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করতে পারেন।

‘স্পেইস শীপ’ পৃথিবী

কথাটা বাংলায় বললেও চলতো- **‘মহাকাশযান’** পৃথিবী। তবে স্পেইস শীপ অনেকটা বেশী **‘রোমাঞ্চকর’**, নয় কি? এই স্পেইস শীপ কিন্তু কৃত্রিম নয়- অকৃত্রিম- চিরচলন্ত আমাদের এই পৃথিবী। সে মহাকাশে হু-হু করে চলন্ত। নভোচারী সহযাত্রী ভাইবোন! এবার আপনি জেনে নেবেন, মহাকাশে আমাদের **পৃথিবী-মহাকাশযান** কিভাবে কোন্ দিকে কোন্ গতিতে ছুটে চলছে।

আমাদের এই মা-গ্রহের কয়েকটি গতি আছে:

১. তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে লাটিমের মতো একটি গতি আছে যাকে আমরা **দৈনিক বা আহ্নিক** গতি বলি। এই গতির ফলে সে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। অর্থাৎ আপনি যখন বিষুবরেখার উপর অবস্থান করবেন তখন দেখবেন ২৪ ঘণ্টায় পুরো পৃথিবী ঘুরে আসবে আপনাকে নিয়ে। পৃথিবীর বড়ত্ব, গতি এবং তুলনামূলকভাবে আপনার ক্ষুদ্রতার কারণই হলো, এই ঘূর্ণন গতিটির কোন ক্রিয়া অনুভব না করা। অর্থাৎ ঘূর্ণন হেতু আপনি ছিটকে পড়েন না বা দাঁড়াতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর তুলনায় দশ-ভাগের একভাগ ওজনসম্পন্ন হতেন, তাহলে অবশ্যই এই গতি অনুভব করতেন! পৃথিবীর বুকে **‘কন্টিনেন্টাল শিফ্ট’** (মহাদেশের চলন) এ কারণেই হয়ে থাকে। বাইর **‘ক্রাস্টের’** বিভিন্ন ভূখণ্ড এই ধীরগতিতে চলন্ত থাকায় জমিনে সৃষ্টি হয় **ভূ-কম্পন**, অতীতে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়-

পর্বত। ভূতাত্ত্বিক অনেক ক্রিয়ার কারণই হলো পৃথিবীর **আহ্নিক গতি**। তবে এ গতি যে আপনি একেবারে দেখেন-বুঝেন না, তা কিন্তু নয়। পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যাওয়া, রাতের আকাশে তারামণ্ডলের পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি ঐ আহ্নিক গতির ফলেই দৃশ্যমান হয়। অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না! **মনে করবেন না, আমি বলছি- ‘পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে আর সূর্যের নেই- বা সে স্থির আছে! অথবা পৃথিবী ঘুরে সূর্য স্থির!’** আসলে এই কথাগুলো সর্বাপেক্ষা অবাস্তব। পৃথিবীর গতির তুলনায় সূর্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি অনেক বেশী। **‘স্পেইস শীপ’** পৃথিবীর উপর আমাদের এই আলোচনা যখন আরো গভীরে যাবে- তখনই আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন এসব বাস্তবতা সম্পর্কে।

আহ্নিক গতি থেকে দিন-রাতের তারতম্য ঘটে- কথাটি এখন সর্বজনবিদিত ও গ্রহণযোগ্য সত্য। সুতরাং এ সম্পর্কে আর বেশী বলার দরকার নেই। তবে একটা অঙ্ক কষে নিই। ভাববেন না, জটিল কিছু নয়- আমরা জানতে চাচ্ছি পূর্বদিকে আপনি বিষুবরেখার নিকটবর্তী বসবাসকারী কোন্ গতিতে সর্বদা চলন্ত আছেন? এই হিসেবটি সহজে করা যায়। যেমন:

আপনার গতি = পৃথিবীর (বিষুবরেখা বরাবর) পরিধিরেখার পরিমাণ / একবার ঘুরে আসার সময়।

আমরা এই গতিটি **‘কিমি প্রতি মিনিট’** হিসাবে জানতে ইচ্ছুক। সুতরাং সমীকরণের উপরের অংশ হতে হবে কিলোমিটার ও নীচের অংশ মিনিট ইউনিট। প্রথমে জেনে নিই পৃথিবীর পরিধিরেখার **পরিমাণ = ২*পাই*ব্যাসার্ধ**। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন **পাই = ৩.১৪১৫৯২৬৫** । সুতরাং আমরা আবার লিখতে পারি:

পরিধিরেখার পরিমাণ = ২*৩.১৪১৫৯২৬৫*৬৩৭৮.১ = ৪০০৬২.২১৭৭৯১৩৩।

এ সংখ্যাকে **৪০০৬২.২২** লিখা যায়। এবার বের করে নিচ্ছি ২৪ ঘণ্টায় কতোটি মিনিট আছে **= ২৪ * ৬০ = ১৪৪০ মিনিট**। এখন আপনার পূর্বদিকে চলার গতিটি বের করতে পারি:

গতি = ৪০০৬২.২২ / ১৪৪০ = ২৭.৮২০৯৮৬১১১১১১১ কিমি/মিনিট।

আমরা যদি এই সংখ্যাকে **২৭.৮২** লিখি তাহলে বেশী বেশকম হবে না। দেখলেন তো আপনার গতি! এটা কম নয়। কিন্তু আপনি আমি এই গতি টের পাই না। সমগ্র বায়ুমণ্ডলসহ পৃথিবী এই গতিতে সর্বদা পূর্বদিকে ঘুরছে। বিমানও যদি উচ্চগতিতে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে যায় তবুও এই গতিকে অতিক্রম বা পেছনে ফেলে যেতে পারবে না- কারণ এই গতির ফলে বিমানও পূর্বদিকে **২৭.৮২ কিমি/মিনিট** চলতে থাকবে। একমাত্র **মুক্তগতি** অর্জিত হলে এই গতি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। আমরা একটু পরই মুক্তগতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

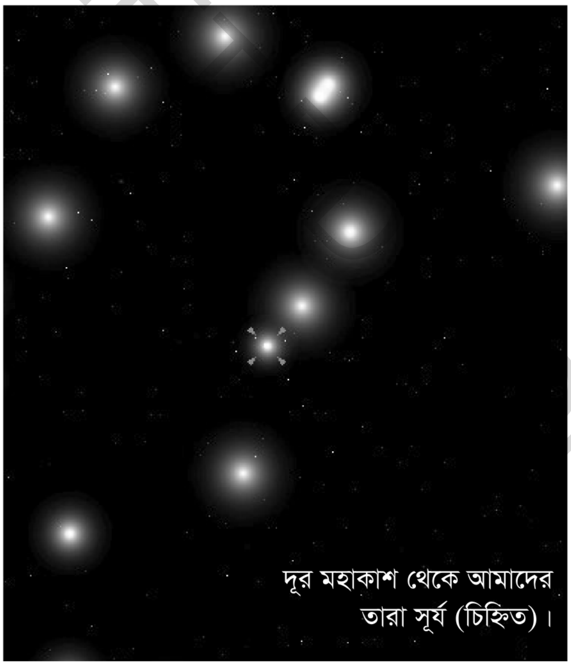
পৃথিবীর ২ নং গতির নাম, **‘বার্ষিক’** গতি। এই গতিকে প্রদক্ষিণপথের গতিও বলে। এটি



সূর্যের চতুর্দিকে এক বৎসরে প্রদক্ষিণ করার গতি। এ গতির পরিমাণ হলো **২৯.৭৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড**। একই অবস্থানে পৃথিবী এই গতিতে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে সময় লাগায় **৩৬৫.২৫৬ দিন**। বলতে পারেন, পৃথিবীকে একবার তার প্রদক্ষিণপথে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে যেয়ে মোট **৩৬৫.২৫৬ বার** নিজের মধ্যশলাকার উপর ঘুরতে হয় **(তার আহ্নিক গতি)**। আসা করছি কোন সন্দেহ ছাড়াই ব্যাপারটা বুঝে এসে গেছে। সুতরাং **আহ্নিক** ও **বার্ষিক**- এ মৌলিক দু'টো গতির ফলে দিন-রাতের আবর্তন ও বৎসরের হিসাব আমরা করতে পারছি। এখন আমরা ৩ নং আরেক গতির উপর আলোচনা করবো।

পৃথিবীসহ সৌরজগতের সবকিছুর মধ্যে এই গতিটি বিদ্যমান। এক বলে **'গ্যালাক্টিক প্রদক্ষিণ গতি'** (আগের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন)। আগে যে বলেছিলাম, সূর্য স্থির নয়- এখন তার প্রমাণ তুলে ধরছি। অবশ্য এই **'এপিক ভয়েজের'** অংশ হিসাবে আমরা যখন সূর্যের কাছে যাবো তখন বিস্তারিত আলোচনা হবে আমাদের নিকটতম এই তারাটি নিয়ে। এখন পৃথিবীর তৃতীয় গতি হিসাবে শুধু এটুকু বলছি, সমগ্র সৌরজগত মূলত **'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'** নামক একটি বিরাট তারাসিস্টেমের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সৌরসিস্টেমের বাইরের দূর মহাকাশ থেকে যখন আমরা তাকাবো তখন সূর্যকে মহাকাশের অসংখ্য অন্যান্য তারকার একটি হিসাবে দেখবো। ডানের চিত্রটি দেখুন। আমরা অনেক **(১.০ আলোকবৎসর)** দূর থেকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে এই ছবিটি তুলেছি। এটি অবশ্য সম্ভব হয়েছে আমাদের সাথে সেই অপূর্ব সেলেস্টিয়া প্রোগ্রাম থাকায়। লক্ষ্য করুণ, কোন গ্রহ-উপগ্রহ দেখাচ্ছে না।

সূর্য তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমগ্র মহাবিশ্বের সকল তারার মতো নিজস্ব সিস্টেমের কেন্দ্রের চতুর্দিকে উচ্চগতিকে চলন্ত আছে। যেভাবে আমাদের পৃথিবীসহ সৌরজগতের সবকিছু (অর্থাৎ, সূর্যের মহাকর্ষের আওতাভুক্ত সকল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তু) সূর্যকে নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণ করে (বাৎসরিক গতি), ঠিক তদ্রূপ সূর্যও তার আওতাভুক্ত সকলকে নিয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণরত আছে। আর যে গতিতে সূর্য চলে আমরাও সে-ই গতিতেই (তার সাথে) চলি। এবার জেনে জিন এই গতিটি কি? সূর্য মিল্কিওয়ে নামক গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে **২.৬ * $১০^{১৭}$ কিমি (১.৬ * $১০^{১৭}$ মা) বা ২৭,২১৭.৮১ আলোক-বৎসর** দূরে অবস্থান করে। সে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দিকে **২২০ কিমি/সেকেন্ড (১৪০ মাইল/সেকেন্ড)** গতিতে হু-হু করে প্রদক্ষিণরত আছে। অন্যভাবে বললে তা হবে, **৭,৯২,০০০ কিমি/ঘণ্টা (৪,৯২,১২৫ মাইল/ঘণ্টা)** এই গতি। সূর্যকে এই উচ্চ গতিতে একবার মাত্র ঘুরে আসতে (যাকে আমরা **'গ্যালাক্টিক বৎসর'** বলতে পারি) **২৫ কোটি বৎসর সময় অতিবাহিত হয়!**


দূর মহাকাশ থেকে আমাদের তারা সূর্য (চিহ্নিত)।

প্রিয় নভোচারী ভাই ও বোনেরা! মহাকাশযান পৃথিবীর এই তৃতীয় গতিটি কতো বিরাট দেখলেন তো? এই গতি সঠিকভাবে মাপা হয়েছে। অতি সামান্য তারতম্য থাকতে পারে- এই যা। এই গতিকে অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। এ পর্যন্ত মানবসৃষ্ট কোন মহাকাশযান এই উচ্চগতি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় নি। বিজ্ঞান বলছে, সৃষ্টির পর থেকে আমাদের সূর্য **১৮ বার মাত্র ঘুরে এসেছে**। সূর্যের বয়স মাত্র **১৮ গ্যালাক্টিক বৎসর!** আর সৌরজগতের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর হিসাবে **৪.৬ বিলিয়ন বৎসর!** আর বলছি না। আমাদের ক্ষুদ্র মন-মস্তিষ্কে এতো বড় অঙ্কের হিসাব কুলায় না। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এটাই আমাদের **বিশ্বজগৎ**। তার বিরাটত্ব সত্যিই অকল্পনীয়। যাক, এসব ভিন্ন কথা।

নভোচারী ভাইবোন! তৃতীয় এই গতিই কি সর্বশেষ? না! পৃথিবী মহাকাশে এই তিনটি গতিতেই শুধু চলন্ত নয়। এর আরো এক দু'টো গতি আছে। তবে এখানে কোন সংখ্যা না লিখে গতিগুলো উল্লেখ করবো মাত্র।

পৃথিবী স্পেইস শীপের ৪র্থ গতি হচ্ছে, **গ্যালাক্টিক গতি**। আমাদের পুরো তারাসিস্টেম বা **'মিল্কিওয়ে'** গ্যালাক্সি তার চারশ কোটির মতো তারকা নিয়ে মহাকাশে স্থির নয়। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি সূর্যসহ সকল তারকা যারতার নির্দিষ্ট গতিতে ও প্রদক্ষিণপথে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরছে। তবে এই গ্যালাক্সিই একমাত্র গ্যালাক্সি এই মহাবিশ্বে নয়- আরো শতকোটি অনুরূপ ছোটবড় গ্যালাক্সি আছে। সবগুলো নিয়েই গঠিত এই **বস্তুজগৎ**। এসব গ্যালাক্সি অস্তিত্ব বজায় রাখতে যেয়ে প্রদক্ষিণরত আছে। আমাদের গ্যালাক্সি ও আশপাশের কয়েকটি গ্যালাক্সি একত্রে তাদের ম্যাস বা ভরের কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে উচ্চগতিতে ঘূর্ণমান আছে। সুতরাং এই গ্যালাক্সির সদস্য হিসাবে আমরাও তার সাথে ঘুরছি। এখানেই শেষ নয়, পৃথিবী মহাকাশযানের অপর আরেক গতি আছে। ৫ নং এই গতিটি হলো **'লোক্যাল ক্লাস্টারের'** গতি।

আমাদের গ্যালাক্সি ও পড়শী কয়েকটি গ্যালাক্সি মিলে একটি গ্রুপ আছে একেই বলে **'লোক্যাল ক্লাস্টার'** (স্থানীয় গুচ্ছ)। এই ক্লাস্টার একটি **সুপারক্লাস্টারের** সদস্য। পুরো সুপারক্লাস্টারের একটি মহাকার্ষিক কেন্দ্র আছে যার উপর ভিত্তি করে এটি ঘূর্নমান। সবশেষে আরেকটি গতির কথা উল্লেখ করে **'পৃথিবী স্পেইস শীপের'** উপর আমাদের এই চিত্তাকর্ষক তথ্যানুসন্ধানের ইতি টানবো। ৬ষ্ঠ এই গতিটি হলো **স্ফীতি গতি**। সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে চতুর্দিকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে। যেভাবে একটি বেলুনকে ক্রমান্বয়ে ফুলালে তার আয়তন চতুর্দিকে বাড়তে থাকে ঠিক সেভাবে সমগ্র বিশ্বটা দিন দিন চতুর্দিকে ফুলে ওঠছে। ফলে আমাদের গ্যালাক্সিসহ সকল গ্যালাক্সি দিন দিন একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যাচ্ছে।


যেভাবে মহাবিশ্ব বর্ধিত হচ্ছে

প্রিয় নভোচারী ভাইবোন! আর বলবো না। পৃথিবীর উপর আমরা শান্তিতে বসবাস করছি। যে ৬টি গতির উপর আলোচনা করলাম এগুলোর কোনটিই আমাদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর, কিংবা সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে না। আসলে এসব গতিবিধি মূলত পুরো মহাবিশ্ব যেভাবে অস্তিত্বশীল আছে সেভাবে থাকার একটি কৌশল মাত্র। এ কথাটি আজ সকল বিজ্ঞানী একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। উপরোক্ত প্রতিটি গতির অস্তিত্ব নিয়ে আজ আর কেউ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করেন না। এর কারণ হলো, **পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নীরিক্ষণ ও নেচারেল ফিজিক্স** দ্বারা তা সত্যায়িত হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে অন্যরা এসে মাপজোখ আরো সূক্ষ্ম করবেন। জগত-পরিচলন ক্রিয়া সম্পর্কেও হয়তো নতুন নতুন থিওরী উপস্থাপন করবেন। আমরা অপেক্ষায় আছি।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

আমরা পৃথিবীকে সৌরজগতের একটি গ্রহ হিসাবে গণ্য করছি। নভোচারীদের জন্য এরূপ কারই যথার্থ। ইতোমধ্যে আমরা সৌরজগতে পৃথিবী গ্রহের অবস্থান, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা চলে যাবো গ্রহের ঠিক কেন্দ্রে। সেখান থেকে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে উপরের দিকে মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের উপর তথ্যাদি তুলে ধরবো।



নীচের চিত্রে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তর দেখতে পাচ্ছি। কৌর ও মেন্টল স্তর মিলে সৃষ্টি হয়েছে মূল অভ্যন্তর। গ্রহের মোট ওজন বা ম্যাসের সিংহভাগ এই উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। উপরস্থ স্তর **'ক্রাস্ট'** থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব হলো **৬,৪০০ কিমি (৪,০০০ মাইল)**। তিনটি উপায়ে বিজ্ঞানীরা গ্রহের অভ্যন্তরের উপর গবেষণা চালিয়ে থাকেন: **১. অভ্যন্তরে সৃষ্ট শিলা পাথর যা কোন কারণে উপরে ওঠে এসেছে, ২. আকাশ থেকে পতিত 'মিটিওরাইট' (পাথরের মতো ছোট্ট ছোট্ট শিলাখণ্ড)। এগুলো যেসব বস্তুর তৈরী, অনুরূপ বস্তুতে পৃথিবীর অভ্যন্তরও সৃষ্ট বলে ধারণা করা হয়, এবং ৩. সাইজমিক তরঙ্গ- যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে আত্মপ্রকাশ করে ভূমিকম্প থেকে।**

মেন্টল (আবরণ)

শক্ত **লৌহ-মেগনেসিয়াম-সিলিকেট পাথরের** তৈরী হলো আমাদের গ্রহের মেন্টল। এতে আরো আছে স্বল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন উপাদান। শক্ত এই পাথরও কিন্তু উচ্চ চাপ ও তাপের প্রকোপে আঁটালো গমের মতো তরল হয়ে যেতে পারে।

কৌর (কেন্দ্র)

'core' শব্দটির উপযুক্ত অর্থবোধক কোন বাংলা প্রতিশব্দ পাই নি! তবে তা অভিধানে আছে। **শাঁস, মর্মবস্তু** ইত্যাদি দিয়ে বুঝানো হয়েছে এর অর্থ। কিন্তু বাস্তবে কোন গ্রহ-উপগ্রহের কৌর এ দু'টো শব্দ দ্বারা বুঝানো যাবে না। ইংরেজী সেন্টার শব্দটি কৌর এর সামর্থবোধক। সুতরাং আমরা যদি সেন্টারের

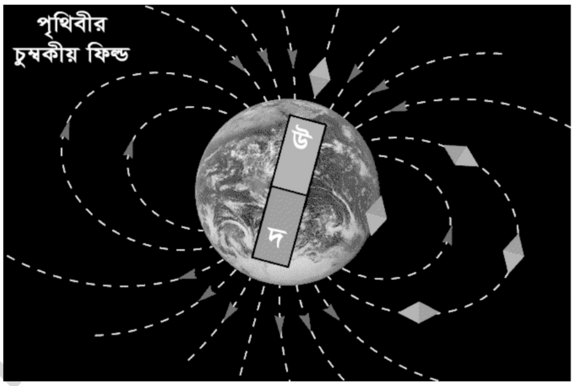
বাংলায় কেন্দ্র বলি তাহলে মূল অর্থের কাছাকাছি চলে যায়। পৃথিবী গ্রহের কেন্দ্র একটি ছোট্ট গোলক।

পৃথিবীর কৌর মূলত দু'টি অংশে বিভক্ত। বাইরের কৌর ও অভ্যন্তরীণ কৌর। বাইরেরটি **২,২৬০ কিমি (১,৪০৪ মাইল) পর্যন্ত গাঢ়**। এই এলাকা মূলত **তরল লোহার তৈরী**। এতে আরো আছে **নিকেল ও সালফার**। ভেতরের কৌর **১,২২০ কিমি (৭৫৮ মাইল) পর্যন্ত গাঢ়**। এই অংশ শক্ত। এটাও মূলত **লোহা, নিকেল ও সালফার** দ্বারা সৃষ্ট। কেন্দ্রের অংশটি যেহেতু একটি তরল অংশ দ্বারা আবৃত তাই এটি স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে। ইদানিং ভূ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, অভ্যন্তরের কৌর আসলে পুরো গ্রহের অন্যান্য স্তরের ঘূর্ণন গতি থেকেও উচ্চ গতিতে ঘুরে। মেপে দেখা গেছে প্রতি **৭০০ থেকে ১,২০০ বৎসরে** পুরো কৌরটি একবার ঘুরে আসে।

উভয় কৌরে কিছু তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন বস্তু বিদ্যমান। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তাপ সৃষ্টি হয় তার একটি কারণ এই তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন বস্তু। কারণ এসব বস্তু যখন ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় হয় তখনই তাপ-এনার্জি বেরিয়ে আসে। কেন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ স্তরে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ **৬,৬৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (১২,০০০ ফারেনহাইট)** যেয়ে পৌঁছতে পারে।

পৃথিবীর ম্যাগনিটোস্ফেয়ারে কৌরের অবদান

আমরা জানি দূর মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি **'ম্যাগনিটোস্ফিয়ার'** (চুম্বকীয় গোলক) দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আবৃত আছে। প্রাণীজীবন ধারণে এই চুম্বকীয় ফিল্ড বিরাট অবদান রাখে। তবে এই স্ফিয়ার সৃষ্টিতে যে অংশ আসল অবদান রাখছে তা হলো ইতোমধ্যে বর্ণিত পৃথিবীর কৌর বা কেন্দ্র। সূর্য শুধু আলোকরশ্মি বিকিরণ করে না। সে ক্ষতিকর কিছু রশ্মিও চতুর্দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষণে। সূর্যের **'সৌরবাতাস'** ও **'কজমিক তরঙ্গ'** যদি সরাসরি এসে পৃথিবীর উপর পতিত হতো তাহলে এই গ্রহে প্রাণীদের বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে পড়তো। এ তরঙ্গগুলো প্রাণীদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।



আমরা জানি যে কোন চুম্বকে দু'টি মেরু থাকে: **উত্তর ও দক্ষিণ মেরু**। পৃথিবী-চুম্বকেরও দু'টি মেরু আছে। তবে জানা গেছে, এই মেরুদ্বয় সঠিক স্থানে থাকে না। সময়ে এগুলো তাদের স্থান পরিবর্তন করে। চুম্বকীয় মেরু ভূতাত্ত্বিক মেরু থেকেও ভিন্ন। চুম্বকীয় মেরু দীর্ঘদিন পরপর বিপরীত দিকে স্থানান্তরিত হয় বলেও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, **গত ১০ কোটি বৎসরে মোট ১৭০ বার** এই রদবদল ঘটেছে। গড়ে ২ লক্ষ বৎসর পরপর এই পরিবর্তন ঘটে। তবে হুট করে বদলে যায় না। কয়েক হাজার বছরে এই পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই মেরু-পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পান নি। অনেকের ধারণা, পৃথিবীর **আহ্নিক, বার্ষিক** ইত্যাদি গতি ও বাইরের কৌরে চলন্ত তরল লৌহ-পদার্থ এর কারণ হতে পারে।

দূর মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ম্যাগনিটোস্ফিয়ারের ভেতরেই অবস্থিত আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।



তবে এতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ফিয়ার বা গোলক আছে যা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। এই স্ফিয়ারের নাম **'ভেন আলেন রেডিয়েশন বেল্ট'**।



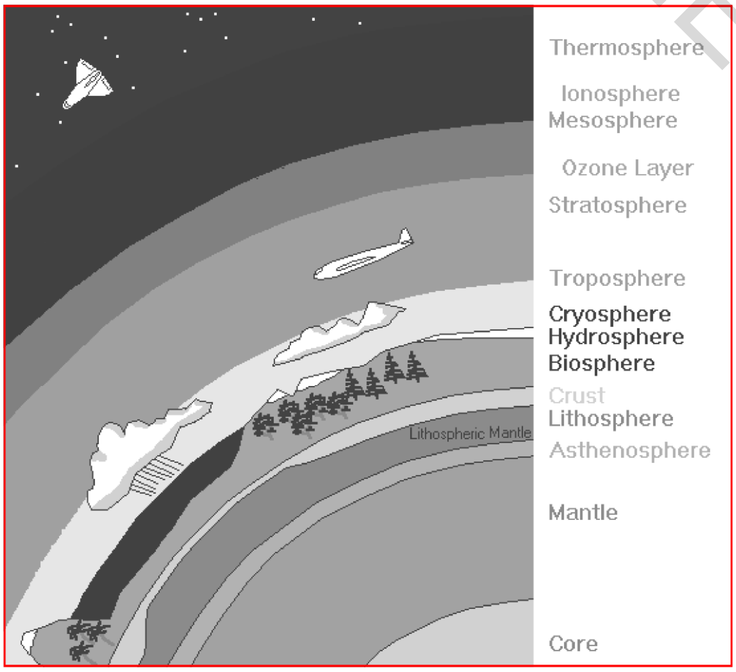
এটি একটি তেজস্ক্রিয় বেল্ট। এই বেল্টের কাজ হলো সূর্য থেকে আগত চার্জকরা বস্তুকে গ্রেফতার করে চুম্বকীয় ফিল্ডের মধ্যে বক্রপথে প্রেরণ করা। সুতরাং চুম্বকীয় ফিল্ডের অভ্যন্তরস্থ এই বেল্টের কাজ হলো আমাদেরকে ক্ষতিকর কজমিক রেডিয়েশন থেকে মুক্ত রাখা। তবে সর্বদাই এটা আমাদেরকে **'পাখার নীচে'** রাখতে সক্ষম হয় না। প্রতি **১১** বৎসর পরপর সূর্যের মধ্যে কিছু ক্রিয়া সংগঠিত হয়- একে বলে **'সোলার ফ্লেয়ার'**। এসময় সূর্যের বায়ুমণ্ডল থেকে উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন বস্তু দূর মহাকাশ পর্যন্ত বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর দিকে উচ্চ গতিতে ছুটে আসে **সৌরবাতাস** ও **কজমিক তেজস্ক্রিয়া**। এই ক্রিয়ার ফলেই সূর্যের উপর সৃষ্টি হয় কালো দাগ- যাকে আমরা **'সূর্যকলঙ্ক'** বলি। **ভেন আলেন রেডিয়েশন বেল্ট ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ার** এই উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন কণাগুলো গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। এগুলো উভয় মেরুর দিকে চলে যায়। পৃথিবীর চুম্বক ফিল্ডের দূরত্ব উভয় মেরুর দিকে অনেকটা কাছে থাকায় সেখানে যেয়ে এসব কণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ হয়। সৃষ্টি করে মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক আলোক-নৃত্য। এই আলোক-নৃত্যের নাম **'আরোরা'**। নীচের চিত্রটি দেখুন।



নভোচারী ভাইবোনরা! আপনারা হয়তো টিভিতে এই অরোরার দৃশ্যটি দেখেছেন। জানা না থাকলে, এখন এর কারণটি আপনাদের জানা হয়ে গেল। জানার মধ্যে কী যে আনন্দ! কবি নজরুল বলেছিলেন, **'এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!'**। আমরা বলতে পারি, **'এই জ্ঞানার্জনের আনন্দে!'**। জ্ঞানার্জনের আনন্দ সত্যিই চিন্তাশীলদের জীবন-খোরাক। যাক, ফিরে আসি আমাদের পৃথিবী-গ্রহের বর্ণনায়।

পৃষ্ঠদেশ ও বায়ুমণ্ডল

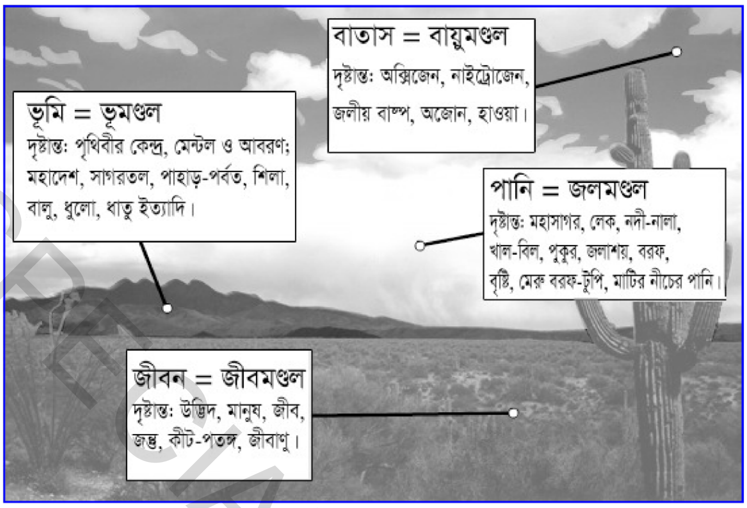
আগেই বলেছি, আমাদের প্রিয় বাসস্থান পৃথিবীর উপর বিস্তারিত আলোচনায় গেলে সমস্যা দাঁড়াবে- কলেবর মাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে! কিন্তু এরপরও আপনারা ভাববেন, আমি কৃপণতা করছি। তাই নিজেকে 'কৃপণতার' গ্লানি থেকে মুক্ত রাখতে মা-গ্রহ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। আমরা এখন গৃহের পৃষ্ঠদেশ ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করবো। এই বর্ণনা শেষে কিন্তু আমাদেরকে পৃথিবীর মহাকাশ ছেড়ে চলে যেতে হবে! আপনারা তখন কোন অভিযোগ আনতে পারবেন না, কেমন?



পৃথিবীর বাইরের স্তরই হলো এর পৃষ্ঠদেশ। এতে তিনটি আলাদা উপস্তর আছে: **১. হাইড্রোস্ফিয়ার (জলমণ্ডল)**, ২. **ক্রাস্ট (শিলাবৎ উপরের স্তর)** এবং ৩. **বায়োস্ফিয়ার (জীবমণ্ডল)**। আমরা একে একে এগুলোর উপর সংজ্ঞা তুলে ধরবো।

১. হাইড্রোস্ফিয়ার (জলমণ্ডল)

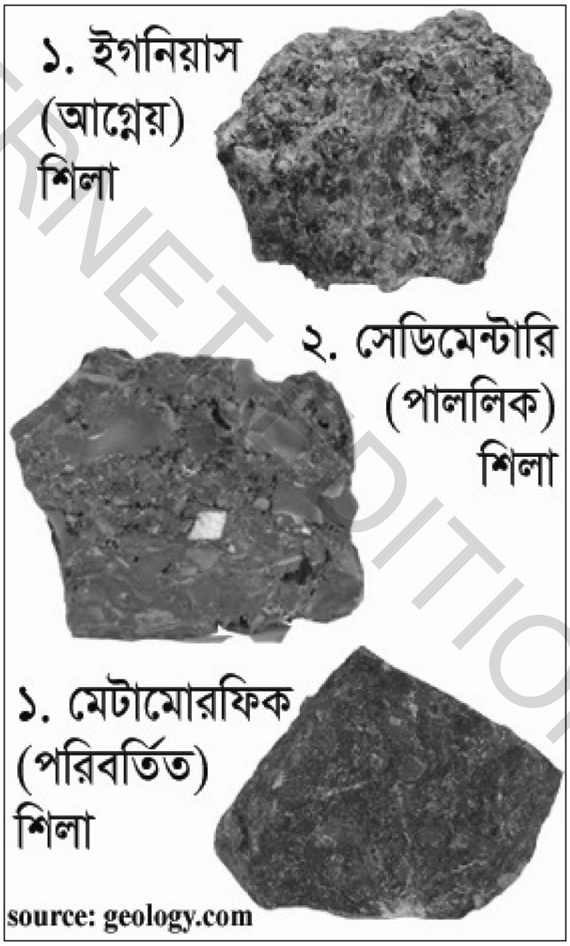
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের **৭১ শতাংশ পানি দ্বারা আবৃত**। এটাই হলো গ্রহের **হাইড্রোস্ফিয়ার**। সর্বোচ্চ যেসব অংশে এই পানির ডিপোজিট বিদ্যমান তাহলো আমাদের একাধিক মহাসাগর। মোট পানির **৯৭ শতাংশই** এই মহাসাগরে রক্ষিত। উভয় মেরুর টুপিতে আছে **বরফাকারে ২ শতাংশ পানি**। মাত্র **০.৬ শতাংশ** পানি মাটির গর্ভে বিদ্যমান। এরপরও এই মাত্রাটি যাবতীয় জলাশয়, নদী-নালা, ভূবেষ্ঠিত সাগর, বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় পানি ইত্যাদির তুলনায় **৩৬ গুণ** বেশী। এসব অঞ্চলে পানির মোট পরিমাণ মাত্র ০.০১৭ শতাংশ। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প হিসাবে আছে **০.০০১ শতাংশ**। তবে মহাসাগর ছাড়া বরফ, জলাশয়, লেক, ভূবেষ্ঠিত সাগর, নদী-নালা, জলীয় বাষ্প এবং ভূগর্ভস্থ পানি **'মিটা'** থাকায় তা সবই পানের যোগ্য। অপরদিকে সাগর-মহাসাগরের পানি লবণাক্ত। এতে আছে **৩.৫ শতাংশ লবণ**। এই পানি পানের অযোগ্য। এমনকি কৃষিকাজেও এই পানি ব্যবহার করা যায় না। তবে কৃত্রিম উপায়ে লবণমুক্ত করে নিলে তা মিঠা পানিতে রূপান্তর হতে পারে।



২. ক্রাস্ট

আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ, অন্যান্য ভূখণ্ড ও সাগরতলের মাটি নিয়ে ক্রাস্ট গঠিত। পৃথিবীর শুষ্ক ভূমিকে বলে **কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট** (মহাদেশীয় শিলাবৎ স্তর)। এই ক্রাস্টটির গাঢ়ত্ব **১৫ থেকে ৭৫ কিলোমিটার (৯ থেকে ৪৭ মাইল)** পর্যন্ত গভীর। ক্রাস্টের একটি নিশ্চিত সীমানা আছে। একে বলে **'মহো'**। এই সীমানা ক্রাস্টকে অভ্যন্তরস্থ **'মেন্টল'** স্তর থেকে আলাদা করে রেখেছে। অপর ক্রাস্টের নাম **'অশেনিক ক্রাস্ট'** (মহাসাগরীয় শিলাবৎ স্তর)। এটি কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট থেকে অনেক পাতলা। গড়ে এর গাঢ়ত্ব **৫ থেকে ১০ কিমি (৩ থেকে ৬ মাইল)** হবে। উভয় ক্রাস্ট মূলত তিন ধরনের শিলা পাথরের তৈরী: **১. ইগনিয়াস (আগ্নেয়) শিলা**। **'ম্যাগমা'** নামক গলিত পাথর ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত রূপ ধারণ করে। এটাকেই বলে **ইগনিয়াস রক (শিলা)**। **২. সেডিমেন্টারি (পাললিক) শিলা**। ইগনিয়াস শিলা ভেঙ্গে এই শিলার সৃষ্টি হয়। অতীতে মৃত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ কালে **মিনারেলে (খনিজদ্রব্যে)** পরিণত হয় এবং তা এই সেডিমেন্টারি শিলায় **'ফসিল'** হিসাবে সংরক্ষিত থাকে। **৩. মেটামোরফিক (পরিবর্তিত) শিলা**। এগুলো উচ্চ তাপ ও চাপে **ইগনিয়াস ও সেডিমেন্টারি শিলা ভেঙ্গে** সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর **অশেনিক ক্রাস্ট** মূলত কালো, উচ্চ ঘনমানবিশিষ্ট **ইগনিয়াস শিলার** তৈরী। যেমন: **ব্যাসল্ট (কৃষ্ণ আগ্নেয়শিলা)** ও **গ্যাব্রো (শস্যদানার মতো ইগনিয়াস শিলা)**। অপরদিকে **কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টে** আছে অনেকটা উজ্জ্বল রংয়ের কম ঘনমানবিশিষ্ট **ইগনিয়াস শিলা**। যেমন: **গ্রানিট (কঠিন ধূসরবর্ণের পাথর)** ও **ডায়োরাইট (আরেক ধরনের কঠিন ধূসরবর্ণের শিলা)**। এই কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টে **মেটামোরফিক** এবং **সেডিমেন্টারি** শিলাও বিদ্যমান।



৩. বায়োস্ফিয়ার (জীবমণ্ডল)

পৃথিবীর যেসব অঞ্চল প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী তা-ই হলো বায়োস্ফিয়ার। উর্ধ্বে ১০ কিলোমিটার বায়ুমণ্ডল থেকে নিম্নে মহাসাগরের গভীর পর্যন্ত এই মণ্ডল বিস্তৃত। সাধারণত এটাই মনে করা হয়, যেখানেই সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে সেখানেই প্রাণীরা বেঁচে থাকতে সক্ষম। তবে কেউ কেউ বলেন, ক্রাস্টের ভেতর গভীর অন্ধকারেও জীবাণু জীবিত থাকতে পারে। **উদ্ভিদ জীবন** সূর্য থেকে এনার্জি সংগ্রহ করে **'ফটোসিনথেসিস' (সালোকসংশ্লেষণ)** এর মাধ্যমে। অন্ধকারে বেঁচে থাকা ওসব জীবাণু এনার্জি সংগ্রহ করে **'কিমিওসিনথেসিস'** এর মাধ্যমে। এই উভয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এটুকু জেনে নিতে পারি, প্রথমটি সূর্যের আলো সবুজ পাতায় পতিত হয়ে এনার্জি তৈরী করে এবং দ্বিতীয়টি রসায়নিক উপায়ে এনার্জি বানায় জীবাণুর জন্য।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

আমরা ইতোমধ্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর কিছু বর্ণনা তুলে ধরেছি। এবার বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার প্রয়োজন।

আমাদের গ্রহের চতুর্দিকে বায়ুমণ্ডল থাকার মূল কারণ হলো পৃথিবীর ওজন বা ম্যাস। এটা যথেষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর মহাকর্ষ পর্যাপ্ত হয়েছে। আর পর্যাপ্ত মহাকর্ষ ছাড়া পাতলা বায়ু আকর্ষণ করে ধরে রাখা সম্ভব নয়। চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল না থাকার এটাই কারণ। যাক, বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে উর্ধ্বে এক্সোস্ফিয়ার পর্যন্ত যা মাটি থেকে **৯,৬০০ কিমি (৬,০০০ মাইল)** উপরে অবস্থিত। পৃষ্ঠদেশের

Dry Air Expressed in Volumes	
Nitrogen (N_2)	78.1%
Oxygen (O_2)	20.9%
Argon (A)	0.9%
Carbon dioxide (CO_2)	0.035%
Others	0.065%

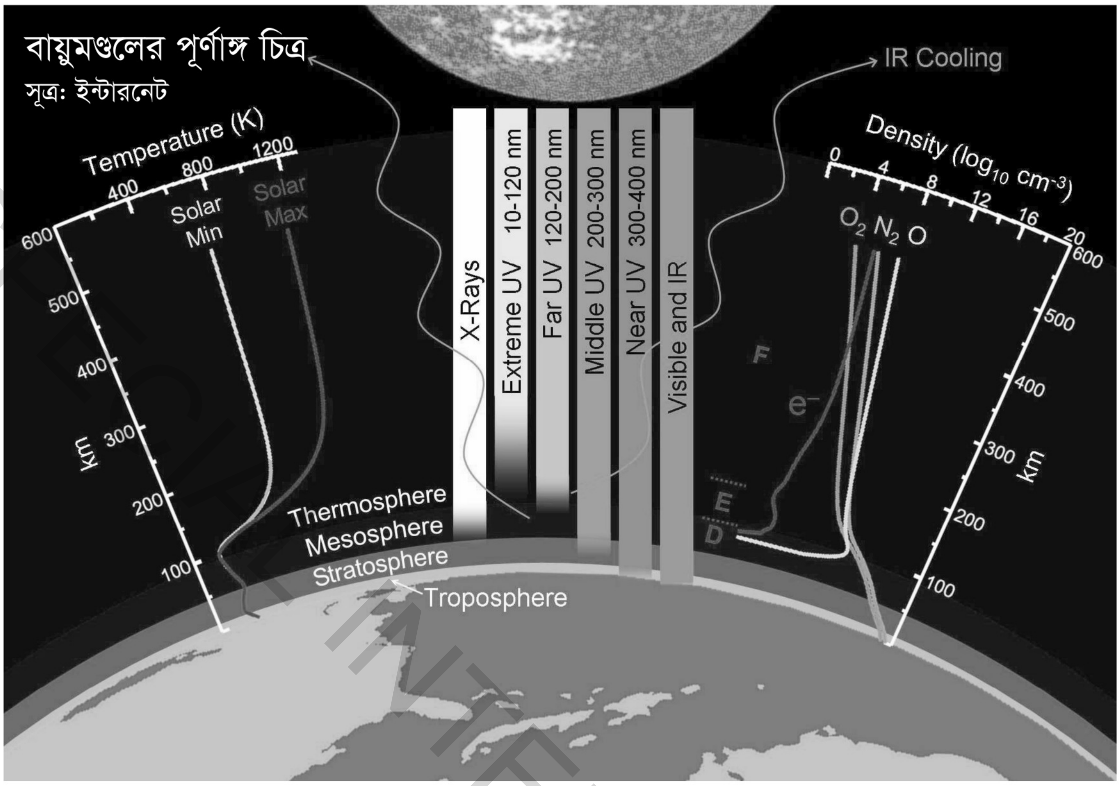
Others : Neon (Ne)
Helium (He)
Krypton (Kr)
Hydrogen (H_2)
Xenon (Xe)
Ozone (O_3)
Radon (Rn)



শুষ্ক বাতাসে বিভিন্ন বস্তুর মাত্রা

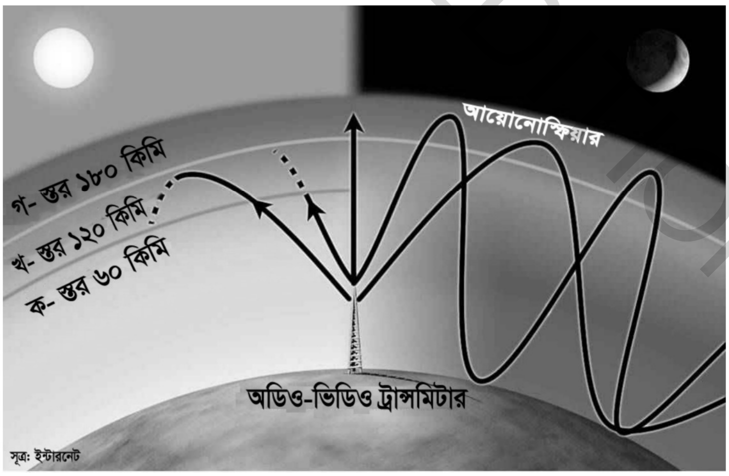
নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলের বাতাসে আছে **৭৮% নাইট্রোজেন** এবং **২১% অক্সিজেন**। বাকী **১% গ্যাস মূলত আরগন (০.৯%), কার্বন ডাইওক্সাইড (০.০৩%), অতি সামান্য জলীয় বাষ্প, খুব অল্প হাইড্রোজেন, নাইট্রাস ওক্সাইড, অজোন, মিথেইন, কার্বন মনোক্সাইড, হিলিয়াম, নিওন, ক্রিপ্টন এবং জিনোন গ্যাসের মিশ্রণ**।

বায়ুমণ্ডলের একাধিক আলাদা স্তর আছে। মোট পাঁচটি মৌলিক স্তর বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেছেন। এগুলো হলো: **১. ট্রপোস্ফিয়ার, ২. স্ট্রাটোস্ফিয়ার, ৩. মেজোস্ফিয়ার, ৪. থারমোস্ফিয়ার ও ৫. এক্সোস্ফিয়ার**। পরের পৃষ্ঠার চিত্রে এই স্তরগুলোর ব্যাপ্তি দেখানো হয়েছে। সুতরাং এখানে শুধু সংজ্ঞা দিলেই তো হয়। **ট্রপোস্ফিয়ারে 'আবহাওয়া'**র ক্রিয়া সংঘটিত হয়। **স্ট্রাটোস্ফিয়ারে** কোন মেঘমালা নেই। **মেজোস্ফিয়ারের** বৈশিষ্ট্য হলো, এ স্তরে এসে তাপমাত্রা খুব দ্রুত নিম্নের দিকে নেমে পড়ে। এখানে খুব ঠাণ্ডা। পরবর্তী **থারমোস্ফিয়ারে** তাপমাত্রা উচ্চতার অনুপাতে ক্রমান্বয়ে নিম্নের



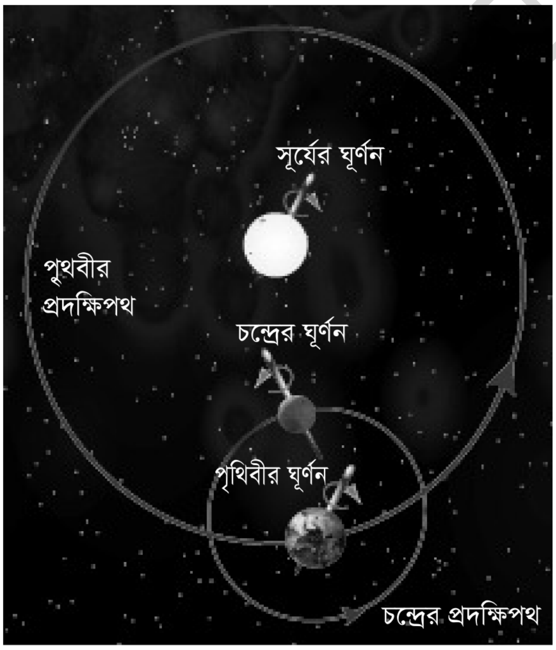
দিকে নেমে আসে। **এক্সোস্ফিয়ার** হলো সর্বশেষ স্তর। এটি ও পূর্বের **থারমোস্ফিয়ার** মিলে একটি স্তর সনাক্ত করা হয়েছে। এর নাম **আয়োনোস্ফিয়ার**। এটাও মূলত চারটি উপ-স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো বাইর মহাকাশ থেকে আগত **তেজস্ক্রিয়ার** মাধ্যমে বস্তুকে **আয়োনাইজ (চার্জকরণ)** করা। ফলে পৃথিবী থেকে প্রেরিত **রেডিও সিগনাল** এসব চার্জকরা কণা থেকে প্রতিবিম্ব হয়ে আবার পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পৌঁছে যেতে পেরে। যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ ও **আয়োনোস্ফিয়ার** ব্যবহার করেই আজকের পৃথিবীর মানুষ ভূপৃষ্ঠের যে কোন এলাকা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত টিভি ও **রেডিও (অডিও-ভিডিও)** সিগনালবিশিষ্ট ছবি ঘরে বসে উপভোগ করছেন। পাশের চিত্রটি দেখুন।

প্রিয় সহযাত্রী নভোমণ্ডলের মুসাফির! পৃথিবীর মহাকাশ থেকে বিদায় হওয়ার পালা এখন। আমাদের মা-গ্রহ সম্পর্কে আর অতিরিক্ত কিছু বলতে যাচ্ছি না। এখানে আমাদের সকলের বাসস্থান। এ গ্রহ সম্পর্কে জানার অনেক পথ ও পাথেয় আছে। আপনি আরো জানতে চাইলে সহজেই তা পারবেন। সুতরাং চলুন, আমাদের গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের নিকট যাই।



পৃথিবীর নেচারেল উপগ্রহ চন্দ্র

গ্রহের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণমান কোন বস্তুকে এই গ্রহের উপগ্রহ বলে। অর্থাৎ উপগ্রহকে গ্রহের মহাকর্ষ **'গ্রেফতার'** করে রাখে। কিন্তু উপগ্রহ গ্রহের উপর পতিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে বেঁচে থাকার কৌশল হিসাবে ধারণ করে একটি কোণিক **'পড়ন্ত'** গতি। এখানে **কৌণিক পড়ন্ত গতি** বলতে ঐ গতিকে বুঝায় যার গতিপথ ঠিক গ্রহের কেন্দ্রের দিকে নয় বরং কিছুটা কৌণিক- মানে বাইরের দিকে। ফলে সে গ্রহের উপর পড়তে



থাকে ঠিকই কিন্তু বাইরের দিকে গতিশীল হওয়ায় না পড়ে ঘুরতে থাকে একটি **কক্ষপথে**।

পৃথিবীর **অকৃত্রিম** একটি মাত্র উপগ্রহ আছে। সেটি চাঁদ। কিন্তু অসংখ্য **কৃত্রিম উপগ্রহ** নিকট মহাকাশে প্রদক্ষিণরত আছে। এগুলো হলো, **যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ (কমিউনিকেশন**



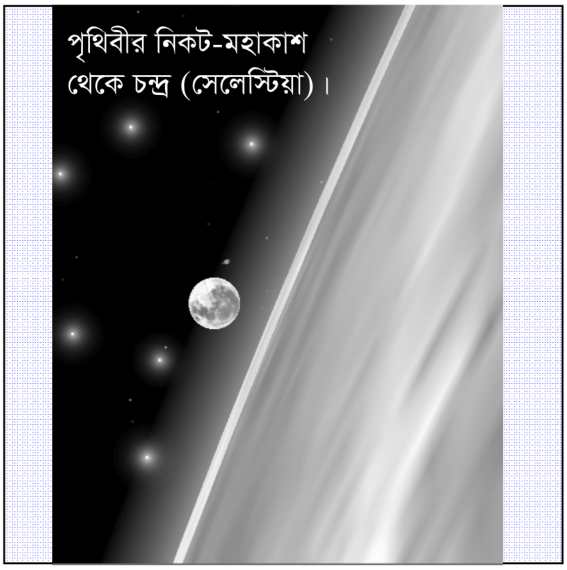
স্যাটেলাইট), আবহাওয়া কৃত্রিম উপগ্রহ, স্পেইস টেলিস্কোপ (যেমন হাবল), স্পেইস স্টেশন (যেমন আইএসএস), এক্সরে টেলিস্কোপ, আর্থ ম্যাপিং স্যাটেলাইট, ন্যাভিগেশন্যাল কৃত্রিম উপগ্রহ, মিলিটারী কৃত্রিম উপগ্রহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি। উপরের চিত্রটি দেখুন।

১৯৫৭ সালে **'স্পুটনিক'** নামক প্রথম স্যাটেলাইট তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফলভাবে প্রেরণ করার পর থেকে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে। সাধারণত যে প্রদক্ষিণপথে এসব যোগাযোগ স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয় তাকে বলে **'জিওস্টেশনারী অরবিট'** (ভূ-স্থিরিকৃত কক্ষপথ)। এর অর্থ হলো পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণন গতি (আহ্নিক গতি) ও উপগ্রহের গতি একই মাত্রায় রেখে মহাকাশে উপগ্রহ স্থাপন। সুতরাং যে কোন ভূ-খণ্ডের উপরে উপগ্রহটি সর্বদা অবস্থান করবে। এতে সুবিধা



হলো ঐ দেশ বা ভূপৃষ্ঠ থেকে **রেডিও-অডিও সিগনাল** সর্বদা প্রেরণ করা যাবে। আর এটা যোগাযোগের জন্য জরুরীও বটে। উপরের চিত্রটি দেখুন।

যাক, উপরে আমরা প্রসঙ্গক্রমে মানবসৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহের উপর কিছু বর্ণনা তুলে ধরেছি। তবে কৃত্রিম উপগ্রহের উপর গবেষণা অত্র গ্রন্থের স্কোপের বাইরে। আমরা একদল ক্ষুদে বিজ্ঞানী মাত্র! একটি কাল্পনিক মহাকাশযানে চড়ে বসেছি। ঘুরে বেড়াচ্ছি সমগ্র সৌরসিস্টেমব্যাপী। আমাদের সহায়ক, একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশন প্রোগ্রাম- **সেলেস্টিয়া**। সুতরাং সেলেস্টিয়ার মাধ্যমেই আমরা এবার পৃথিবীর নিকট-মহাকাশ থেকে চন্দ্রের দিকে চলে যাবো।


পৃথিবীর নিকট-মহাকাশ থেকে চন্দ্র (সেলেস্টিয়া)।

পৃথিবীর নিকট মহাকাশ থেকে আমরা চাঁদের দিকে তাকালাম। নীচের (বায়ের) চিত্রটি দেখুন। সেলেস্টিয়া জানালো এসময় আমরা পৃথিবী থেকে ২৩১১ কিমি উপরে অবস্থান করছিলাম। এই মুহূর্তে (মে ৪, ২০১২, সময়ঃ ৪:১৩ মিনিট) চাঁদটি ৩৬৩৮৫০ কিমি দূরে অবস্থান করছিলো। আমরা দেখতে পেলাম চাঁদটি ধীরে ধীরে ডানের দিকে সরে পড়ছে। কাল বিলম্ব না করে ছুটে চললাম চাঁদের দিকে।


চাঁদের পৃষ্ঠদেশ

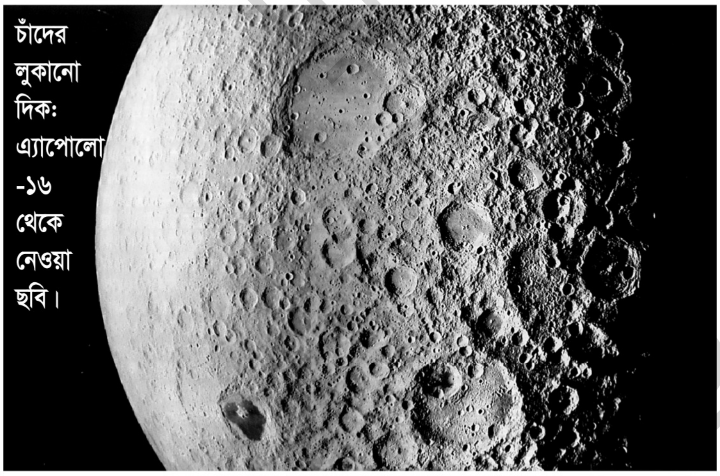
আমাদের চাঁদ

বায়ের ছবিটি চন্দ্রের ৪,০৯০ কিমি (৬৫৮২.২ মাইল) দূর থেকে তোলা। অবশ্য আরো কিছু **‘বাস্তব’** ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে উপরে ও নিম্নে। দূর থেকে চাঁদের ছবি খুব একটা দেখার আগ্রহ বোধহয় আমার সহযাত্রী কারোর নেই। থাকার কথা নয়। সবাই তো এই চাঁদটিকে রাতের আকাশে দেখেছেন। পৃথিবীর জমিনে মায়ের কোলে নবজন্মা শিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যে কোনদিন চাঁদ দেখে নি। তবে এরপরও পৃথিবীর এই অতি সুন্দর চাঁদটি সম্পর্কে আমাদের জানার অনেক কিছু আছে। তাহলে আসুন, যা জানার তা জেনে নিই।

পৃথিবীর নিকট মহাকাশে আমাদের চাঁদটি হলো দ্বিতীয়তম উজ্জ্বল বস্তু। প্রথমটি কি, তা নভোচারী সহযাত্রীকে **‘ধারণা’** করতে আহ্বান


চাঁদের দেশে 'পৃথিবীদোয়' - বস্তব ছবি।

জানাচ্ছি। ইংরেজীতে শব্দটি **'মুন'**। বাংলায় চাঁদ, চন্দ্র, শশি ইত্যাদি। ইংরেজী ও বাংলা অনুরূপ শব্দে ইতোমধ্যে আমরা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের অকৃত্রিম উপগ্রহকেও সম্বোধন করেছি। সুতরাং যেই মুহূর্তে আমরা **'চাঁদ'**, **'চন্দ্র'** ইত্যাদি বলেছি বা বলবো, বুঝতে হবে গ্রহের **নেচারেল উপগ্রহ** বুঝাচ্ছি।


চাঁদের লুকানো দিক: এ্যাপোলো-১৬ থেকে নেওয়া ছবি।

পর্যবেক্ষণ

চাঁদের উপর কালো দাগ কে না দেখেছেন। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বযুগে মানুষ এসব দাগ কিসের, তা নিয়ে নানা কথা ভাবতো। সে যুগ আর নেই। এখন শুধু পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে বিরাট শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে নয়, সশরীরে আমরা চাঁদের উপরে অবতরণ করে এই উপগ্রহ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মহাকাশে পৃথিবীর নিকটতম বস্তু হিসাবে চাঁদ সম্পর্কে জানা ও সেখানে যাওয়া আধুনিক যুগে মহাকাশ অনুসন্ধান প্রতিযোগিতার প্রথম লক্ষ্য হবে, এটাই স্বাভাবিক। ১৯৫৭ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে সফলভাবে প্রেরিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। **'গণতন্ত্রের'** ধারক-বাহক আমেরিকা ও **'সাম্যবাদের'** ধারক-বাহক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে নামে। কে যাবে আগে চাঁদে- এটাই যেনো হয়ে ওঠে দুনিয়ার বুকে কোন্ মতবাদ ঠিকে থাকবে সে প্রশ্নের জবাব- **ডেমোক্রেসি না কমিউনিজম?**

উদ্দেশ্য যাই থাকুক, হোক তা দার্শনিক, রাজনীতিক, সুনাম কুড়ানো বা চন্দ্রকে জয়- এই প্রতিযোগিতা হেতু সত্যিকার অর্থে মহাকাশ অনুসন্ধানের কাজটি দ্রুততর ও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফলে আমরা ইতোমধ্যে যা জানতাম না, তা খুব দ্রুত জানতে সক্ষম হয়েছি এবং হচ্ছি। ভাগ্যিস, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজম ধ্বংস হয়ে গেল! আসলে ঐ যে বলেছি, কে যাবে আগে চাঁদে- এটার উপর নির্ভর করে কার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে? ফলাফল ঠিকই হয়েছে, চাঁদে প্রথম মানব ছিলেন **আমেরিকান (এবং মুসলমান!)**। কমিউনিস্ট রাশিয়া আগে যেতে পারে নি- হেরে গেছে প্রতিযোগিতায়, হারিয়েছে তাদের মতবাদ কমিউনিজমও। যাক, আর পলিটিক্স না। আমরা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা আমাদের মনের খোরাক। সেদিকে ফিরে যাই।

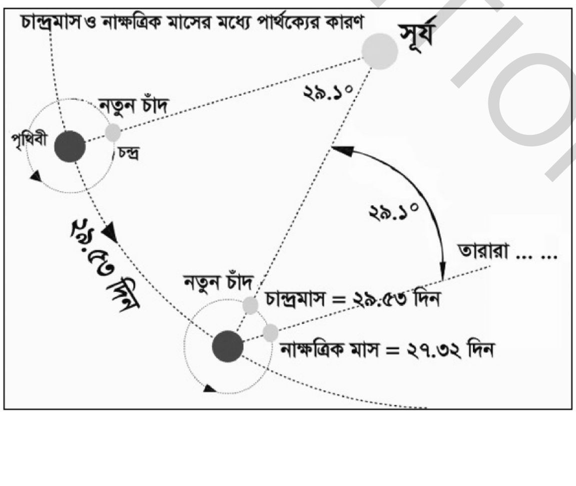


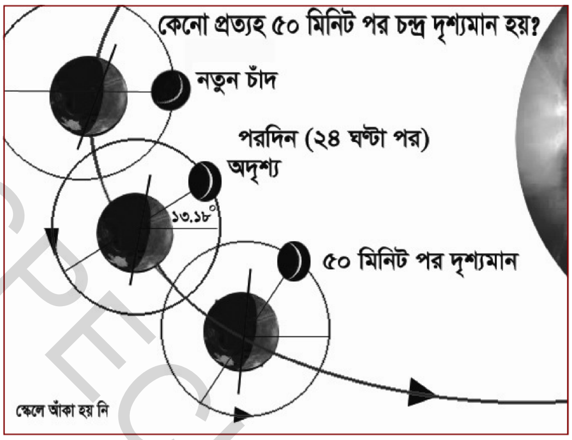
চাঁদের উপর পতন-গর্তের দু'টি ছবি।

চাঁদে মানুষ অবতরণ, এ লক্ষ্যে পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসাবে উভয় সুপারপাওয়ার ১৯৬০-এর দশকে অনেক মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের নিকট-আকাশে ও মাটির উপর প্রেরণ করেছে। এ থেকে চাঁদ সম্পর্কে তথ্যের এক বিরাট স্তুপ অর্জিত হয়েছে। চন্দ্র একটি **জীবনশূন্য, পানিশূন্য, বায়ুমণ্ডলশূন্য পাথর** ও **মাটির তৈরী গোলক**। রাতের আকাশে সে উজ্জ্বল হয় সূর্যের আলো নিজের দেহ থেকে প্রতিবিম্ব করে। তাকে দেখতে বেশ উজ্জ্বল মনে হলেও যে পরিমাণ আলো সে সূর্য থেকে প্রাপ্ত হয় তার মাত্র **১২ শতাংশ প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের পৃথিবীর জমিনে পৌঁছে**। এই প্রতিবিম্বতাকে বলে **'আলবেদো'**। কয়লার গুঁড়োর আলবেদো'র মাত্রাও ঠিক একই পরিমাণ।

চাঁদকে আমরা পৃথিবী থেকে **'দেখার'** ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার আছে যা আমাদের জানা থাকা দরকার। চাঁদের মধ্যে তো নিজস্ব প্রদক্ষিণ গতি আছেই- তার ওপর আমাদের পৃথিবীরও নিজস্ব আহ্নিক-বার্ষিক গতি আছে। ফলে চাঁদটি পৃথিবীর জমিন থেকে দৃশ্যমান কিভাবে হয় সে হিসাব করতে যেয়ে এসব গতি উপেক্ষার সুযোগ নেই। প্রথমতঃ চন্দ্র পৃথিবীকে **'ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে'** প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীও পূর্বদিকে (ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে) ঘূর্ণমান। এছাড়া সূর্যের চতুর্দিকে চাঁদকে নিয়ে সে ঐ ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে ঘুরে- যাকে আমরা বাৎসরিক গতি বলি।

উপরোক্ত সকল গতি মিলিয়ে হিসাব না করা পর্যন্ত কোন্ জায়গা থেকে কিভাবে কোন্ সময় চন্দ্র দৃশ্যমান হবে তা বুঝা যাবে না। পৃথিবীর যে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে চন্দ্রকে প্রত্যহ দেখলে তা দৈনিক ৫০ মিনিট করে দেরীতে দৃশ্যমান হবে। এর মূল কারণ হলো ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র তার কক্ষপথে **১৩.৮ ডিগ্রী অতিরিক্ত ভ্রমণ করে নেয়**। সুতরাং পৃথিবীকে এই অতিরিক্ত **১৩.৮ ডিগ্রী** নিজের মধ্যশলাকার উপর ঘুরে আসতে হবে যাতেকরে চন্দ্রটি দিগন্তে ২৪ ঘণ্টা পর আবার দৃশ্যমান হয়। এছাড়া চান্দ্রমাস ও নাক্ষত্রিক মাসের মধ্যে ২.২ দিনের পার্থক্য বদ্যিমান। পাঠক! কথায় বলতে যেয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছি। নীচের চিত্র দু'টো স্ট্যাডি করলে ব্যাপারটি হয়তো আরো পরিষ্কার হবে।





এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি

পৃথিবীর মহাকাশে চাঁদের গতিমতি এবং তার ওজন ইত্যাদির উপর যেসব সঠিক তথ্যাদি আমরা জেনেছি তার উপর এখন আলোচনা করবো। পরে আমরা অন্যান্য বিষয় যেমন, **চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, চান্দ্রমাস, সৌরবৎসর, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব** ইত্যাদি নিয়ে বিশদ বর্ণনা তুলে ধরবো।

চন্দ্রের ব্যাসার্ধ হলো **১৭৩৮ কিমি (১০৮০ মাইল)**। এ হিসাবে ব্যাস (বৃত্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব) হচ্ছে **৩,৪৭৬ কিমি (২,১৬০ মাইল)**। তার ওজন পৃথিবীর তুলনায় **মাত্র ০.০১২ গুণ**। অর্থাৎ চন্দ্রের বস্তুর পরিমাণ হলো **০.০৭৩ x $১০^{২৪}$ কিগ্রা**। চন্দ্রের মধ্যে বস্তুর ঘনমানও পৃথিবীর তুলনায় কম। যেখানে পৃথিবীর ক্ষেত্রে ঘনমান (ডেনসিটি) হলো **৫,৫১৫ কিগ্রা/কিউবিক মিটার,** সেখানে চাঁদের সংখ্যাটি হলো **৩,৩৪০ কিগ্রা/কিউবিক মিটার**। চন্দ্রের উপর আপনার ওজন হবে মাত্র ৬ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ আপনার ওজন যদি **৭০ কেজি** হয় তাহলে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে আপনার ওজন হবে মাত্র **১১.৬ কেজি!** চন্দ্রে অবতরণ করে **নীল আমস্ট্রং** কেনো পাতলা পাখির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটেছিলেন, তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন! আমরা গ্রন্থের শেষে সৌরজগতের প্রায় সব বস্তুর তথ্য-টেবিল ছাপিয়েছি। সুতরাং এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসব তথ্য পুনরুল্লেখ হচ্ছে।

আমরা ইতোমধ্যে পৃথিবীর উপর আলোচনাকালে উল্লেখ করেছি, **'মহাকাশযান পৃথিবীর'** অন্তত ৬টি গতি আছে। চন্দ্রেরও অনুরূপ গতি ছাড়া- আরো একটি অতিরিক্ত গতি আছে। এই গতিটি হলো তার মা-গ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ গতি। একে আমরা চন্দ্রের বার্ষিক গতি বলতে পারি। কিন্তু তার বার্ষিক গতি বলতে আমাদের হিসাবে মাত্র **২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট**। এটুকু সময়ে সে একবার পৃথিবীর চতুর্দিকে নিজস্ব কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে আসে। চন্দ্রের নিজস্ব দৈনিক বা আহ্নিক গতিও আছে। কিন্তু এটা বার্ষিক গতির সমানই। অন্যকথায় সে পৃথিবীর দিকে একটিমাত্র গোলার্ধ বা মুখ সর্বদা উন্মুক্ত রাখে এবং অপরটি বিপরীত দিকে লুকিয়ে রাখে। মহাকাশ অনুসন্ধানের যুগের পূর্বে কেউ কোনদিন চন্দ্রের ঐ **'লুকানো মুখ'** দেখেন নি। পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া উভয় মুখের ছবিদ্বয় দেখুন।

চাঁদ পৃথিবী থেকে গড়ে **৩,৮৪,৪৪১ কিমি (২,৩৮,৮৮০ মাইল)** দূরে কক্ষপথে থেকে ঘূর্ণমান আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, কক্ষপথে তার গতি **৩,৭০০ কিমি/ঘণ্টা (২,৩০০ মাইল/ঘণ্টা)**। চন্দ্র পৃথিবী থেকে **'সূর্যালোকে দৃশ্যমান'** হওয়ার একটি হিসাব আছে। একে বলে **'চাঁদের কলা'**। ইংরেজীতে বলে **'মুন ফেইজ'**। **হিজরী ক্যালেন্ডার সিস্টেম** এই চাঁদের কলার উপরই নির্ভরশীল। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরই করবো। এখানে এটুকু বলে নিতে পারি, চাঁদের এই ফেইজ মোট **২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে পূর্ণ হয়**। অন্য কথায় **'নতুন চাঁদ'** থেকে পরবর্তী **নতুন চাঁদের** পূর্ব পর্যন্ত গড়ে এটুকু সময় অতিবাহিত হয়।



চাঁদের দৃশ্যমান মুখ



চাঁদের অদৃশ্য মুখ

চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ

অতীতে মানুষ ভাবতো, চন্দ্রের ধূসরবর্ণের অঞ্চল বুঝি **'মহাসাগর'!** কেউ কেউ এসব অঞ্চলকে **'মারিয়া'** অর্থাৎ **সাগর** বলে ডাকা শুরু করেন। এই **মারিয়া** শব্দটি এখনো ব্যবহৃত হয়- তবে ওসব ধূসর অঞ্চলে যে পানির কোন নামগন্ধই নেই, এখন তা সবার জানা।

চঁদের পৃষ্ঠদেশের ধূলোবালিও নড়ে না। তার মধ্যে বাতাস নেই। তবে এটা যে অতীতে ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় ছিলো তার প্রমাণ মিলে। আর এখনো যে, একবারে সম্পূর্ণ প্রাণহীন ও চিরস্থির তার পৃষ্ঠদেশ- তা কিন্তু নয়। তবে এ সর্বাধিক ধীর গতিসম্পন্ন রদবদল মূলত বাইর মহাকাশ থেকে পতিত মিটিওর ও শিলাখণ্ড থেকে সাধিত হয়। চন্দ্রের মধ্যে অসংখ্য পতন-গর্ত (ইম্পেক্ট ক্রেটার) থাকায় এটা সহজেই অনুমেয়, সুদূর অতীতের এক যুগ ছিলো যখন সে **এ্যাস্টারোইড, ধূমকেতু ও মিটিওর** দ্বারা বম্বার্ডমেন্টের শিকার হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রমাণও বিদ্যমান। আগ্নেয়গিরি দ্বারা তার পৃষ্ঠদেশের বড় বড় অঞ্চল **'মডেলিং'** হয়েছে। ইদানিং বিজ্ঞানীরা চাঁদের অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র পরিমাণ বরফের সন্ধানও পেয়েছেন বলে এলান করে সবার মনে চমক দিয়েছেন।

গর্ত

রিগোলিথ নামক মাটি দ্বারা আবৃত অসংখ্য গর্তে পরিপূর্ণ চাঁদের পৃষ্ঠদেশ। গর্ত সৃষ্টির মূল কারণ ছিলো পাতলা ছোট্ট আয়তনবিশিষ্ট উচ্চ গতিসম্পন্ন অসংখ্য মিটিওরাইটের পতন। অতি ক্ষুদ্রকায় থেকে বিরাট আয়তনের গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর মেরুর নিকট **এইটকেন বেসিন** নামক এলাকায় একটি পতন-গর্ত আছে যার ব্যাস **২,৫০০ কিমি (১৫৬০ মাইল)**।

চন্দ্রের উপর পাহাড়-পর্বতও আছে। সর্বাপেক্ষা উঁচু পর্বতাঞ্চলের নাম **'লাইবনিট্জ ও ডয়েরফেল'**। এটাও উত্তর মেরুর নিকটে অবস্থিত। এই রেঞ্জে সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা **৬,১০০ মিটার (২০,০০০ ফুট)**।


চন্দ্রের এক বিরাট পর্বতাঞ্চল। (নাসা)

আগ্নেয়গিরি

চাঁদের দৃশ্যমান অর্ধগোলকের **৪০% অঞ্চলে ‘মারিয়া’** দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হলো ধূসরবর্ণের (অনেকটা কালো) মাটি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, **৩.১৬ বিলিয়ন (৩১৬ কোটি) থেকে ৩.৯৬ বিলিয়ন (৩৯৬ কোটি)** বৎসর পূর্বে আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে অভ্যন্তর থেকে গলিত পাথর লাভা আকারে পৃষ্ঠদেশে আসে। পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন পাথরে রূপান্তর হয়। উচ্চতাপে এসব পাথর কালো রং ধারণ করেছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট শিলার নাম **‘বসোল্ট’**। বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের ওসব পাথর ও পৃথিবীর বসোল্ট নিয়ে গবেষণা দ্বারা উক্ত তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

অভ্যন্তর

চুম্বকীয় ও অন্যান্য মাপ থেকে বুঝা যায় বর্তমানে চন্দ্রের কেন্দ্রটি খুব উত্তপ্ত আছে। সেখানকার তাপমাত্রা **১৬০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (২৯০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট)** পর্যন্ত হবে। এই উচ্চ তাপমাত্রা চন্দ্রের অধিকাংশ শিলা পাথরের গলনাঙ্কের সমান। সুতরাং ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, চন্দ্রের কেন্দ্রে কিছু গলিত তরল পদার্থ থাকতে পারে। তবে এসব পদার্থ গত শত কোটি বৎসরের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে নি। তাই কেন্দ্রে তরল আকারে উচ্চ তাপসম্পন্ন শিলাপাথর থাকার ব্যাপারটি এখনো প্রশ্নবিদ্ধ আছে। বায়ের চিত্রটি দেখুন।



আমাদের চাঁদের অভ্যন্তর

মহাকার্ষিক প্রভাব

নভোচারী সহযাত্রী! আমরা ইতোমধ্যে **‘কক্ষপথ’** ও **‘প্রদক্ষিণ’** সম্পর্কে বেশ কিছু ব্যাপার জেনেছি। এটা আশারাখি আর বলার দরকার নেই যে, চন্দ্রকে পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা **‘ধরে’** রেখেছে। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীকে বাধ্য হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হয়। আর এ কারণেই চন্দ্রকে পৃথিবীর **নেচারেল উপগ্রহ** বলে। তবে

চন্দ্রের নিজেরও মধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। প্লানেটারী বিজ্ঞানের ভাষায়, দু'টি বস্তু তাদের 'barycenter' (বেরিসেন্টার) এর উপর ভিত্তি করে প্রদক্ষিণ করে। অন্যকথায় **উভয় বস্তুর ওজনের কেন্দ্রকে ভিত্তি করে প্রদক্ষিণ করে**। এই বেরিসেন্টার বস্তু থেকে বাইরে মহাকাশেও হতে পারে। যেমন দু'টি তারার মধ্যে যদি ওজনের **(ম্যাসের বা বস্তুর)** পরিমাণে তেমন তারতম্য না হয় তাহলে উভয়ের বেরিসেন্টার তাদের দূরত্বের মাঝপথে মহাকাশে হবে। তারা একে অন্যকে এই পয়েন্টের উপর নির্ভর করে ঘুরতে থাকবে। এরূপ তারাসিস্টেমকে বলে **'বাইনারি' (জোড়া) তারা**। নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য।

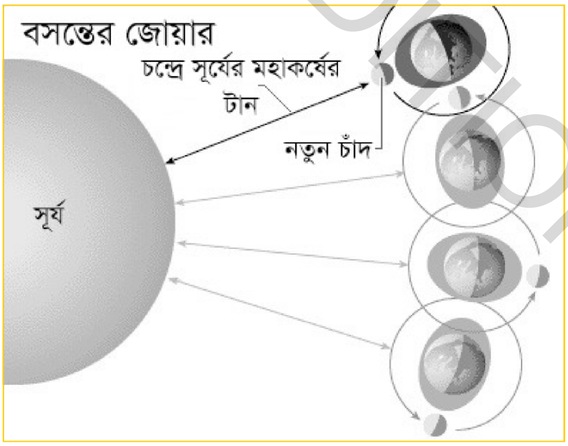


উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা আশারাখি আপনার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, আমাদের চন্দ্র ও পৃথিবীর মোট ওজনের একটি **বেরিসেন্টার** আছে। এই সেন্টারপয়েন্ট পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রে নয়- কিছুটা দূরে। এ কারণেই পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকালে নিজের সঠিক কক্ষপথে না চলে কিছুটা **'কেঁপে কেঁপে'** চলে। চন্দ্রের মহাকর্ষ দ্বারা পৃথিবী প্রভাবান্বিত হওয়ার এটা হলো প্রথম প্রমাণ। অপর আরেক প্রমাণ আমরা সরাসরি দেখে থাকি। এটা হচ্ছে চন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর মহাসাগরে **'জোয়ার ভাটা'**র সৃষ্টি।

সাধারণত **'চান্দ্র তরঙ্গ'** সৃষ্টি হয় প্রত্যেক **'চান্দ্র দিবসে'** দু'বার করে। তবে শুধুমাত্র চাঁদের মহাকর্ষে সাগরের পানি ফুলে ওঠে না। সূর্যের মহাকর্ষের ফলেও পৃথিবীর মহাসাগরের পানিতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। একে বলে **'সৌর তরঙ্গ'**। সূর্য ও চন্দ্রের মহাকার্ষিক টান থেকে প্রতি চান্দ্রমাসেও চার বার **'তরঙ্গের'** সৃষ্টি হয়। নীচের চিত্রে ব্যাপারটি বুঝানো হয়েছে। পাঠকরা একটু ধৈর্যসহ তা স্ট্যাডি করে নিন।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আগেই বলেছি, 'স্পেইস রেইসে'র মূল কারণই ছিলো চন্দ্রে মানুষ অবতরণের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা মূলত বিংশ শতকের ষাটের দশকে তীব্র হয়ে ওঠেছিল। চাঁদে কে আগে যাবে- কে ইতিহাস সৃষ্টি করবে, এটাই ছিলো প্রতিযোগিতার কারণ। কিন্তু চাঁদ তো আর সেদিন আবিষ্কার হয় নি। রাতের আকাশে উজ্জ্বল এই চাঁদ পৃথিবীর জমিনকে সৌরজগতের শুরু থেকেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ফোয়ারা দ্বারা উদ্ভাসিত করে আসছে। সুতরাং চাঁদ নিয়ে গবেষণা আদি যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।

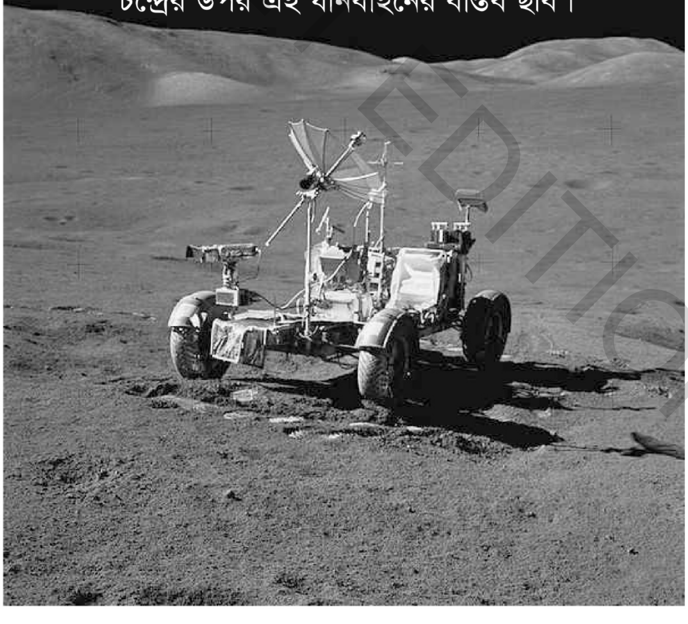


ঈসায়ী উনবিংশ ও বিংশ শতকব্যাপী পৃথিবীতে স্থাপিত শক্তিশালী টেলিস্কোপ দ্বারা প্রথমে চন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা হয়। চাঁদের চিরদৃশ্যমান গোলার্ধের উপর এই গবেষণা দ্বারা অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলেও মানুষ কখনো তা যথেষ্ট ভাবে নি। সশরীরে চন্দ্রে অবতরণ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি মিটছিলো না। বিশেষকরে চিরলুকানো চন্দ্রের অপর গোলার্ধ পৃথিবীর মাটিতে বসে দেখার কোন উপায়ই নেই। কী আছে সেদিকে? দেখতে তা কিরূপ? মানুষের কৌতুহলী মনে এসব প্রশ্ন বার বার উকিঝুঁকি মারতে থাকে। মেরেছে আদি যুগ থেকে।

১৯৫৭ সালে তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম **'কৃত্রিম'** উপগ্রহ মহাকাশে সফলভাবে প্রেরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করলো। এরপর মাত্র ২ বছরের মাথায় অক্টোবর **১৯৫৯** সালে সে-ই আদি যুগ থেকে মানব মনের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশার অবসান ঘটিতে সর্বপ্রথম চাঁদের লুকানো গোলার্ধের ছবি তুলে পাঠালো পৃথিবীতে আরেক রাশিয়ান মহাকাশযান 'moon-3'। দেখা গেল চন্দ্রের অপরদিকে তেমন কোন **'চমক'** লুকানো নেই। বরং তা প্রায় একই ধরনের। দৃশ্যমান গোলার্ধের মতোই তার লুকানো **'মুখশ্রী'**। কিন্তু বড়ো কোন **'মারিয়া' (কালো দাগ)** সেদিকে নেই। এরপর আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত **রেঞ্জার (৭ থেকে ৯)** নামক তিনটি ও **লিউনার অরবিটার (১ থেকে ৫)** নামক পাঁচটি মহাকাশযান চন্দ্রকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে। পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীতে অসংখ্য ছবি। এসব ছবি থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হলো: চন্দ্রের সমগ্র পৃষ্ঠদেশব্যাপী অসংখ্য গর্ত বিদ্যমান। এগুলোকে বলে **ইম্পেক্ট ক্রেটার**। অনুমান করা হলো, ১ মিটার কিংবা বড় আয়তনের অন্তত **৩ ট্রিলিয়ন (১ হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন)** এরূপ ইম্পেক্ট ক্রেটার আছে!

এরপর সফলভাবে একাধিক **'রোবট'** যান চন্দ্রের উপর অবতরণ করে। আমেরিকার রোবটগুলোর নাম ছিলো **'সার্ভেয়ার'** আর রাশিয়ানরা তাদের যানগুলোর নামকরণ করে **'লিউনা'**। এরপর এলো আমেরিকার **'এ্যাপোলো' সিরিজ** ও **১৯৬৯** সালের ঐতিহাসিক মানব চন্দ্রাবতরণ। **এ্যাপোলো সিরিজে (১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭)** সর্বমোট ৬ বার আমেরিকান এ্যাস্ট্রোনট (নভোচারী) চন্দ্রের উপর অবতরণ করেছেন। প্রত্যেকবারই তারা চন্দ্র থেকে **'মুন রক' (চন্দ্রশিলা)** সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। শিলা পাথরের মোট ওজন ছিলো **৩৮৪ কেজি**। **এ্যাপোলো-১৭** মিশনের অংশ হিসাবে একটি **চন্দ্রযান** (মুন রোবার) নিয়ে যাওয়া হয় সাথে করে। এটি দ্বারা চন্দ্রের মাটির উপর দীর্ঘ **৩৫ কিমি (২২ মাইল)** পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এ্যাপোলো'র ক্রু। নীচের ছবিটি দেখুন।

এ্যাপোলে-১৭ মিশনে ব্যবহৃত লিউনার রোবার।
চন্দ্রের উপর এই যানবাহনের বাস্তব ছবি।



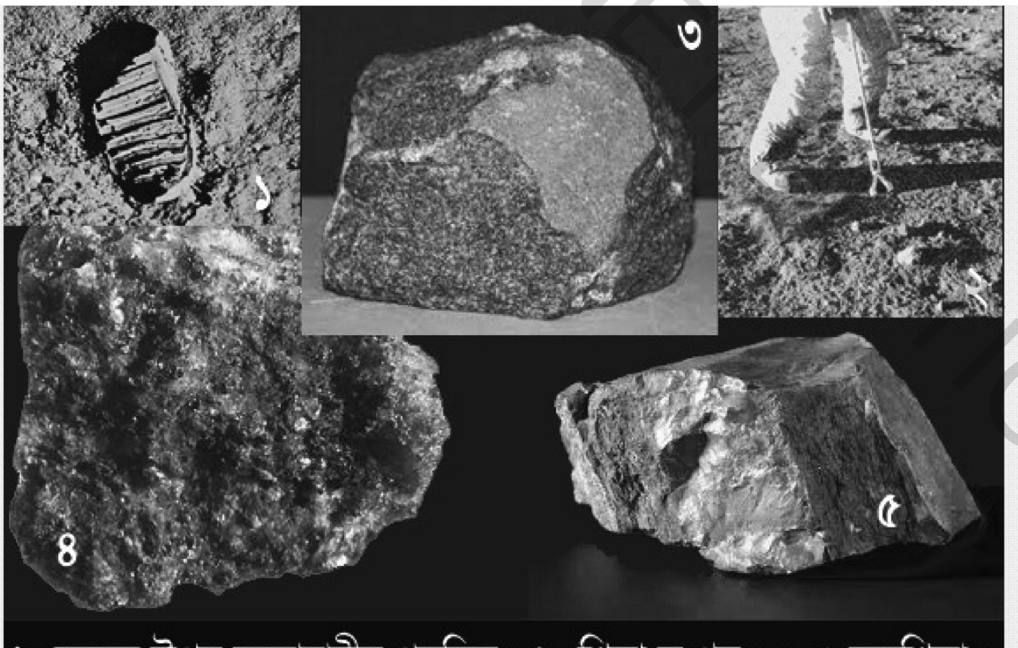
এ্যাপোলো মিশন শেষে চন্দ্রের প্রতি আগ্রহ অনেকটা কমে যায়। তবে ১৯৯৪ সালে **'নাসা'** আবার কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা আমেরিকান প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে মিলে **'ক্লেমেন্টিন'** নামক একটি চন্দ্র উপগ্রহ প্রেরণ করেছেন। ৭১ দিন চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এই মহাকাশযান ম্যাপিংয়ের কাজ সারে। এতে চাঁদ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আবিস্কৃত হয়।

এরপর **'নাসা'** তার নিজস্ব মহাকাশযান **'লিউনার প্রজপেক্টর'** প্রেরণ করে ১৯৯৮ সালে। জুলাই ১৯৯৯ সালে এটা চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করে কিছু তথ্য পাঠায়। চন্দ্রের মহাকার্ষিক ফিল্ড ও তেজস্ক্রিয় বস্তু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা প্রেরণ করে পৃথিবীতে। এছাড়া **লিউনার প্রজপেক্টর স্পেইস ক্রাফ্‌ট** ইচ্ছে করে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে দ্রুত গতিতে পতিত করা হয়। এই **'ক্রাশ'** পতন থেকে উত্থিত ধূলোবালি এবং ধ্বংসাবশেষের উপরও গবেষণা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ইউরোপিয়ান **স্পেইস এজেন্সিও (ESA)** চাঁদের উপর গবেষণার আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো **'স্মার্ট-১'** নামক একটি চন্দ্রযান প্রেরণ করে। স্মার্ট (SMART) শব্দটি আসলে একটি বাক্যের সংক্ষেপকরণ- তাহলো, 'Small Missions for Advanced Research and Technology'। বাংলায় বলা যায়, **উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা ও প্রযুক্তির জন্য ছোট্ট মিশন**। বুঝলেন তো? গবেষণা উচ্চ পর্যায়ের কিন্তু মিশন ছোট্ট! যাক, ২০০৬ ঈসায়ী পর্যন্ত **স্মার্ট-১** তার নির্দিষ্ট কেমিক্যাল **'উচ্চ গবেষণা'** চালিয়ে যায়। স্মার্টকেও বিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করে চন্দ্রের উপর **'ক্রাশ ল্যান্ডিং'** করান।

চন্দ্রগ্রহণ

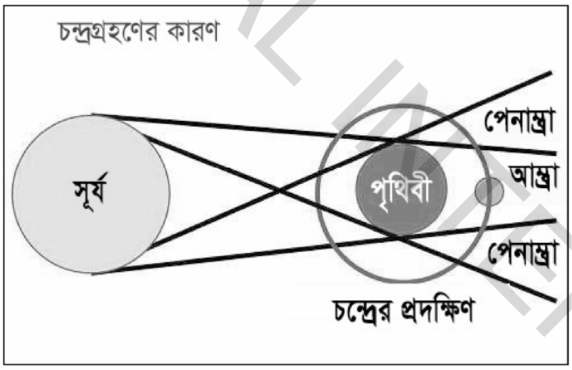
এ পর্যায়ে এসে চাঁদ সম্পর্কে আর কিছু না বলে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। আমাদেরকে আরো দু'টি গ্রহ ও সূর্যের নিকট যেয়ে

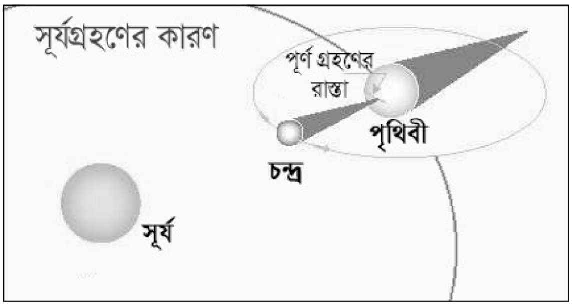


১. চন্দ্রের উপর নভোচারীর পদচিহ্ন। ২. শিলা সংগ্রহ। ৩-৫ চন্দ্রশিলা।

তথ্যানুসন্ধান চালাতে হবে। তবে চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এক দু'টো ব্যাপার এখনো রয়ে গেছে। এসব বিষয় উপেক্ষা করলে আমাদের সফরের উদ্দেশ্যে ত্রুটি থেকে যায়। সুতরাং আমরা ত্রুটিহীন থাকতে যেয়ে **চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসর** এ চারটি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। প্রথমে চন্দ্রগ্রহণ কি তা জেনে নিই।

আদি যুগ থেকে মানুষ দু'টি অত্যাশ্চর্য নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করে আসছেন। এ





দু'টোর নাম **'চন্দ্রগ্রহণ'** ও **'সূর্যগ্রহণ'**। আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দু'টির সঠিক কারণ সবাই জানতেন না। এখন আমরা সুস্পষ্টভাবে উভয় গ্রহণের কারণ জেনেছি। উপরের দু'টি চিত্রে উভয় গ্রহণের কারণ তুলে ধরা হয়েছে। আমার বিশ্বাস জ্ঞানবান সহযাত্রী নভোচারী সকলেই ওসব চিত্র স্ট্যাডি করে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কারণটি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। আসলে ব্যাপারটি খুব সহজবোধ্য।

ইংরেজী 'eclipse' শব্দটির অর্থ হলো, মহাকাশের কোন একটি বস্তু দ্বারা অপর আরেকটি বস্তু ঢেকে ফেলা। এই **'ঢাকা'** আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। এটা ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এই তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে দু'ধরনের গ্রহণ সংগঠিত হয়। এর একটি হলো **চন্দ্রগ্রহণ** আর অপরটি **সূর্যগ্রহণ**।

পূর্ণ ও আংশিক চন্দ্রগ্রহণ: বায়ের **১**ম চিত্রের ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরছি। এ থেকেই চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারটি সবার বোধগম্য হয়ে যাবে। আমাদের পৃথিবী তার কক্ষপথে চন্দ্রকে নিয়ে প্রদক্ষিণরত আছে। চন্দ্রও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। সূর্যের আলোকরশ্মি দ্বারা চন্দ্র ও পৃথিবীর অর্ধগোলক সর্বদা আলোকিত থাকে। সূর্যের আলো স্বভাবতই পৃথিবীর একদিক আলোকিত করলে অপরদিকে দীর্ঘ একটি ছায়ারও সৃষ্টি হয়। এই ছায়াটি মূলত **কৌণিক**। এই **ছায়া-কোণের** মধ্যে যদি কোন বস্তু থাকে তাহলে তা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। মূল ছায়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'umbra' (**আম্ব্রা**) বলে। তবে এই ছায়ার চতুর্দিকে পাতলা আরেক ছায়ার সৃষ্টি হয়- একে বলে 'penumbra' (**পেনাম্ব্রা**)। বাংলায় আমরা প্রথমটিকে **'প্রাথমিক'** ও দ্বিতীয়টিকে **'মাধ্যমিক'** ছায়া বলে সম্বোধন করতে পারি। আপনি একটি বাতির সামনে কোন গোলাকার বস্তু রেখে এই উভয় ছায়ার অস্তিত্ব পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

প্রাথমিক ছায়ার দৈর্ঘ্য হিসাব করে দেখা গেছে **১৩,৭৯,২০০ কিমি (৮,৫৭,০০০ মাইল)** পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্ব হলো **৩,৮৪,৬০০ কিমি (২,৩৯,০০০ মাইল)**। সুতরাং চন্দ্র তার প্রদক্ষিণপথে অনায়াসেই উক্ত **'প্রাথমিক ছায়া'** বা আম্ব্রার মধ্যে প্রবেশ করে আবার বের হয়ে আসে। পুরো

চন্দ্রগোলক যখন আম্ব্রায় প্রবেশ করে তখনই সে পরিপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এভাবে **পৃথিবীর আম্ব্রায় প্রবেশ করাকেই বলে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ**। চন্দ্রটি আম্ব্রা'র সরাসরি কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ গ্রহণ **২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে**। কিন্তু সেন্টার থেকে দূরে থাকলে গ্রহণের সময় অনেক কম হতে পারে- এমনকি কয়েক মিনিটের অধিক হয় না- সময় সময়।



চন্দ্র কক্ষপথে চলতে যেয়ে অনেক সময় আম্ব্রার ভেতর কিছু অংশ মাত্র প্রবেশ করে থাকে। এরূপ গ্রহণকে বলে **আংশিক চন্দ্রগ্রহণ**। আংশিক গ্রহণের ব্যাপ্তি **'প্রায় পূর্ণ'** থেকে **'অত্যল্প আংশিক'** হতে পারে। সব নির্ভর করবে কতটুকু পরিমাণ চন্দ্রগোলক আম্ব্রার ভেতরে প্রবেশ করেছে। সব ধরনের চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়ার **'বৃত্ত'** চন্দ্রের উপর পতিত হতে দেখা যায়। অতীতে বিজ্ঞানীরা এরূপ দৃশ্য থেকে পৃথিবীটা **'গোলকাকার'** হওয়ার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।



চন্দ্রকে উপরে বর্ণিত পেনাম্ব্রায় পূর্ণ অথবা আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময় প্রথমে ও পরে যথাক্রমে প্রবেশ-প্রস্থান করতে হয়। এ উভয় সময় পৃথিবীর দর্শকরা চন্দ্রের আলো অনেকটা কমে যেতে দেখেন। পৃথিবীর **'দিনের'** অংশ থেকেও সময় সময় আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে চাঁদের কিছু অংশকে আলোকিত করতে পারে। সুতরাং পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময়ও চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না-ও হতে পারে। যাক, নভোচারী সহযাত্রী ভাইবোন! আশাকরি পূর্ণ ও আংশিক চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আপনাদের যাকিছু অজানা ছিলো তা জানা হয়ে গেছে। আপনাদের চিন্তার খোরাক হিসাবে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কয়েকটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরলাম।



সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়ে সংগঠিত হয়। কিভাবে হয় তার ড্রইং উপরে দেওয়া হয়েছে। এরপরও সরল ভাষায় বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরছি যাতে এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ বা দ্বিধা না থাকে।

চন্দ্রের আম্ব্রা'র দৈর্ঘ্য **৩,৬৭,০০০ থেকে ৩,৭৯,৮০০ কিমি (২,২৮,০০০ থেকে ২,৩৬,০০০ মাইল)** পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব **৩,৫৭,৩০০ থেকে ৪,০৭,১০০ কিমি (২,২২,০০০ থেকে ২,৫৩,০০০ মাইল)** পর্যন্ত হয়। এখন চন্দ্রের **আম্ব্রা (প্রাথমিক ছায়া)** সর্বদাই সূর্যের বিপরীতে থাকে। চন্দ্র যখন মহাকাশে দিনের বেলা সূর্যের সামন দিয়ে অতিক্রম করে তখন তার আম্ব্রা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে এসে পতিত হতে পারে। সুতরাং পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তখনই সংগঠিত হবে যখন চন্দ্রের এই প্রাথমিক ছায়া পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠদেশে পতিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে পতিত চন্দ্রের আম্ব্রা'র ব্যাস কিন্তু কোন সময়ই **২৬৮.৭ কিলোমিটারের (১৬৭ মাইলের)** অধিক হয় না। সুতরাং এটুকু ব্যাসের বাইরে অবস্থানরত কোন পর্যবেক্ষক সূর্যগ্রহণ দেখতে পারবেন না। এছাড়া বাস্তবে এরূপ পরিপূর্ণ সূর্যগ্রহণ কম হয়ে থাকে। অপরদিকে পৃথিবীতে পতিত চন্দ্রের **পেনাম্ব্রা বা মাধ্যমিক ছায়ার** ব্যাস কখনো **৪,৮২৮ কিমি (৩০০০ মাইল)** এর অধিক হয় না। এই ব্যাসের ভেতর থাকবেন যারা, অন্তত আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখতে পারবেন। চন্দ্র তার কক্ষপথে চলাকালে কোন কোন সময় পৃথিবী থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে। এসময় সূর্যের সামন দিয়ে চলার সময়ও তার ছায়া পৃথিবীতে এসে পৌঁছে না। তবে তাকে সূর্যের বিরাট বৃত্ত পার হয়ে যেতে দেখা যায়। এরূপ সূর্যগ্রহণকে ইংরেজীতে 'annular' গ্রহণ বলে। এ কথাটির অর্থ হলো দেখতে **আঙটির মতো**। এই সূর্যগ্রহণের সময় উজ্জ্বল একটি আঙটি কালো চন্দ্রবৃত্তের চতুর্দিকে দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ বুঝা যায়, সূর্যের উজ্জ্বল বৃত্তের মধ্যে একটি গোলাকার ধূসর বর্ণের গর্ত সৃষ্টি হয়ে তা ধীরে ধীরে একদিক থেকে অপরদিকে চলে যাচ্ছে। নিম্নে আমরা এরূপ একটি **'আঙটি'** সূর্যগ্রহণের ছবি তুলে ধরলাম।



২০ মে ২০১২ সালের 'আঙটি সূর্যগ্রহণ'র ছবি

সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পৃথিবী পূর্বদিকে আহ্নিক গতির ফলে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। সুতরাং চন্দ্রের ছায়ার গতি হবে তার নিজের আহ্নিক গতি বিয়োগ পৃথিবীর আহ্নিক গতি। সুতরাং পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর চন্দ্রের ছায়ার গতির পরিমাণ হবে, **১,৭০৬ কিমি/ঘণ্টা (১০৬০ মাইল/ঘণ্টা)**। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ **৭.৫ ঘণ্টা** পর্যন্ত স্থায়ী থাকতে পারে। এটাই সর্বোচ্চ স্থায়িত্বকাল। কিন্তু এরূপ দীর্ঘস্থায়ী সূর্যগ্রহণ খুব অল্প হয়ে থাকে। কয়েক হাজার বৎসর অন্তর এরূপ গ্রহণ সংঘটিত হয়। বাস্তবে অধিকাংশ

সময় পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণ কোন এক বিশেষ স্থানে ৩ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

চন্দ্রের **আম্ব্রার** বাইরে পতিত **পেনাম্ব্রা**'র অংশে আংশিক সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হয়। এ সময় সূর্য আংশিকভাবে অদৃশ্য হয় মাত্র। এজন্য একে আংশিক সূর্যগ্রহণ বলে। ভবিষ্যতে সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ কবে কোথায় কোন্ স্থান থেকে দৃশ্যমান হবে তার হিসাব করা যায়। নিম্নে আমরা সেলেস্টিয়া দ্বারা হিসাব করা আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের একটি সময় তালিকা প্রকাশ করালাম।

ভবিষ্যৎ চন্দ্রগ্রহণ

(৪ জুন ২০১২ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০২১ ঈসায়ী)

তারিখ	সর্বোচ্চ ফেইজ	ধরন	স্থিতিকাল
৪ জুন, ১২	১১:০৮	পূর্ণ	০০:০৯
২৪ নভে. ১২	১৪:৩৪	আংশিক	০৩:৩০
২৫ এপ্রি. ১৩	২০:১০	পূর্ণ	০০:০৯
২৫ মে, ১৩	০৪:০৬	আংশিক	....
১৮ অক্টো, ১৪	২৩:৪৮	আংশিক	০২:১৯
১৫ এপ্রি. ১৪	০৭:৪৮	পূর্ণ	০২:০১
০৮ অক্টো ১৪	১০:৫৪	পূর্ণ	০০:০১
০৪ এপ্রি. ১৫	০৪:৪৩	পূর্ণ	০০:০৯
২৪ সেপ্টে. ১৫	২৩:২০	পূর্ণ	০০:০২
২৩ মার্চ. ১৬	১১:৫০	আংশিক	০২:৩৫
১৬ সেপ্টে. ১৬	১৮:৫১	আংশিক	০২:৫১
১১ ফেব্রু ১৭	০০:৪৬	আংশিক	০৩:৩১
০৭ আগ. ১৭	০৩:৫৩	পূর্ণ	০০:০৯
৩১ জানু. ১৮	১৩:৩১	পূর্ণ	০০:০৩
২৭ জুলাই ১৮	২০:২১	পূর্ণ	০০:০৪.৬
২১ জানু ১৯	০৫:১০	পূর্ণ	০০:০১.২
১৬ জুলাই ১৯	২১:৩১	পূর্ণ	০০:০০.৯
১০ জানু. ২০	১৯:০৮	আংশিক	০২:৫২
০৫ জুন ২০	১৯:২৮	আংশিক	০১:১৮
০৫ জুলাই ২০	০৪:২৯	আংশিক	০০:৩৩
৩০ নভে. ২০	০৯:৪০	আংশিক	০২:৫৫
২৬ মে ২১	১১:২০	পূর্ণ	০০:০০.৫
১৯ নভে ২১	০৯:০৩	পূর্ণ	০০:০০.৯

ভবিষ্যৎ সূর্যগ্রহণ

(২০ মে ২০১২ থেকে ১ম ডিসে. ২০২১ ঈসায়ী)

তারিখ	শুরু	ধরন	স্থিতিকাল
২০ মে, ১২	২০:৫৮	রিং	০৫:৫১
১৩ নভে. ১২	১৯:৩৯	পূর্ণ	০৫:০৬
৯ মে, ১২	২১:২৬	রিং	০৫:৫৯
৩ নভে, ১৩	১০:০৫	পূর্ণ	০৫:২৩
২৯ এপ্রিল, ১৪	১৯:৩৮	রিং	০৪:১৪
২৩ অক্টো. ১৪	০৩:৫৩	আংশিক	০৪:২২
২০ মার্চ ১৫	০৭:৪২	পূর্ণ	০৪:০৮
১৩ সেপ্টে. ১৬	০৪:৪৩	আংশিক	০৪:২৪
৮ মার্চ ১৬	২৩:২০	পূর্ণ	০৫:১৫
১ সেপ্টে. ১৬	০৬:১৪	রিং	০৫:৪৭
২৬ ফেব্রু. ১৭	১২:১২	রিং	০৫:২৩
২১ আগস্ট, ১৭	১৯:৩৮	পূর্ণ	০৪:১৪
১৫ ফেব্রু. ১৮	০৩:৫৩	আংশিক	০৪:২২
১৩ জুলাই ১৮	০৭:৪২	আংশিক	০৪:০৮
১১ আগস্ট ১৮	০৮:০৪	আংশিক	০৩:২৫
৫ জানু ১৯	২৩:৩৩	আংশিক	০৪:১৭
২ জুলাই ১৯	১৬:৫৫	পূর্ণ	০৪:৫৬
২৬ ডিসে. ১৯	০২:৩০	রিং	০৫:৩৬
২১ জুন ২০	০৩:৪৭	আংশিক	০৫:৪৬
১৪ ডিসে. ২০	১৩:৩৫	আংশিক	০৫:১৭
১০ জানু ২১	০৪:১৫	পূর্ণ	০৪:৫৪
৪ ডিসে. ২১	০৫:৩১	রিং	০৪:০৫

পাঠকদের প্রতি একটা অনুরোধ, সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে কখনো তাকাবেন না। অনেক মানুষ এভাবে তাকিয়ে 'অন্ধ' হয়ে গেছেন। সবশেষে একটি তথ্য প্রকাশ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি। দিনের আকাশেও যে অসংখ্য তারা জ্বলন্ত থাকে তার প্রমাণ মিলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়। আপনি যদি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ স্বচক্ষে দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদান করবেন!

চান্দ্রবৎসর

চান্দ্রবৎসর বলতে কী বুঝায়? চন্দ্রের ব্যাপারে আমরা দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে পারি:

পৃথিবীর কোন্ বিশেষ অঞ্চল থেকে চন্দ্রের দৃশ্যমান কলা বা ফেইজ এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণন। পৃথিবীর কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে চন্দ্রের **২৭.৩২ দিন** সময় লাগে। এটা মহাকাশে দৃশ্যমান তারাদের সঙ্গে তুলনা করে হিসাব করা হয়েছে। অপরদিকে পূর্ণ চাঁদ থেকে পরবর্তী পূর্ণ চাঁদ পর্যন্ত সময় লাগে ২৯.৫ দিন (**আসলে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট**)। এই দু'টি ভিন্ন পিরিওডের কারণ কি? প্রথমটি তারাদের সঙ্গে তুলনীয় তা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়টি আসলে সূর্যের সঙ্গে তুল্য। চন্দ্রের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসার সময়ের ভেতর আমাদের পৃথিবী (ও চন্দ্র) সূর্যের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু পথ ভ্রমণ করে নেয়। ফলে পূর্ণ চাঁদ দৃশ্যমান হতে এই অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হয়। ব্যাপারটি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। ... পৃষ্ঠা দেখুন।

এখন, ১২ মাসে **'বৎসর'** হওয়ার ব্যাপারটি আদি যুগ থেকে মানুষ **'বিশ্বাস'** করে আসছে এবং **ঐশীবাণী দ্বারাও তা অনুমোদিত**। আর মাসের মাত্রা **২৮ থেকে ৩১ দিন** পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। সে হিসাবে **এক চান্দ্রবৎসর = ১২*২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট = (১২*২৯) দিন + (১২*১২) ঘণ্টা + (১২*৪৪) মিনিট = ৩৪৮ দিন + (১৪৪ ঘণ্টা /২৪) দিন + (৫২৮ মিনিট/৬০) ঘণ্টা = (৩৪৮ + ৬) দিন + ৮.৮ ঘণ্টা**। ভালো করে লিখলে তা হয়: **৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট**। সুতরাং সৌরবৎসরের সঙ্গে এখানে বেমিল বিদ্যমান। আমরা একটু পরই দেখতে পাবো যে এক **সৌরবৎসর = ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের কাছাকাছি**। পাঠক লক্ষ্য করুন উভয় বৎসর **২৪ দ্বারা বিভাজ্য নয়**। শত শত বৎসর পর ক্যালেন্ডারের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টির এটাই মৌলিক কারণ। এছাড়া চান্দ্রবৎসর সূর্য-বৎসরের তুলনায় **১১ দিন ৬ ঘণ্টার মতো কম**। এ কারণেই **চান্দ্রবৎসর-নির্ভর ইসলামী হিজরী ক্যালেন্ডার সিস্টেমে** প্রতি বৎসর মুহাররম মাস সূর্যবৎসর-নির্ভরশীল **গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার (ইংরেজী ক্যালেন্ডার)** এর হিসাবে এ পরিমাণ সময় পূর্বে শুরু হয়। অর্থাৎ হিজরী ক্যালেন্ডার ইংরেজী ক্যালেন্ডারকে **'ঘূর্ণন'** করে। প্রতি **৩৩ বৎসরে একবার এই ঘূর্ণন পূর্ণ হয়**।

এখানে আরেকটি **'এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ফ্যাক্ট'** উল্লেখ করার ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীর কোন্ গোলার্ধে আমাদের অবস্থান তার উপর নির্ভর করে কোনদিন কোন্ সময় নতুন চাঁদ (ক্রেসেন্ট মুন) দেখতে পাবো। মনে করুন আজ সন্ধ্যা বেলা মরক্কোতে নতুন চাঁদ দৃশ্যমান হলো। ইতোমধ্যে পূর্ব গোলার্ধের কোন দেশ যেমন বাংলাদেশ, তিন ঘণ্টা আগে হওয়ায় রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। সুতরাং এখান থেকে ঐ নতুন চাঁদ দেখার কোন সুযোগ থাকবে না। কারণ একই সময় মরক্কোর পশ্চিম দিগন্ত ও বাংলাদেশের পশ্চিম দিগন্ত সমান নয়। যে স্থানে চাঁদটি দৃশ্যমান হবে সেটা বাংলাদেশের পর্যবেক্ষকের নিকট এ রাতের জন্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকেই যাবে। নীচের চিত্রটি দেখুন।



গোধুলি ক্ষণে নতুন চাঁদের রেখা পর্বতের পেছনে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা মরক্কোর পশ্চিমাকাশে (চাঁদের বার্ষিক গতির ফলে) চাঁদকে অনেকটা উপরে দেখাবে। একই সময় তার **ক্রেসেন্ট** বা **চাঁদা** অনেকটা বড়ও লাগবে (অর্থাৎ দু'দিনের চাঁদ

মনে হবে)। অপরদিকে তিন ঘণ্টা পরে আগত সন্ধ্যেবেলা **বাংলাদেশের পশ্চিমাকাশে অনেকটা নীচে চাঁদকে নতুন চাঁদ হিসাবে দেখা যাবে**। সুতরাং চাঁদের **'জন্ম'** আগের দিন মরক্কো হয়েছে বলা যেরূপ সত্য, তেমনি পরের দিন বাংলাদেশে **'জন্ম'** নিয়েছে বলাও সত্য। পাঠক হয়তো ভাবছেন, ইসলামী একটি **'ইখতিলাফী'** বিষয় নিয়ে আমি কেনো মন্তব্য করতে ইচ্ছুক হয়েছি। আসলে মোটেই তা নয়। সৌরজগতের একজন সন্ধানী হিসাবে আপনার এটা জানার অধিকার আছে, কোন্ কারণে একই চাঁদের জন্ম পৃথিবীর ভিন্ন অংশে পর্যবেক্ষক হিসাবে অবস্থান করায় একই সঙ্গে দৃশ্যমান না-ও হতে পারে। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এই যা।

সৌরবৎসর

উপরে আমরা চান্দ্রবৎসর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সূর্যের চতুর্দিকে আমাদের পৃথিবী নির্দিষ্ট সময়ে প্রদক্ষিণ করে আসে। এ সত্যটি মধ্যযুগে সবাই মেনে নেওয়ার পর **সৌরবৎসর ভিত্তিক ক্যালেন্ডার** প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন অনেকে।

সুতরাং সৌরবৎসর বলতে কী বুঝায়? এটা বুঝিয়ে বলা চান্দ্রবৎসর বুঝানোর মতো তেমন কঠিন নয়। কারণ সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে ঠিক কতটুকু সময় অতিবাহিত হয় তা সঠিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি। পৃথিবীর প্রদক্ষিণপথ ঠিক বৃত্তাকার নয় বরং ডিম্বাকৃতির। এই কক্ষপথের দূরত্ব অতিক্রম করতে পৃথিবীকে **৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট সময় লাগাতে হয়।** এই সময়টুকুই এক সৌরবৎসর। লক্ষ্য করুন **২৪ ঘণ্টায় ঘূর্ণনকে আহ্নিক গতি বলে**। এই ২৪ সংখ্যা দিয়ে পুরো সৌরবৎসরের দিনগুলো বিভাজ্য না হওয়ায় কয়েক শত বৎসর পর পর তারতম্য ঘটে। এজন্য সৌরবৎসরের মাসগুলো ইচ্ছে করে **২৮ (ফেব্রুয়ারী), ৩০ ও ৩১ দিনে নির্ণীত করা হয়েছে।** এভাবে করার পরও চার বৎসর অন্তর একদিন বেড়ে যায়। সুতরাং ফেব্রুয়ারী মাসকে ক্যালেন্ডার প্রবর্তকরা **৪ বৎসর পর ১ দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন**। আর এই বৎসরের নামকরণ করেছেন **'লিপ ইয়ার' (লাফের বৎসর)**। কোন্ বৎসর লিপ ইয়ার হবে তা নির্ণয়ে বৎসর সংখ্যাটি ৪ দ্বারা ভাগ করে নিন। যদি বিভাজ্য হয় তাহলে ঐ বৎসর লিপ ইয়ার, অন্যথায় নয়। যেমন: **২০১৬/৪ = ৫০৪**, সুতরাং ২০১৬ হবে লিপ ইয়ার (ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে)। আর কোন্ মাস ক'দিনে, কিভাবে জানবেন? অতি সহজ! আমরা ছোট থাকতে একটি কবিতা শিখেছিলাম। এতে ইংরেজী মাস গণনা সহজ হয়ে ওঠে। কবিতাটি জানা না থাকলে- এই তো জানার সুযোগ!

৩০ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর,
সেরূপ এপ্রিল জুন ও নভেম্বর।
২৮ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে,
একদিন বাড়ে তার চতুর্থ বৎসরে।
আর বাকী যতো মাস ৩১ দিনে,
জানিবে ইংরেজী মাস এই রূপে গুণে।

প্রিয় নভোচারী সহযাত্রী ক্ষুদে বিজ্ঞানী ভাইবোনরা! ক্যালেন্ডার সিস্টেমের একটি বৈজ্ঞানিক দিক আছে। সৌরসিস্টেমের সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এ কারণেই বিষয়টির উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা এ প্রসঙ্গে করেছি।

যাক, সৌরভ্রমণের অংশ হিসাবে আমরা পৃথিবী ও তাঁর চন্দ্রের উপর বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এবার বিদায়ের পালা! সূর্যের দিকে আরো দু'টি গ্রহ আছে যাদের উপর তথ্যানুসন্ধান দরকার। প্রথমে চলে যাবো পৃথিবীর **'জময সহোদরা'** হিসাবে খ্যাত শুক্র গ্রহের নিকট।



১০

পৃথিবীর জমজ সহোদরা শুক্র গ্রহের কাছে

শুক্র গ্রহ

সূর্য থেকে বাইরের দিকে দ্বিতীয় গ্রহ হলো শুক্র। এই মুহূর্তে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করেছি। প্রথমে এই মুহূর্তটি কি জেনে নিই: **মে ৭, ২০১২ ঈসায়ীর ভোর ১০:১০ মিনিট**। এখন শুক্রগ্রহ পৃথিবী থেকে **০.৪০৩৫৩ এইউ (৬,০৩,৬৭,২২৯ কিমি - ৩,৭৫,১০,৪৫৭ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে। সূর্যের দূরত্ব **০.৭২২১৩ এইউ (১০,৮০,২৯,১১০ কিমি - ৬,৭১,২৬,১৭৮ মাইল)** এবং চন্দ্র অবস্থান করছে **০.৪০৫৭৫ (৬,০৬,৯৯,৩৩৬ কিমি - ৩,৭৭,১৬,৮১৯ মাইল) এইউ** দূরে। নভোচারী ভাইবোন! এ তথ্যগুলো পেয়েছি সেলেস্টিয়া থেকে। আপনাদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনাকালে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সঠিক অবস্থান জানাচ্ছি। যাক, আমরা এখন পৃথিবীর এই সহোদরা গ্রহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথমেই বলে রাখি পুরো সৌরজগতের মধ্যে শুক্রের মতো **'গরম'** গ্রহ আর নেই। এমনকি সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের চেয়েও শুক্রের পৃষ্ঠদেশ এবং বায়ুমণ্ডল বেশী গরম। পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা এতো বেশী যে, কঠিন শিলাপাথরও লালবর্ণ ধারণ করে। গ্রহকে খুব ঘন উচ্চ চাপ সৃষ্টিকারী একটি **বায়ুমণ্ডল ঘিরে রেখেছে**। শুক্র ও পৃথিবীর আয়তন প্রায় সমান। একে পৃথিবীর **'টুইন সিস্টার'** এজন্যই বলে। কিন্তু এ কথাটি আসলে রোমাঞ্চকর উক্তি বৈ নয়। কারণ শুক্র গ্রহের আয়তন পৃথিবীর প্রায় সমপরিমাণ- এই



পৃথিবীর নিকট মহাকাশ থেকে শুক্রগ্রহ

যা। বাদবাকী সবই ভিন্ন। যেমন তার একদিন (আহ্নিক গতি) **আমাদের ২৪৩ দিন!** সে ঘুরেও বিপরীত দিকে। তার না আছে কোন চন্দ্র কিংবা চুম্বকীয় ফিল্ড। আরো অনেক দিক থেকে শুক্র আমাদের গ্রহ থেকে ভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এখনও ধরতে পারেন নি, কোন্ কারণে উভয় গ্রহের মধ্যে এতো পার্থক্য?

শুক্র সূর্য থেকে গড়ে **১০,৮০,০০,০০০ কিমি (৬,৭০,০০,০০০ মাইল)** দূরে অবস্থান করে প্রতি ২২৪.৭ পৃথিবী দিবসে একবার কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত আছে। রাতের আকাশে চন্দ্রের পর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বস্তু হলো শুক্র গ্রহ। আদি যুগ থেকে মানুষ একে **'ভোরের তারা'** ও **'সন্ধ্যে তারা'** হিসাবে সম্বোধন করে আসছেন। সে পৃথিবীর এই উভয় অবস্থানে দেখা দেয়। শুক্র গ্রহের ব্যাসার্ধ হলো **৬,০৫২ কিমি (৩,৭৬১ মাইল)**। শুক্র পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। যখন সে পৃথিবীর কাছে, তখন তার দূরত্ব মাত্র **৪,১০,০০,০০০ কিমি (২,৫৪,০০,০০০ মাইল)** হয়।

পর্যবেক্ষণ

পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে শুক্রের দিকে তাকালে মনে হবে, চন্দ্রের কলা বা ফেইজের মতো সে নিজেকে প্রদর্শিত করছে। এরূপ দেখার কারণ হলো সে পৃথিবী থেকেও নিকট-কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী যে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত, তারও এক প্রমাণ এটা। কারণ পৃথিবী স্থির থাকলে বুধের পৃষ্ঠদেশ সূর্যের আলো দ্বারা এভাবে পরিবর্তনশীল দেখাতো না। যাক, সে আরেক কথা।

আমরা যখন পৃথিবীর উপর থেকে কোন বস্তু সূর্যের বৃত্ত অতিক্রম করে যেতে দেখি- তখন একে বলে **'ট্রানজিট'**। কোন গ্রহ যদি এভাবে অতিক্রম করে দেখা যায় তাহলে ঐ গ্রহের নামে ট্রানজিটের নামও হবে। যেমন **'মারকারি ট্রানজিট'** বা **'ভিনাস ট্রানজিট'**। আমরা বাংলায় বলতে পারি, **'বুধ পরিক্রমণ'** ও **'শুক্র পরিক্রমণ'**। শেষোক্ত পরিক্রমণ খুব কম হয়। এ পরিক্রমণ শতাধিক বৎসর পর পর **জোড়ায় জোড়ায় হয়ে থাকে**। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে (২০০৪ সালে) একটি **ভিনাস ট্রানজিট** জোড়া সংঘটিত হয়েছে। এ জোড়ার **পরবর্তীটি ২০১২ সালে সংঘটিত হয়** (নীচের চিত্রগুলো দেখুন)। পরবর্তী জোড়ার সময় পৃথিবীর বুকে বর্তমানে জীবিত কেউ আর তা দেখার সুযোগ পাবেন বলে মনে হয় না। পরবর্তী ট্রানজিট জোড়া যথাক্রমে **২১১৭ ও ২১২৫ ঈসায়ী সনে ঘটবে**। মোটকথা এখন জন্ম-নেওয়া শিশু শতাধিক বৎসর জীবিত না থাকলে [সঠিক কথা হলো, বয়স হতে হবে ১১৪ বৎসর!) পরবর্তী ভিনাস ট্রানজিট দেখা তার ভাগ্যে জুটবে না।





শুক্র গ্রহের উপর কাছে থেকে তথ্যানুসন্ধান হয়েছে। তার গাঢ় মেঘমালা দূর থেকে পৃষ্ঠদেশকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা তাকে সত্যিকার অর্থে জানার উপায় হিসাবে মহাকাশযান প্রেরণের বিকল্প কিছু পান নি। ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত মহাকাশযানের নাম ছিলো 'Mariner-2'। এরপর **মারিনার-৫ (১৯৬৭ সনে) ও মারিনার -১০ (১৯৭৪ সালে)** প্রেরণ করা হয়। এ তিনটি যান শুক্রের নিকট মহাকাশে যায় ও অনেক ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। এ ক্রাফ্টগুলো শুধুমাত্র কাছ ঘেষে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিল।

শুক্র অনুসন্ধানে প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এ সময়ের ভেতর 'Venera' নামক মোট ১৩টি মহাকাশযান প্রেরণ করে শুক্রের দিকে। এদের মধ্যে কয়েকটি শুক্রের কাছ ঘেষে উড়ে যায় এবং বাকীগুলো গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। এরপর ১৯৮৪ সালে তারা **ভেগা-১** এবং **ভেগা-২** নামক দু'টি মহাকাশযান প্রেরণ করেন **'হ্যালিজ কমেট' (ধূমকেতু)** নিকট থেকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে উভয় ক্রাফ্ট শুক্রের কাছ ঘেষে যায় ও ছবিসহ কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রেরণ করে। ক্রাফ্ট থেকে একাধিক **'অবতরণ ক্যাপসুল'** গ্রহের পৃষ্ঠদেশে ফেলা হয়। এদের অধিকাংশই সফলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে অনেক ডাটা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। অবশ্য কয়েক ঘণ্টার ভেতরই তাদের কার্যক্রম রহিত হয়ে যায়। এর কারণ ছিলো গ্রহের পৃষ্ঠদেশের উচ্চ তাপমাত্রা।

আমেরিকার **'নাসা' পাইওনিয়ার ভিনাস মিশন-১ ও ২** প্রেরণ করে ১৯৭৮ সালে। দ্বিতীয় মহাকাশযান থেকে চারটি প্রোব (অবতরণযান) সফলভাবে শুক্রের উপর পাঠানো হয়। প্রথম মহাকাশযান শুক্রের নিকট মহাকাশে দীর্ঘ ১৪ বৎসর পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে অনেক তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ১৯৮৯ সালে আমেরিকা **'ম্যাজেলান'** নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ শুক্র গ্রহে প্রেরণ করে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এটি সক্রিয় ছিলো। সে শুক্রগ্রহের **'রাডার'** চিত্র তুলে প্রেরণ করে। নীচের ছবিটি দেখুন।



শুক্রকে সময় সময় অন্যত্র প্রেরিত মিশনের ক্রাফ্টকে গতিশীল করার লক্ষ্যে **'ফ্লাইবাই'** গ্রহ হিসাবেও বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন। যেমন বৃহস্পতি গ্রহে প্রেরিত **'গ্যালিলিও মিশন' (শুক্র-ফ্লাইবাই, ১৯৯০)** ও শনি গ্রহে প্রেরিত **'কাসিনি মিশন' (শুক্র-ফ্লাইবাই, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯) ইত্যাদি**। উভয় ক্ষেত্রে স্পেইস ক্রাফ্টকে শুক্রের কাছঘেষে নেওয়ার কারণ ছিলো **'গ্রাভিটি এসিস্ট' (মহাকর্ষ-সাহায্য)** সম্পাদন। শুক্রের মহাকর্ষ ব্যবহার করে ক্রাফ্টকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে আরো বেশী গতিশীল করা হয়। **'নাসা'**র প্রেরিত অপর একটি ক্রাফ্ট **'মেসেঞ্জার'**কে শুক্র-ফ্লাইবাই করানো হয় গতিরোধের উদ্দেশ্যে। ফলে ২০১১ সালের দিকে মেসেঞ্জার সফলভাবে বুধের নিকট-মহাকাশে পৌঁছে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা শুরু করে।

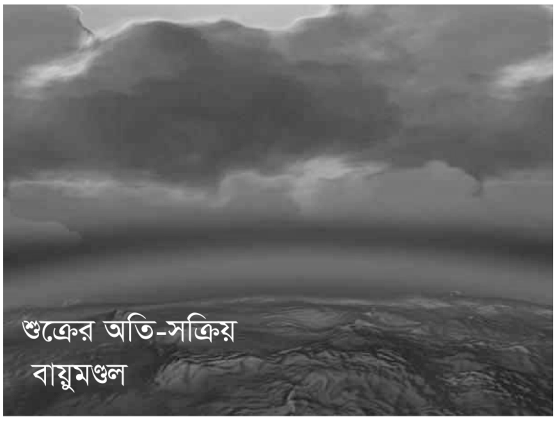
ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি (ইএসএ) ভিনাস এক্সপ্রেস নামক একটি মিশন প্রেরণ করে ২০০৫ সালে। এক বৎসর পর এটি গন্তব্যে পৌঁছে প্রদক্ষিণ শুরু করে। ভবিষ্যতে আরো শুক্র-মিশন প্ল্যান ড্রইং বোর্ডে অঙ্কিত হয়ে গেছে। সুতরাং অত্যন্ত সক্রিয় এই গ্রহটি সম্পর্কে আমরা আরো অনেককিছু জানবো, নিঃসন্দেহে।


ভিনাস এক্সপ্রেস মহাকাশযান

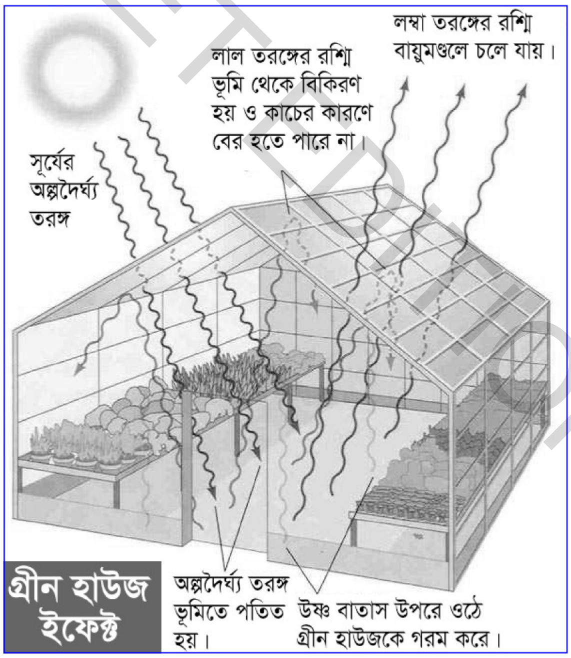
প্রিয় পাঠক! অত্যন্ত নির্মম পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে শুক্র তার পৃষ্ঠদেশে। সেখানে কোন মানব মিশন অদূর ভবিষ্যতে তো আদৌ সম্ভব নয়ই, বরং কোন কালেই হয়তো সম্ভব হবে না। আজ পর্যন্ত কেউ মানব প্রেরণের প্ল্যানও করেন নি। যাক, গ্রহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তার উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক।

বায়ুমণ্ডল

শুক্র পৃথিবীর তুলনায় **৩০ শতাংশ সূর্যের কাছে**। সে পৃথিবীর তুলনায় **দ্বিগুণ সূর্যের এনার্জি লাভ করে**। কিন্তু তার গাঢ় মেঘপূর্ণ বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে প্রাপ্ত এনার্জির **৭৬ শতাংশ মহাকাশে প্রতিবিম্ব করে পুনরায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়**। বাকী **৩০ শতাংশের ২০ শতাংশই মেঘমালা চুষে ফেলে। মাত্র ১০ ভাগ এনার্জি পৃষ্ঠদেশে যেয়ে পৌঁছে**। কিন্তু একটি স্ববিরোধী কথা শুনুন, সূর্য


শুক্রের অতি-সক্রিয় বায়ুমণ্ডল

থেকে প্রাপ্ত মোট এনার্জির মাত্র **১০% গ্রহের পৃষ্ঠদেশ** পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে। অথচ সমগ্র সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহের তুলনায় শুক্র গ্রহের পৃষ্ঠদেশ বা সারফেস সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? জবাব, তার গাঢ় বায়ুমণ্ডল ও **গ্রীন হাউজ ইফেক্ট**। অন্য কথায়, বায়ুমণ্ডলের ঘন মেঘমালা পৃষ্ঠদেশে পতিত সৌর এনার্জিকে **'ধরে'** রাখে- মহাকাশে ফিরে যেতে দেয় না। এই ক্রিয়ার নামই **গ্রীন হাউজ ইফেক্ট**। পৃথিবীর বুকে কাচের তৈরী কক্ষের ভেতর একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে কক্ষের অভ্যন্তর বাইর থেকে অনেকটা বেশী উত্তপ্ত থাকে। **গ্রীন হাউজ ইফেক্ট** কাজে



গ্রীন হাউজ ইফেক্ট



লাগিয়ে ঠাণ্ডা দেশে ফলন হয় না, এমন গরম দেশের বৃক্ষরাজিও ফলানো যায়।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রায় **৯৭ শতাংশ বস্তুই হলো কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস**। পৃথিবীর তুলনায় বায়ুমণ্ডলের চাপ **৯৬ গুণ বেশী**। পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা সব জায়গায়ই প্রায় সমান। এর মাত্রাও খুব বেশী: **৪৬২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৭৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট)** পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই উচ্চ তাপমাত্রা **সীসার গলনাঙ্ক থেকে বেশী**। আমাদের পৃথিবীর উপর গড় তাপমাত্রা মাত্র **১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৫৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট)**। ভেবে দেখুন, গ্রীন হাউজ ইফেক্ট কী শক্তিশালী ক্রিয়া ঘটাচ্ছে শুক্র গ্রহের উপর।

যে **গ্যাস গ্রীন হাউজ ইফেক্টকে** বেশী সক্রিয় করে তার নাম **কার্বন ডাইওক্সাইড**। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, এই গ্যাসটিই মূলত শুক্রের বায়ুমণ্ডল। এখন বুঝাই যাচ্ছে, কোন্ কারণে গ্রহের পৃষ্ঠদেশ এই ইফেক্ট থেকে এতো বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের পৃথিবীর উপর এই **'সবুজকক্ষ ক্রিয়া'** প্রতিনিয়ত ঘটছে- কিন্তু কার্বন ডাইওক্সাইডের মাত্রা মাত্র **০.০৩৫ পার্সেন্ট** হওয়ায় পৃথিবীর জমিন তেমন গরম হয় না। কৃত্রিম উপায়ে এই গ্যাস ইদানিং বেশী তৈরী হচ্ছে। ফলে **গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রক্রিয়া** বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুখের বিষয়, এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে ইতোমধ্যে। সবাই বিহিত ব্যবস্থা নিতেও সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা অনেকেই হয়তো অবগত নয়, কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অতি অল্পমাত্রায় থাকলেও পৃথিবীর মাটির অভ্যন্তরে এর অভাব নেই! কিন্তু ভাগ্যিস! তা গ্যাস আকারে নয়- বরং **লাইমস্টোনে (চুনাপাথরে)** অস্তিত্বশীল আছে। এভাবে রক্ষিত কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের মাত্রার প্রায় সমান হবে।

শুক্রের **৩ শতাংশ বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন গ্যাসের তৈরী**। অপরদিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে

প্রায় **৭৮ শতাংশ গ্যাস হলো এই নাইট্রোজেন**। ঠিক কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলেও অনুরূপ পরিমাণ এ গ্যাস বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব অনেক বেশী তাই এর প্রতিক্রিয়া সেখানে ভিন্ন। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে পানি নেই বললেই চলে। অবশ্য পৃষ্ঠদেশের উচ্চ তাপমাত্রায় পানি এমনিতেই তরল আকারে থাকার তো কথাই নেই। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প আকারেও পানির কোন অস্তিত্ব মিলে নি। বিজ্ঞানীরা এর কারণ এখনও সঠিকভাবে জানতে পারেন নি। সম্ভবত ঐ গ্রীন হাউজ ইফেক্টই মূল কারণ হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, শুরুতেই গ্রহের মধ্যে অত্যল্প পানি ছিলো।



ম্যাজেলান ক্রাফ্‌ট থেকে প্রাপ্ত শুক্রের একটি ছবি

শুক্রের মেঘমালার অধিকাংশ উচ্চ ঘনাঙ্কবিশিষ্ট **'সালফারিক এডিস'** দ্বারা সৃষ্ট। পৃথিবীর **'স্টাটোস্ফিয়ার'**-এ সামান্য পরিমাণ এই বস্তু পাওয়া যায়। তা-ও বৃষ্টির সঙ্গে মিশে ভূমিতে পতিত হয় এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে বিভিন্ন বস্তুর সাথে। শুক্র গ্রহে পৃষ্ঠদেশ থেকে **৫০ কিমি (৩১ মাইল)** উর্ধ্বে স্থাপিত মেঘমালার বেইজে এই এসিড শুকিয়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডলেই গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করে। তবে মেঘমালার সর্বোচ্চ উচ্চতা **৭০ থেকে ৮০ কিমি (৪৪ থেকে ৫০ মাইল)** পর্যন্ত পৌঁছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে **পাইওনিয়ার ভিনাস-১ স্পেইস শীপ** এবং **পৃথিবী-কেন্দ্রিক** পর্যবেক্ষণ থেকে।

আবহাওয়া সম্পর্কে আরো জানা গেছে, বায়ুমণ্ডলের উপরস্থ লেবেলে ৩৬০ কিমি (২২৫ মাইল) বেগসম্পন্ন মেঘমালা সমগ্র গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। একবার প্রদক্ষিণ করতে মাত্র চারদিন সময় লাগে। এ গতি গ্রহের আহ্নিক গতি থেকেও দ্রুততর। অপরদিকে নিম্নতম মেঘমালায় বাতাসের গতি মাত্র ৩ থেকে ১৮ কিমি/ঘণ্টা (২ থেকে ১১ মাইল/ঘণ্টা)। পৃষ্ঠদেশ থেকে উর্ধ্বে ১০ কিমি (৬ মাইল) পর্যন্ত মেঘমালাকে আমরা এই স্তরের মেঘমালা বলছি। গ্রহের উপরে পতনশীল কৃত্রিম **প্রোব** থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এসব প্রোব আরও প্রমাণ করেছে, গ্রহের উভয় মেরুতে **'ডবল ঘূর্ণাবত'** সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো মূলত বিরাট আয়তনবিশিষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের মতো কাঠামো। এদের ঘূর্ণন গতি খুব উঁচু।

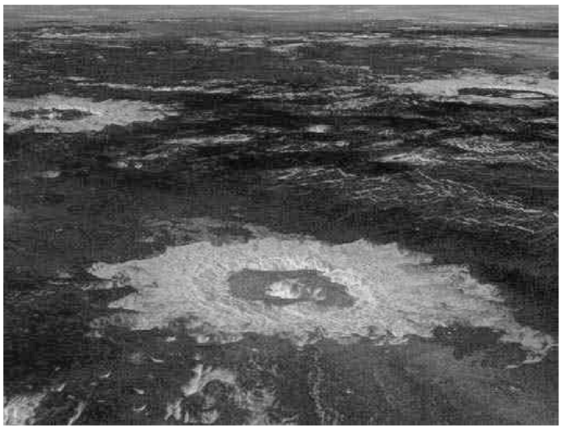
আমেরিকান মহাকাশযান পাইওনিয়ার **ভিনাস-১** শুক্র গ্রহের উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল ও আয়োনোস্ফিয়ার সম্পর্কে অনেক ডাটা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। গবেষণা দ্বারা জানা গেছে, যেখানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনুরূপ স্তর অনেক উত্তপ্ত, সেখানে শুক্রের ক্ষেত্রে তার বিপরীত কথাই যথার্থ। অনেকে অবাক হয়েছেন এটুকু সত্য জেনে যে, রাতের আকাশের দিকে গ্রহের ওসব স্তর দিনের দিকের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ঠাণ্ডা। যেখানে রাতের দিকের তাপমাত্রা কোনমতেও -১৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের (-২৭৪ ডিগ্রী ফারেনহাইটের) বেশী হয় না, সেখানে দিনের দিকের তাপমাত্রা +৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (+১০৪ ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। প্রথমে বিজ্ঞানীরা এই বিরাট তারতম্য বিশ্বাস করেন নি- কিন্তু মহাকাশযান বার বার অনুরূপ ডাটা প্রেরণ করেছে। কিছুটা তো বেশকম হবারই। এতো বেশী কেন হয় তা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি।

গ্রহের জমিন

শুক্রগ্রহ অভ্যন্তরীণ চারটি **'মাটির গ্রহের'** একটি। বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি গ্রহটিকে বিজ্ঞানীরা **'পৃথিবীর যমজ সহোদরা'** বলে থাকেন। এর কয়েকটি কারণ আছে। এটি পৃথিবী থেকে সামান্য মাত্র ছোট্ট। তার ঘনাঙ্ক (বস্তুর ডেনসিটি) **৫.২ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার**। গ্রহের পৃষ্ঠদেশের মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় **১০ ভাগের ৯ ভাগ**। অর্থাৎ যে বস্তু পৃথিবীর উপর **১০ কেজি**, তা শুক্রের ওপর ৯ কেজি ওজনবিশিষ্ট হবে। পৃথিবীর শক্ত শুষ্ক মাটির মতো শুক্রের ক্রাস্টও শক্ত উত্তপ্ত মাটির তৈরী। তবে যেসব ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়া থেকে উভয় গ্রহের পৃষ্ঠদেশ **'মডেলিং'** হয়েছে তা ভিন্ন। গাঢ় বায়ুমণ্ডল থাকায় নিকট মহাকাশ থেকেও পৃষ্ঠদেশের উপর গভীর গবেষণা সম্ভব নয়। প্রেরিত সকল অবতরণযানও কিছু সময় পর অকেজো হয়ে যায় উচ্চ তাপমাত্রার ফলে। সুতরাং রাডার ও ইনফ্রারেড ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে আমরা গ্রহের জমিনের উপর গবেষণা করতে হচ্ছে।



গবেষণার প্রাথমিক যুগে পৃথিবী-কেন্দ্রিক সিস্টেম দ্বারা গ্রহের **'রাডার ম্যাপিং'** করা হয়েছিল। এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল গতিবিধির ফলে শুক্র সর্বদাই তার একটি মাত্র মুখ আমাদের দিকে উন্মোচন রাখে, যখন সে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান করে। সুতরাং পৃথিবীকেন্দ্রিক রাডার গবেষণা এই একটি মাত্র গোলার্ধের উপর পরিচালনা সম্ভব।



বর্ণিত উপায়ে পৃথিবীর উপর স্থাপিত বেশ বড় ও শক্তিশালী অ্যান্টিনা ব্যবহারের মাধ্যমে আংশিক ম্যাপিং সম্ভব। অপরদিকে **পাইওনিয়ার ভিনাস-১** মহাকাশযানে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রকায় একটি রাডার অ্যান্টিনা ছিল। এটি দ্বারা পুরো গ্রহের ম্যাপিং করা হয়েছে এবং তা ছিলো অনেক উন্নতমানেরও। **মেজেলান** নামক আরেক মহাকাশযানও অনুরূপ ম্যাপিং করে। এই তিনটি ম্যাপিং এর উপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন গ্রহের পৃষ্ঠদেশের স্বরূপ কি হতে পারে। উপরের চিত্রে গ্রহের উপরিভাগের একটি কাল্পনিক ছবি তুলে ধরেছি, যা এই গবেষণার ফলাফল।

মেজেলান সার্ভে থেকে স্পষ্ট হয়েছে, শুক্রের উপর বিরাট আয়তনবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি, বড় মাপের লাভা প্রবহমান হওয়ার নিদর্শন এবং হ্যাঁ, অসংখ্য মিটিওরাইট পতন-গর্ত বিদ্যমান। একটি পতন-গর্ত আছে যার আয়তন **৩০০ কিমি (১৯০ মাইল)** বলে নিশ্চিত জানা গেছে। তবে ছোট্ট সাইজের গর্তেরও অভাব নেই। বিশ্বাস করা হয় গ্রহের খুব গাঢ় বায়ুমণ্ডল বেশী ছোট্ট আয়তনের মিটিওরাইট পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না- আগেই জ্বালিয়ে খতম করে। আরো ধারণা করা হয়, গত **৫০ কোটি বৎসর** পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত যতো ইম্পেক্ট হয়েছে, শুধু ওগুলোই এখন পর্যন্ত


'ম্যাট মন্‌স' নামক শুক্রের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি পর্বত। (ইন্টারনেট)


শুক্রের একটি রাডার চিত্র


শুক্রের আরেকটি রাডার চিত্র

দৃশ্যমান আছে। এর পূর্বের গর্তগুলো মাটি দ্বারা আবৃত হয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। এটা একটি থিওরী। এ নিয়ে বেশী বলার দরকার নেই। কিছুদিন পর তা বদলে যেতে পারে। আর সুদূর ভবিষ্যতে যে বদলাবে তা প্রায় নিশ্চিত। সুতরাং থিওরী নিয়ে বেশী বলে কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন কি?

নভোচারী সহযাত্রী! সূর্য থেকে বাইরের দিকে দ্বিতীয় এবং পৃথিবীর ভেতরের দিকের পড়শী শুক্র গ্রহের নিকট-মহাকাশ ছেড়ে চলে যাবার সময় এসে গেছে। আমাদেরকে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ এবং সবশেষে স্বয়ং সূর্যের কাছে যেয়ে তথ্যানুসন্ধান চালাতে হবে। অবশ্য সাধারণত মানুষের জন্য চরমভাবে অনুপযোগী এবং অবাস্তব অবতরণক্ষেত্র এসব অঞ্চল। কিন্তু আমাদের চিন্তা নেই, আমরা তো 'কল্পনার' যানে ছুটি চলছি সৌরজগৎব্যাপী! সেলেস্টিয়া কম্পিউটার প্রোগ্রাম তথ্য ও ছবি প্রদান করে আমাদেরকে এই 'বাস্তব' সদৃশ ভ্রমণে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সহযাত্রী


পৃথিবীর সহোদরা শুক্র ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে আরেকবার ফিরে তাকানোর দৃশ্য। কী সুন্দর দেখাচ্ছে শুক্র গ্রহকে!

নভোচারীদের প্রতি অনুরোধ রইলো, আগামীতে অনুরূপ ভ্রমণে তারায় তারায় আমার সাথী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আমি আশাবাদী, অচিরেই এরূপ একটি সন্ধানী ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করবো। তবে আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া কিছুই হবে না। যাক, চলুন এবার। আর দেরী নেই। আমরা প্রথমে শুক্রের নিকট থেকে বুধের দিকে আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেবো।



বুধের একাংশ 'মেসেঞ্জার' থেকে নেওয়া ছবি

১১

সূর্যের নিকটস্থ প্রথম গ্রহ বুধের কাছে

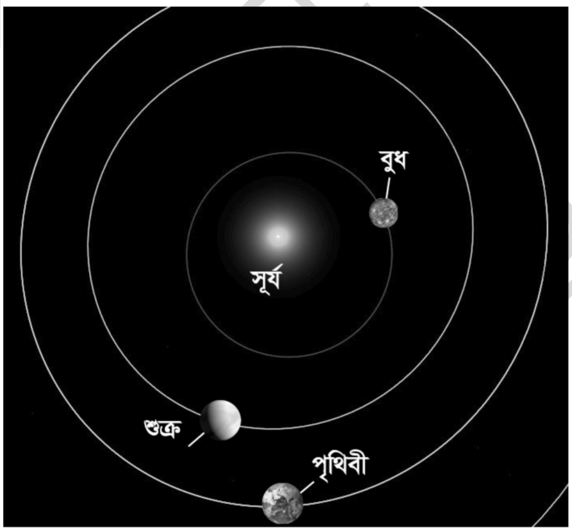
বুধ

সেলেস্টিয়ার সুবাদে আমরা শুক্র গ্রহের অতি নিকট-মহাকাশ থেকে সূর্যের নিকটতম প্রথম গ্রহ বুধের দিকে তাকালাম। অতি ছোট্ট একটি তারার মতো একে দেখাচ্ছিল। তাতো হবেই- কারণ বুধ হলো পাথরের তৈরী অভ্যন্তরীণ চার টেরেস্ট্রিয়্যাল (শক্ত মাটির) গ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট্ট বস্তু। এছাড়া যে মুহূর্তে (৭/৫/১২, সময়: বিকেল ৯:০৫) আমরা শুক্রের নিকট থেকে তার দিকে তাকাচ্ছি, তখন সে **০.৯৭৫২৪ এইউ (৯০,৬,৫৪,২২২ মাইল)** দূরে অবস্থান করছিলো।



উপরের চিত্রে সেই দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বুঝাই যাচ্ছে, বর্তমানে বুধ তার কক্ষপথে চলে সূর্যের অপরদিকে অবস্থান করছে। ডানের দ্বিতীয় চিত্রে শুক্র ও বুধের বর্তমান অরবিট (orbit) বা কক্ষপথ দেখলে তা সহজেই অনুমেয় হবে।

ছোট্ট আয়তন ও ওজনবিশিষ্ট বুধের না আছে কোন চন্দ্র না কোন উল্লেখযোগ্য বায়ুমণ্ডল। এটা অনেকটা আমাদের চাঁদের মতো। তবে তার চতুর্দিকে একটি ম্যাগনিটোস্ফিয়ার আছে। পরবর্তী গ্রহ শুক্রের পর এটিই সর্বাপেক্ষা গরম গ্রহ। এটা সহজে অনুমেয়- কারণ, সূর্য থেকে বুধ বেশী দূরে নয়। আমরা সেলেস্টিয়া দ্বারা মেপে দেখেছি বর্তমানে সূর্য থেকে বুধ **০.৪০৫৬৬ এইউ (৩৭,৭০৮,৪৫৩ মাইল)** দূরে অবস্থান করছে। তবে সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব হলো, **৫,৭৯,১০,০০০ কিমি (৩,৫৯,৮৩,৬০৬ মাইল)**। যখন সে দূরতম অবস্থানে চলে যায় (Aphelion), তার দূরত্ব হয় **৬,৯৮,২০,০০০ কিমি (৪,৩৩,৮৪,১৩৭ মাইল)**। অপরদিকে নিকটতম অবস্থানে (Perihelion) তার দূরত্ব নেমে **৪,৬০,০০,০০০ কিমি (২,৮৫,৮৩,০৭৫ মাইল)** হয়। বুধের ভলিউম **$৬.০৮৩*১০^{১০}$ মিটার কিউব**। তার **ব্যাসার্ধ ২,৪৩৯.৭ কিমি**



(১৫১৬ মাইল)। এ হিসাবে সে চন্দ্রের তুলনায় **৪০ শতাংশ বড়** এবং পৃথিবীর তুলনায় **৪০ শতাংশ ছোট্ট**। বুধ সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত একটি গোলক। তার মেরুদ্বয় ও বিষুবরেখার ব্যাসার্ধ একই। বেশিরভাগ গ্রহের মেরুদ্বয় কিছুটা চাপা থাকে। যেমন আমাদের পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের ব্যাসার্ধ হলো **৬,৩৫৬.৮ কিমি**। অপরদিকে বিষুবরেখার ব্যাসার্ধ হলো **৬,৩৭৮.১** কিমি, অর্থাৎ **২১.৩০** কিমি বেশী। বুধের ক্ষেত্রে এই উভয় মাপ একই।



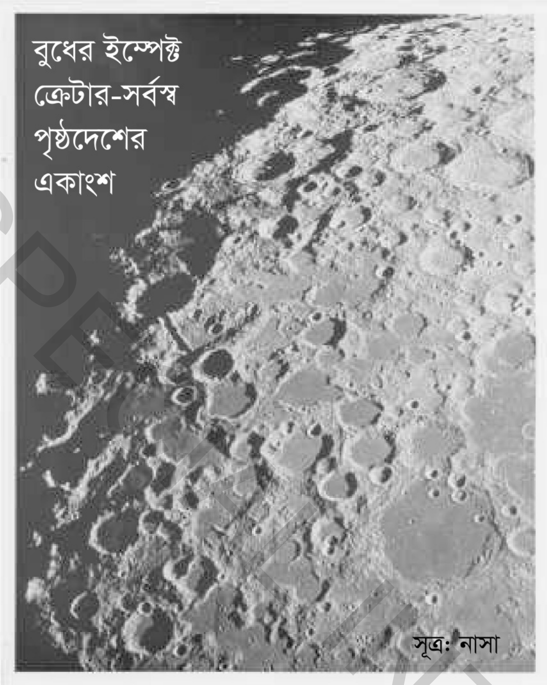
বুধের চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত মেসেঞ্জার মহাকাশযান।

বুধ সূর্যকে গড়ে **৪৭.৮৭ কিমি/সেকেন্ড গতিতে** প্রদক্ষিণ করছে। একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে **৮৮ পৃথিবী দিবস**। অপরদিকে তার একদিন আমাদের তুলনায় **৫৯ দিন!** এটাই বুধের আহ্নিক গতি। তার ভলিউম পৃথিবীর তুলনায় **আঠারো ভাগের একভাগ** মাত্র। অপরদিকে গড় **ঘনাঙ্ক (ডেনসিটি) হলো ৫.৪ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার,** যা প্রায় পৃথিবীর সমপরিমাণ। আপনি যদি গ্রহের উপর দাঁড়ান (যা আদৌ সম্ভব কি না সন্দেহ আছে!) তাহলে **৭০ কেজি ওজনবিশিষ্ট হয়েও অনুভব করবেন মাত্র ২৬.৪ কেজি!** এতে এটাই প্রমাণ হয়, বুধের মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষের এক-তৃতীয়াংশ থেকে একটু বেশী। গ্রন্থের শেষে আমরা খুব চিত্তাকর্ষক একটি তালিকা ছাপিয়েছি। ওজন ৭০ কেজি ধরে, আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ ও এমনকি সূর্যের উপর অবতরণ করেছি! এরপর মেপে দেখেছি আপনার ওজনে কতটুকু তারতম্য হয়েছে। এরপর টেবিল সাজিয়েছি। অবশ্য ব্যাপারটি শুধু কৌতুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। টেবিলের একদিকে মহাকর্ষের কারণে বিভিন্ন **'মুক্তগতিও'** লিপিবদ্ধ করেছি। যাক, পরিশিষ্টে যাকিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো- এটাই আশা।

গতিবিধির উপর অন্যান্য তথ্যাদি

ইতোমধ্যে আমরা বুধের বেশ ক'টি গতির উপর তথ্যাদি বলে দিয়েছি। তবে তার গতিবিধির উপর আরো কিছু জানার আছে। প্রথমত গ্রহের অরবিট বা প্রদক্ষিণপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির হওয়ায় সে নিজস্ব বৎসরের **(৮৮ দিনের মধ্যে)** দু'টি সময় সূর্য থেকে দূরতম (aphelion) ও নিকটতম (periheliuon) স্থানে অবস্থান করে। এই দু'টি অবস্থানের দূরত্ব কি তা-ও আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। যা উল্লেখ করি নি তাহলো, **এ্যাপেলিয়ান**-এ থাকাবস্থায় গ্রহের উপর সূর্যের এনার্জির মাত্রার তুলনায় **পেরিহিলিয়ান**-এ তা **২.৩ গুণ বেশী**। কারণ, এ সময় সে সূর্যের অনেকটা কাছে। সুতরাং একটি মাত্র অরবিটের সময় সূর্য থেকে প্রাপ্ত এনার্জির মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় **১১ গুণ (সর্বোচ্চ) থেকে ৪.৫ গুণ (সর্বনিম্ন)** হয়ে থাকে। আর পেরিহিলিয়ান-এ বুধের গতিও এ্যাপেলিয়ান-এর তুলনায় **৪৬ শতাংশ বেশী**।

অপর আরেক তথ্য এখানে তুলে ধরছি। আমাদের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। বিষয়ের কাঠিন্যতাই আসল কারণ। যাক, এটা মেপে দেখা গেছে বুধ


বুধের ইম্পেক্ট ক্রেটার-সর্বস্ব পৃষ্ঠদেশের একাংশ
সূত্র: নাসা

যখন সূর্যের নিকটতম অবস্থানে থাকে তখন পূর্বের বারের তুলনায় অতি সামান্যতম ভেতরের দিকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ কোন এক কারণে সে অতি ধীরে ধীরে পেরিহিলিয়ান-এর সময় সূর্যের কিছুটা কাছে চলে যাচ্ছে। সাধারণ **'ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স'** দ্বারা এই ব্যাপারটির কারণ বুঝানো যায় না। তবে **রিলেটিভিটি** নামক আধুনিক থিওরী দ্বারা এটা বুঝানো যায়। নভোচারী ভাইবোন! এখন বুঝতে পারছেন কেনো আমি **আলবার্ট আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরী** এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি?

জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি দ্বারা উক্ত ব্যাপারটি বুঝানো হয়েছে। এটা থিওরীর প্রমাণ হিসাবেও বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করে নিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, সূর্যের বিরাট ম্যাস বা ওজন হেতু চতুর্দিকের **মহাকাশ বক্র হয়ে পড়ে**। আর এই বক্রপথেই গ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে। লক্ষ্য করুন, এই কথাটি **'ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স'** দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। যাক, বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ হওয়ায় সূর্যের বক্রপথের প্রভাব তার উপরই সবার তুলনায় অধিক। রিলেটিভিটির মাধ্যমে আগেই এটা অঙ্ককষে প্রমাণ করা হয়েছিল যে, বুধ খুব ধীরে ধীরে সূর্যের নিকটবর্তী অবস্থানে তার কক্ষপথ পরিবর্তন করছে। পর্যবেক্ষণ থেকে এখন তা সত্যায়িত হলো।

অপর আরেক ব্যাপার আছে যার উপর আমরা এখনো কিছু বলি নি। বুধের ধীরগতিতে স্পিন (ঘূর্ণন) হেতু সে ৫৯ দিন সময় অতিবাহিত করে একবার মাত্র ঘুরে আসতে। এ হিসাবে সে সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরতে যেয়ে তিনবার মাত্র নিজের মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘুরে (তার আহ্নিক গতি)। এতে এটাই স্পষ্ট হলো, **বুধের তিন দিন সমান তার দুই বৎসর!** যে কোন গ্রহের **স্পিন (আহ্নিক গতি)** ও **অরবিট (বার্ষিক গতি)** নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে থাকেন। এই উভয়টির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **স্পিন-অরবিট রেজোনেন্স** (spin-orbit resonance) বলে। বুধের ক্ষেত্রে এর মাত্রা হলো **৩:২**। অর্থাৎ **তিনটি স্পিন = দু'টি অরবিট**। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরূপ পার্থক্যের কারণ হলো কক্ষপথে চলার সময় বুধের উপর সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবের পার্থক্য। কারণ বুধ কোন সময় অতি নিকটে চলে যায় আবার কোন সময় বেশ দূরে সরে পড়ে প্রতিটি অরবিট-কালে। এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'solid body tidal forces'। আমরা বাংলায় বলতে পারি **'কঠিন বস্তু তারঙ্গিক বল'**।

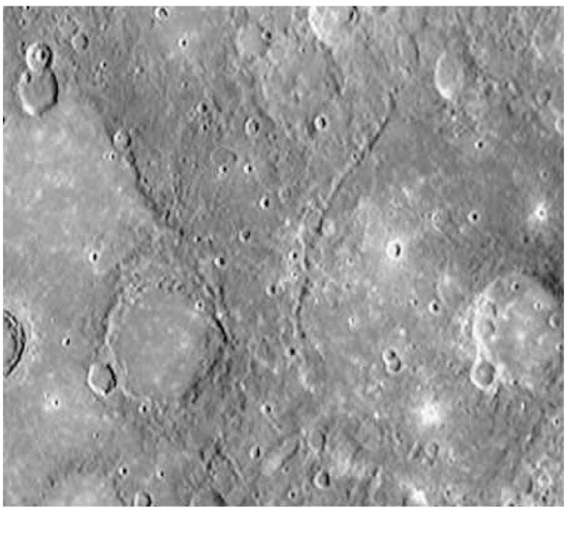
বুধের গতিমতির ব্যাপারে আরেক চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে। তার **এক সৌরদিবস পৃথিবীর তুলনায় ১৭৫.৮৪ দিন**। অর্থাৎ **বুধের দুই বৎসর সমান তার এক সৌরদিবস**। গ্রহের **'দুপুর পয়েন্ট'** দিয়ে একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে যে সময় লাগে **তা-ই সৌরদিবস**। আর ইতোমধ্যে আমরা বলেছি, বিষুবরেখা বরাবর বুধের এক

দিবস ৮৮ পৃথিবী দিবসের সমান।

আরেক চিত্তাকর্ষক ব্যাপার একমাত্র বুধের উপর অবস্থানকারী পর্যবেক্ষকের নিকট দৃশ্যমান হবে। মনে করুন আপনি বুধের বিষুবরেখা বরাবর কোথাও কলোনি বানিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। ভোরে আপনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলেন সূর্যটি স্বাভাবিকভাবে উদয় হচ্ছে। কিন্তু একটু উপরে উঠার পর দেখতে পাবেন সে আবার নীচের দিকে নেমে পড়ছে! এরপর পুনরায় পূর্বাকাশে উদয় হচ্ছে। এই **ডবল সূর্যোদয়** অপর কোন গ্রহে দেখা যায় না। বুধের অস্বাভাবিক গতিমতির ফলেই এরূপ হয়ে থাকে।

পৃষ্ঠদেশ ও অভ্যন্তর

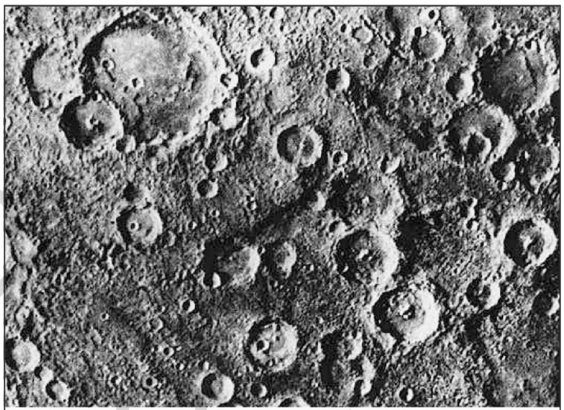
আমাদের চাঁদের মতো বুধের পৃষ্ঠদেশে অসংখ্য পতন-গর্ত (ইম্পেক্ট ক্রেটার) দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে মহাকাশে বিচরণশীল এ্যাস্টারোইড, ধূমকেতু, মিটিওর ইত্যাদি দ্বারা গ্রহটি অসংখ্যবার বম্বার্ডমেন্টের শিকার হয়েছে। গ্রহের নিকট-মহাকাশ থেকে বিভিন্ন স্পেইস ক্রাফ্ট যেসব ছবি পাঠিয়েছে তা থেকে সুস্পষ্ট, গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ অনেকটা ধূসরবর্ণের ও ছোট বড় গর্তে পরিপূর্ণ। নীচের ছবিটি দেখুন।



বুধের **আলবেদো** (সূর্যের আলো পতন ও প্রতিবিম্ব হওয়ার একটি অনুপাত) খুব অল্প। এ কারণেই সূর্যের অতি নিকটে হওয়া সত্ত্বেও সে মহাকাশে অল্প আলো প্রতিবিম্ব করে। বাস্তবে তার পুরো দেহটা খুব ধূসর বর্ণের। পুরো পৃষ্ঠদেশব্যাপী শুষ্ক রিগোলিথ নামক মাটি বিস্তৃত। ইতোমধ্যে উল্লেখিত **'আলবেদো'**র পরিমাণ **মাত্র ১২ শতাংশ**। এই মাত্রাটি আমাদের চন্দ্রের আলবেদো'র সমপরিমাণ। অন্যদিকে আমাদের পৃথিবীর **আলবেদো ৩৯ শতাংশ**। আর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহ শুক্রের **আলবেদো ৭৬ শতাংশ**।

দেখতে অনুজ্জ্বল হলেও বুধের পৃষ্ঠদেশে তাপমাত্রার মধ্যে যে বিরাট তারতম্য বিদ্যমান, তা সৌরজগতের অন্য কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মহাকাশযান পরীক্ষা করে দেখেছে, বুধের **সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৬৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১১৭০ ফারেনহাইট)** পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেদিকটি সূর্যালোক দ্বারা উদ্ভাসিত থাকে সেদিকের **তাপমাত্রা ৪৫০ ডিগ্রী সে. (৮৪০ ডি.ফা.)** এর নীচে নামে না। অপরদিকে বুধের রাতের অংশে **তাপমাত্রা -১৮৩ ডিগ্রী সে. (-২৯৭.৪ ডি. ফা.)** -এ নেমে আসে। অপর আরেক ব্যাপার হলো, বুধের **এ্যাক্সিজ (আহ্নিক গতির মধ্যশলাকা)** তার বার্ষিক গতিপথ থেকে প্রায় নব্বুই ডিগ্রী খাড়া থাকায় গ্রহের মধ্যে কোন ঋতু সৃষ্টি হয় না। পৃথিবীসহ অধিকাংশ গ্রহের এ্যাক্সিজ অনেকটা কাত অবস্থায় থাকায় সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ঋতুর।

বুধের উচ্চ **ঘনাঙ্ক (ডেনসিটি)** থেকে এটা সহজে অনুমেয়, লৌহজাত পদার্থ গ্রহের অভ্যন্তরে খুব বেশী বিদ্যমান। তবে পৃষ্ঠদেশে খুব একটা বেশী লৌহজাত দ্রব্য নেই। এতে বুঝা যায় অধিকাংশ লোহা তার অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের কৌর বা কেন্দ্রে অবস্থিত।



মারিনার-১০ থেকে প্রাপ্ত বুধের পৃষ্ঠদেশের একটি ছবি

ম্যাগনেটিক ফিল্ড

সৌরজগতের অভ্যন্তরীণ চারটে **'পাথরসর্বস্ব'** গ্রহের মধ্যে পৃথিবী পরে একমাত্র বুধের একটি **গ্লোবাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে**। তবে পৃথিবীরটির তুলনায় তা মাত্র ১ শতাংশ শক্তিশালী। বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝতে পারেন নি, কোন্ কারণে বুধের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি এতো কম। কারণ ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, তার অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ বস্তু লৌহজাত পদার্থ। আর লোহার মধ্যেই চুম্বকীয় গুণাবলী বেশী প্রকট। থিওরী মতো তার চুম্বকীয় ফিল্ডের শক্তি অন্তত ৩০ গুণ বেশী হওয়ার কথা। অবশ্য এই 'থিওরী' পৃথিবীতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টির কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত। হয়তো বুধের ক্ষেত্রে ফিল্ড সৃষ্টির কারণ অন্যটি হতে পারে। তবে

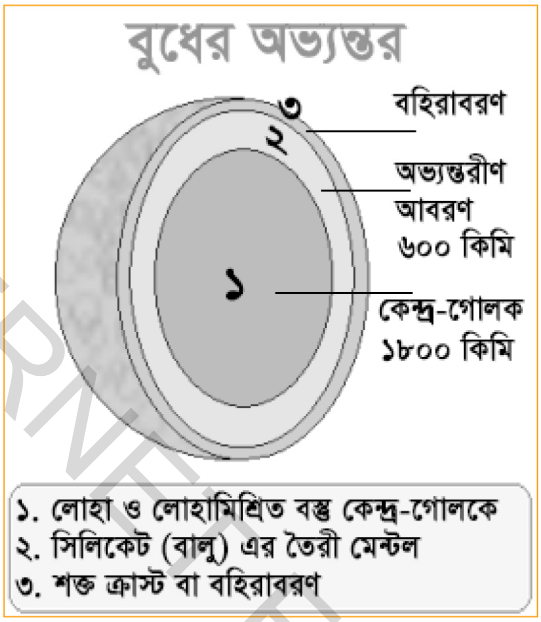


বুধের চার মণ্ডল

সঠিকভাবে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

পর্যবেক্ষণ

পৃথিবী থেকে সূর্যের নিকটস্থ এই গ্রহের উপর খুব একটা গবেষণার সুযোগ নেই। এটা ভোরবেলা কিংবা তারও কিছু আগে পূর্বাকাশে সামান্য উর্ধ্বে দেখতে পাওয়া যায়। এ সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও (ঠাণ্ডা ঋতুতে) শিশিরের কারণে বুধকে অনেকটা আধো-আধো, মিটিমিটি দেখায় মাত্র। সুতরাং পৃথিবীকেন্দ্রিক শক্তিশালী



টেলিস্কোপও বুধ-গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ নয়। হ্যাঁ, সুযোগ বেশী সৃষ্টি হয় মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম টেলিস্কোপ ব্যবহার দ্বারা। যেমন হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ। কিন্তু তা-ও সর্বদা সম্ভব নয়। সূর্যের দিকে টেলিস্কোপ **'ধরা'** অনেকসময় অকার্যকর। চন্দ্র ও শুক্রের মতো পৃথিবীর অভ্যন্তরে বুধের কক্ষপথ থাকায় তাকেও বিভিন্ন ফেইজে (কলায়) দৃশ্য হয়। এতে বুধের ঔজ্জ্বল্যে বেশ তারতম্য ঘটে। সুতরাং এসব প্র্যাকটিকেল সমস্যা হেতু বুধের উপর সফল গবেষণা পরিচলন, একমাত্র মহাকাশযান তার

নিকট পাঠানোর বিকল্প নেই। অবশ্য **'রাডার'** দ্বারা বুধের কিছু তথ্য পৃথিবী থেকেই আবিস্কৃত হয়েছিল। **১৯৬০** এর দশকে এ উপায়ে আমরা বুধের ইতোমধ্যে উল্লেখিত **'স্পিন-অরবিট রেজোনেন্স' ৩:২** হওয়ার কথা জেনেছি। এর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, পৃথিবীর দিকে চাঁদ যেভাবে করে থাকে, ঠিক তদ্রূপ বুধও বুঝি তার এক গোলার্ধ সর্বদা সূর্যের দিকে রাখে। এ তথ্য থেকে ধারণাটি বাতিল হয়ে যায়। রাডার দ্বারা গ্রহের আয়তনও মাপা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে মহাকাশযান কাছে যেয়ে এই মাপটি আরো সঠিকভাবে করেছে। ইদানিং বিজ্ঞানীরা রাডার ও **মাইক্রওয়েভ** (ক্ষুদ্রতরঙ্গ) এর সমন্বয়ে বুধের উপর গবেষণা চালিয়েছেন। তারা পুরো গ্রহের পৃষ্ঠদেশের ম্যাপ বানিয়েছেন এ উপায়ে।

কাছে থেকে গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নীরিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার **'নাসা'** মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ১৯৭০ দশকে **মারিনার-১০** নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে। উপগ্রহটি **১৯৭৪** সালে দু'বার ও **১৯৭৫** সালে একবার বুধের নিকট-মহাকাশের উপর দিয়ে উড়ে যায়। সে পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীতে অনেক ছবি। বুধের উপরস্থ অসংখ্য চন্দ্র-সদৃশ গর্ত এ দৃশ্যগুলোতে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। **মারিনার-১০** বুধের **চুম্বকীয় ফিল্ডও** আবিষ্কার করে। তবে দুর্ভাগ্যবশত মহাকাশযানটি বুধকে পুরোদমে প্রদক্ষিণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে আমরা **মারিনার-১০** থেকে যা ছবি পেয়েছি তা গ্রহের মোট পৃষ্ঠদেশের ৪৫ শতাংশের অধিক নয়। এছাড়া সূর্যালোকের তীব্রতা হেতু অধিকাংশ ছবি অনেকটা অস্পষ্ট ছিলো।

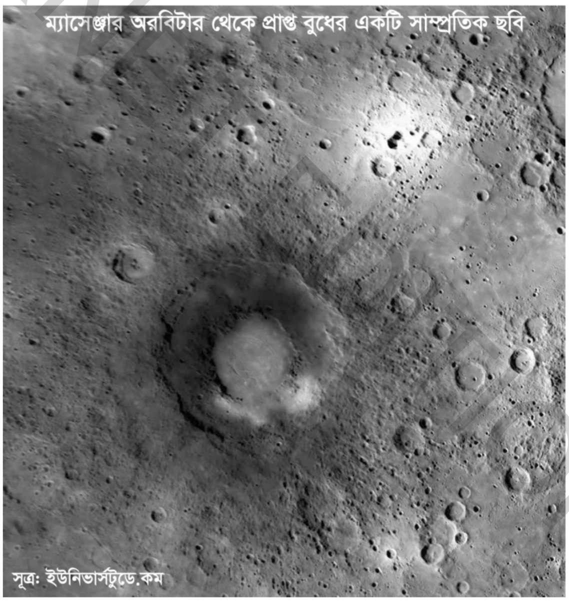
এরপর ২০০৪ সালে **মেসেঞ্জার মহাকাশযান** পৃথিবী থেকে উড্ডয়ন করে। গত **মার্চ ২০১১ সালে মেসেঞ্জার ক্রাফ্‌ট** সফলভাবে বুধের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ শুরু করেছে। মেসেঞ্জার ক্রাফটের প্রেরক আমেরিকার **'নাসা'**র বিজ্ঞানীরা আশা করেন এটি দীর্ঘ এক বৎসর পর্যন্ত গ্রহকে প্রদক্ষিণ করবে এবং পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি। সর্বশেষ বুধ পর্যবেক্ষণ এই মিশন থেকে বিজ্ঞানীরা অসংখ্য ছবি ইতোমধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন। নীচে দু'টি ছবি তুলে ধরা হলো।

ম্যাসেঞ্জার অরবিটার থেকে প্রাপ্ত বুধের পৃষ্ঠদেশের একটি ছবি



সৌজন্যে: ইউনিভার্সটুডে.কম

ম্যাসেঞ্জার অরবিটার থেকে প্রাপ্ত বুধের একটি সাম্প্রতিক ছবি



সূত্র: ইউনিভার্সটুডে.কম

সূর্যের অনেকটা নিকটে মেসেঞ্জার স্পেইস ক্রাফটকে পৃথিবীর **'কন্ট্রোল সেন্টার'** থেকে সঠিক

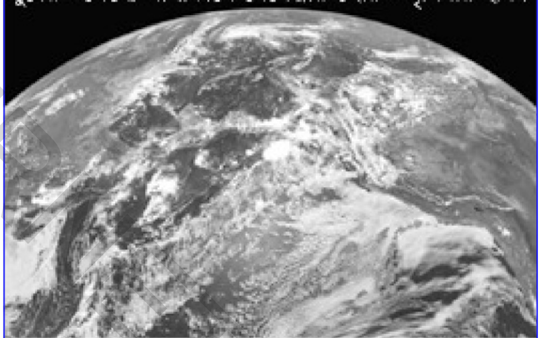
কক্ষপথে সর্বদা ধরে রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। বুধের কক্ষপথে প্রবেশের পর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন সূর্যের শক্তিশালী মহাকর্ষের সঙ্গে **'টাগ-অব-ওয়ার'** শুরু হয়ে গেছে। একদিকে বুধের মহাকর্ষের টান আর অপরদিকে সূর্যের টান হেতু সে নিজের কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হিমশিম খাচ্ছিলো। শুধু মহাকর্ষ নয়, সূর্য থেকে আগত প্রচণ্ড পরিমাণ **আলোক-অংশুজাল ক্রাফ্‌টকে** চাপ দিচ্ছিলো। একে বিজ্ঞানীরা **'সূর্যালোক চাপ'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব ব্যাপার মেসেঞ্জার প্রেরণের পূর্বেই বিজ্ঞানীদের জানা ছিলো। ক্রাফ্‌টটি যাতে এসব চাপের মুখেও সে তার **'মূল কক্ষপথ'** থেকে বিচ্যুত না হয় তার জন্য **'অনবোর্ড'** পরিবর্তন সিস্টেম জুড়ে দেওয়া আছে। কিন্তু এরপরও পৃথিবী থেকে সময় সময় **মিশন ক্রুরা ইলেকট্রনিক সিগন্যাল** প্রেরণ করে ক্রাফ্‌টকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। কী অপূর্ব অত্যাধুনিক স্পেইস টেকনোলজি! সত্যিই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।



মেসেঞ্জার থেকে প্রাপ্ত বুধের একাংশের একটি ছবি।



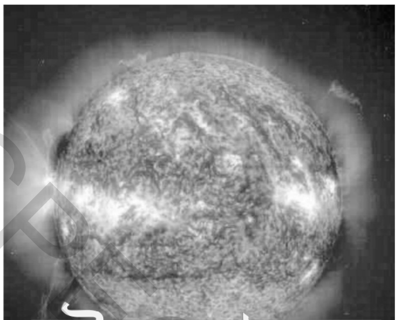
বুধের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে মেসেঞ্জার-প্রেরিত পৃথিবীর ছবি।



এ্যাস্ট্রোনোমির প্রতি কৌতূহলী সকলের মনের খোরাক হিসাবে উপরে একটি চিত্রাঙ্কন ও দু'টি ছবি দেওয়া হলো।

সর্বশেষ জানা গেছে, **মেসেঞ্জার মিশন** আরো এক বৎসরের **'হায়াত'** লাভ করেছে। কথা ছিলো, **মার্চ ২০১২ সালে** সে তার বৎসর-দীর্ঘ মিশনের ইতি টানবে। কিন্তু ক্রাফটের যন্ত্রপাতি এই **'মৃত্যুদিবস'** পেরিয়ে যাওয়ার পরও জীবিত ও পূর্ণ সুস্থ ছিলো। তাই **'নাসা'** একে আরো এক বৎসরের জন্য কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। **২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত** (যদি পুনরায় নবজীবন প্রদান করা না হয়!) মেসেঞ্জার মিশন অব্যাহত থাকবে। নিঃসন্দেহে এই গুরুত্বপূর্ণ কৃত্রিম উপগ্রহ মিশন থেকে বুধ সম্পর্কে আরো অনেককিছু আমরা অচিরেই জানতে পারবো। সুতরাং অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

প্রিয় নভোচারী ভাইবোন! সৌরজগতব্যাপী আমাদের এই কাল্পনিক ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। ইতোমধ্যে আমরা জানা সকল গ্রহ ও বিশিষ্ট চন্দ্রে যেয়ে তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছি। জেনেছি অনেক অজানা বিষয়। এখন সময় এসেছে সৌরজগতের মূল বস্তু সূর্যের নিকট যাওয়ার! বাস্তবে তো কোনদিনই কেউ সূর্যের ধারেকাছেও যেতে সক্ষম হবেন না। এরপরও আমরা পরোয়া করি না! আমরা যাচ্ছি কল্পনার মহাকাশযানে, সেলেস্টিয়াকে সাথী করে। চলুন, সৌরজগতের কেন্দ্র ও পুরো সিস্টেমের প্রধান নিয়ন্ত্রক, বিরাট অগ্নিকুণ্ড, আমাদের নিকটস্থ তারকা সূর্যের কাছে যাই।

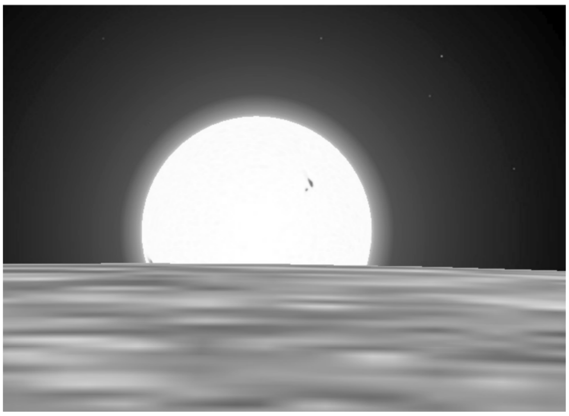


১২

সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্যের নিকটে

নিকটতম তারার নিকট-মহাকাশে

নভোচারী সহযাত্রী! অনেক দূর থেকে আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছিল। সৌরজগতের অনেক বস্তুর উপর গবেষণা-পর্যবেক্ষণ শেষে পুরো সিস্টেমের কেন্দ্রে এখন আমাদের অবস্থান। যার নিয়ন্ত্রণে সবকিছু- সেই সূর্যের কাছে আমরা পৌঁছে গেছি। **সৌরজগৎ মানেই সূর্য**। তবে এখানে আসার পূর্ব মুহূর্তে প্রথম গ্রহ বুধের নিকট থেকে একবার আমরা সেলেস্টিয়ার মাধ্যমে উজ্জ্বল এই তারাটির দিকে তাকালাম। যা দেখলাম তা নীচে তুলে ধরেছি।



যে মুহূর্তে আমরা উপরোক্ত ছবিটি তুলেছি সে ক্ষণটি ছিলো: ৭ মে ২০১২ ঈসায়ী, সকাল ৯.১৫ মিনিট। এসময় সূর্য বুধ থেকে **০.৪০৫৬৬ এইউ (৩,৭৭,০৮,৪৫৩ মাইল)** দূরে অবস্থান করছিলো। সূর্য একটি মধ্যবয়সী হলুদ তারকা। এরূপ আয়তন ও তাপবিশিষ্ট তারাই সমগ্র বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক বেশী। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, আমাদের সূর্যের বয়স **৪৬০ কোটি বৎসর**। সে আরো **৭০০ কোটি বৎসর** জীবিত থাকবে বলেও অনেকে মনে করেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **উচ্চ তাপসম্পন্ন আনবিক অগ্নিকুণ্ড** হয়েও সূর্যই সমগ্র সৌরজগতের মূল এনার্জি সূত্র। আর খাস করে আমাদের পৃথিবী ও এর উপর বসবাসকারী সকল প্রাণী তার এনার্জির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য প্রাণীদের **'বাঁচিয়ে'** রাখার জন্য শুধু সূর্য নয়, সমগ্র জগতই সক্রিয় আছে। পুরো সৃষ্টিকাঠামো পৃথিবীতে মানুষসহ সকল প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কথাগুলো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বললাম। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই একই কথা কিছুটা হয়তো ভিন্নভাবে বলা উচিৎ হবে। যেমন, বিশ্বের স্রষ্টা সবকিছু বানিয়েছেন, মানুষসহ সকল প্রাণীদেরকে এই পৃথিবীর উপর বেঁচে থাকার জন্য **সবধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে**। এ কথাটিই অতিরিক্ত সত্য বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস রাখি।

সহযাত্রী আমার নভোচারীবৃন্দ! আশাকরি


সূর্যকে কাছে থেকে গবেষণার জন্য মহাকাশে প্রেরিত 'সোলার অরবিটার'।

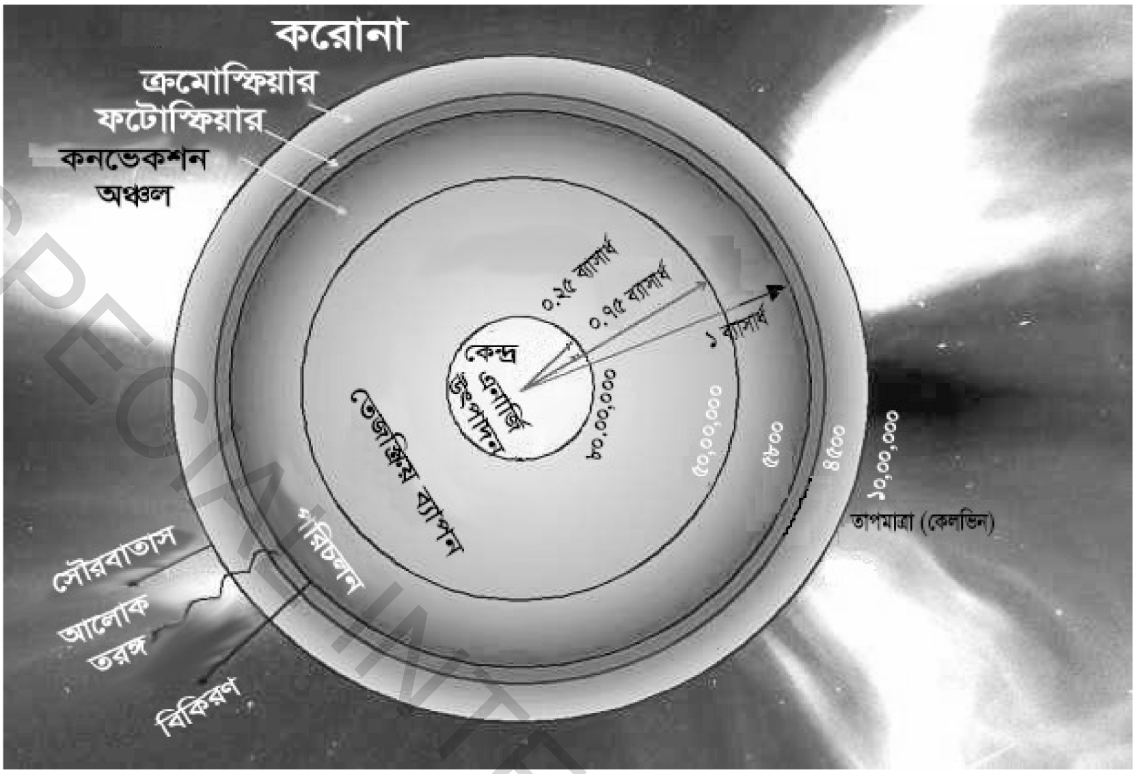
আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন। সমগ্র সৌরজগৎ ঠিক যেভাবে চলমান আছে তা না হয়ে ভিন্ন হলে আপনি ও আমি এই গ্রহে হয়তো বেঁচে থাকতে পারতাম না। সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান থেকে সূর্যের এনার্জির মাত্রা, মহাবিশ্বে সৌরজগতের অবস্থান ইত্যাদি অসংখ্য ফেক্টর একই সাথে অস্তিত্বশীল আছে যা আমাদেরকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে **'সুবিধাজনক'** করেছে। এভাবে সুবিধাজনক হওয়া **'এমনিতেই'** হয়েছে, তা বিশ্বাস করা আমার জন্য আদৌ সম্ভব নয়। যাক, প্রসঙ্গক্রমে এ কথাগুলো বললাম। আমাদের এ তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার উদ্দেশ্য **'বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা'**। আর আশাকরি পাঠকদের সকলেই একমত হবেন যে, এ পর্যন্ত আমরা তা-ই করেছি। সুতরাং আসুন তলিয়ে দেখি আমাদের তারার বিভিন্ন দিক বিজ্ঞানের আলোকে।

প্রাথমিক তথ্যাদি

সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে সূর্যই সর্বাপেক্ষা বড় ও ওজনবিশিষ্ট বস্তু। তার ব্যাসার্ধ (কেন্দ্র থেকে বাইরের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত দূরত্ব) **৬,৯৫,৫০৮ কিমি (৪,৩২,১৬৯ মাইল)**। পৃথিবীর তুলনায় এ সংখ্যাটি **১০৯ গুণ বেশী**। মনে করুন সূর্যের অভ্যন্তরস্থ সকল বস্তু আমরা দূরে ফেলে দিলাম! থাকলো শুধু তার বাইরের পাতলা চামড়া। এরপর পৃথিবীকে **'কপি'** করে করে সেই বিরাট চামড়ার বলের ভেতর ঢুকাতে লাগলাম। পাঠক! এরূপ ক'টি পৃথিবী সূর্যের ভেতর ঢুকানো যাবে বলে আপনি মনে করেন? জবাব, **১০ লক্ষ পৃথিবী!**

সূর্যের **ম্যাস (বস্তুর পরিমাণ) ১.৯৮৯*$১০^{২৭}$ মেট্রিক টন (১০০০ কিলোগ্রাম = ১ মেট্রিক টন)**। এই সংখ্যাটি বিরাট। এভাবে লিখেছি কাগজ বাঁচানোর জন্য। বাস্তবে **১৯৮৯ এর পরে ২৪টি '০'** লিখলে সংখ্যাটি পূর্ণাঙ্গভাবে লিখা হবে! সুতরাং পৃথিবীর তুলনায় তার মধ্যে কতটুকু বেশী বস্তু আছে? জবাব, **৩,৩৩,০০০ গুণ!** তবে একটা সাপ্রাইজ সংরক্ষিত আছে- এক ক্ষেত্রে পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের **'কম'** মাত্রার মাপ বিদ্যমান। এটা হলো তার **বস্তুর ঘনাঙ্ক (কি পরিমাণ বস্তু বিশেষ ভলিউমে আছে)**। যেখানে পৃথিবীর এই ঘনাঙ্ক হলো **৫৫১৫ কেজি/কিউবিক মিটার**, সেখানে সূর্যের ঘনাঙ্ক মাত্র **১৪০৮ কেজি/কিউবিক মিটার**। বুঝা গেল বস্তুর ঘনাঙ্ক সাইজের উপর নির্ভরশীল নয়। কম ভলিউমে বেশী বস্তু থাকতে পারে। সূর্যের ঘনাঙ্ক কম হওয়ার মূল কারণ হলো সে **হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের তৈরী**। আর গ্যাস সাধারণত বেশী জায়গা দখল করে থাকতে ভালোবাসে। আমাদের এই তারা সম্পর্কে জানা অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলো।

পৃথিবী থেকে দূরত্ব: সর্বনিম্ন - ১৪৭,১০০,০০০ কিমি (৯১,৪০৩৭০২৩৭৮ মা);



সর্বোচ্চ - ১৫২,১০০,০০০ কিমি (৯৪,৫১০৫৫৮৩৩৯ মা); গড় - ১৫০,০০০,০০০ (৯৩,২০৫৬৭৮৮৩৬ মা)।
স্পেকট্রেল টাইপ (তারার ধরন) : জি২। তাপমাত্রা : কেন্দ্রে - ১,৬০,০০,০০০ কেলভিন (২,৯০,০০,০০০ ফারেনহাইট); বাইরের উপরিভাগে- ৫৮০০ কে (৯৩০০ ফা); সূর্যকলঙ্কে - ৪৫০০ কে (৮১০০ ফা); বাইরের করোনায়- ১০,০০,০০০ কে (১,৮০,০০,০০০ ফা)।

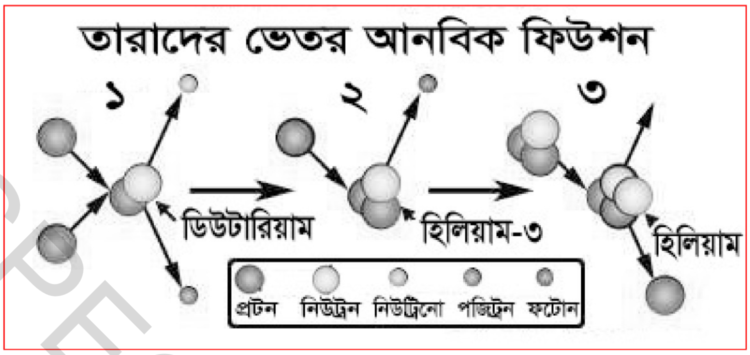


জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ সূর্যের এনার্জি।

এনার্জি সৃষ্টির কারখানা

সূর্য হলো এনার্জি সৃষ্টির এক অপূর্ব কারখানা। তার আলোক-এনার্জির পরিমাণ হলো **৩.৮৩*১০^{২৬} ওয়াট**। সাধারণ একটি **৬০ বা ১০০ ওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্ব** থেকে কতগুণ বেশী হবে এই সংখ্যাটি? শুধু ধারণা করে নিন। সংখ্যা বের করার দরকার নেই। এই বিরাট আলোক-এনার্জি সৃষ্টি হয় সূর্যের অভ্যন্তরে এবং তা চলে আসে বাইরের বায়ুমণ্ডলে। সেখানকার তাপমাত্রা **৫,৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৯৯০০ ডি.ফা.)** পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এ থেকেই সূর্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন আলোকরশ্মি। উপরের চিত্রাঙ্কনটি দেখুন।

আলো ও তাপ এনার্জি ছাড়াও সূর্য থেকে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সৌরবাতাস, এক্স-রে, আলট্রাভাইলোট রেডিয়েশন ইত্যাদি উচ্চ মাপের



এনার্জি। তবে সূর্যের মূল এনার্জি সূত্র আনবিক প্রতিক্রিয়া। **'নিউক্লিয়ার ফিউশন'** নামক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্য তার জ্বালানি হাইড্রোজেনকে হিলিয়াম পদার্থে রূপান্তর করছে। কি পরিমাণ এনার্জি? গত ১০ হাজার বৎসরের মানবেতিহাসে যে পরিমাণ এনার্জি মানুষ ব্যয় করেছে সূর্য তার থেকেও বেশি পরিমাণ এনার্জি প্রতি সেকেন্ডে বিকিরণ করছে চতুর্দিকের মহাকাশে।

পৃথিবীর সেবায় সূর্য

পুরো সৌরজগতের মধ্যে একটি নীল গ্রহ এই পৃথিবী। জীবনের স্পন্দনে পরিপূর্ণ এই গ্রহটিকে এমন এক অপূর্ব ডিজাইনে তৈরী করা হয়েছে যে,



তা তলিয়ে দেখলে সত্যিই আবেগ-আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। আমরা অবশ্য সৌরমণ্ডল ভ্রমণের অংশ হিসাবে পৃথিবী সম্পর্কে জানা এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি। তবে এখানে আমাদের **'মাদার-আর্থকে'** সূর্য কিভাবে সেবা করে যাচ্ছে তার বর্ণনা একান্ত জরুরী মনে করছি। সূর্যের এনার্জি ছাড়া জীবন বলতে যা বুঝায় তা কখনো এই গ্রহের উপর ঠিকে থাকতে পারতো না। জীবন্ত যা কিছুই থাকুন না কেন বেঁচে থাকতে মৌলিক কিছু উপাদান তার পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই। আর এই মৌলিক উপাদানের মূল সূত্র হলো আমাদের সূর্য। সে অবিরাম জ্বলন্ত থেকে আমাদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে জীবনের জন্য জরুরী **দু'টি এনার্জি-সূত্র- আলো এবং তাপ**। সূর্যালোক আমাদের দিনগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে এবং তাপ সৃষ্টি করে উষ্ণতা। সবুজ বৃক্ষরাজি সূর্যের আলো থেকে তৈরী করে নিজেদের খাদ্য এবং বর্জ্য হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান- **অক্সিজেন গ্যাস**, ছেড়ে দেয় বায়ুমণ্ডলে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **ফটোসিনথেসিস**। বৃক্ষরাজি না থাকলে অধিকাংশ প্রাণীদের বেঁচে থাকতে ভীষণ কষ্ট হতো- কারণ, প্রাণীরা বৃক্ষাদি ও তাদের ফলমূল ভক্ষণ করে এবং এক প্রাণী অপরটিকে খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে **'খাদ্যচেইন'** বলে।

সূর্য আমাদেরকে সরাসরি ও নেপথ্যে যাবতীয় খনিজ সম্পদও উপহার দিয়ে থাকে। এগুলো দ্বারা আমরা আধুনিক যুগে এনার্জির চাহিদা পূরণ করছি। আদি যুগে পুরো বিশ্বব্যাপী প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন আজ থেকে অনেক বেশী প্রাণচঞ্চল এবং বহুমাত্রায় বিস্তৃত ছিলো। সূর্যের এনার্জি না

থাকলে এগুলো বেঁচে থাকতে পারতো না। এরপর যখন এগুলোর মৃত্যু ঘটলো তখন কালের প্রতিক্রিয়ায় মাটির নীচে খনিজ সম্পদে পরিণত হলো। আমরা তাই আজ কূপ খননের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসতে পারছি মানবজাতির এনার্জির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে মওজুদ থাকা **পেট্রোলিয়াম, কয়লা** এবং **প্রাকৃতিক গ্যাস**। এই তিনটি এনার্জির সূত্র মূলত অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন। পৃথিবীর মাটিতে অস্তিত্বশীল ভবিষ্যৎ বুদ্ধিসম্পন্ন সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী মানুষের জন্য সুদূর অতীত থেকেই মহাপরিকল্পনা! ভাবার ব্যাপার নয় কি?

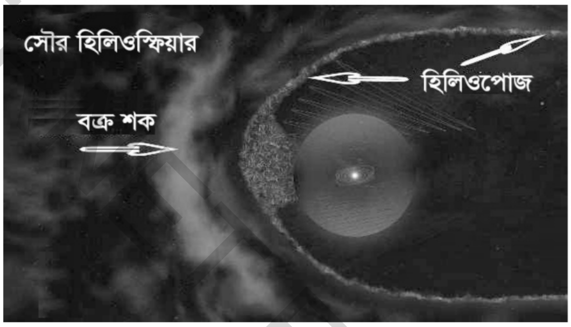
পানির অপর নাম জীবন। কথাটি সবার জানা। কিন্তু সূর্য না থাকলে যে এই **'জীবন'** থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম তা ভেবে দেখার ব্যাপার। সূর্যের এনার্জিই বায়ুমণ্ডলে বাতাস ও পানি চলাফেরার জন্য দায়ী। পানির এই চলনকে বলে **পানিচক্র**। সূর্যের তাপের ফলেই পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায় এবং আবার তা বৃষ্টি হয়ে পতিত হয়- জ্যান্ত করে তুলে মরা জমিনকে। পানি চলে মহাসাগরের দিকে, তৈরী করে নদী-নালা। পাতালপুরে গিয়ে জমা হয়ে ফোয়ারা, জলপ্রপাত, কূয়া ও গভীর-অগভীর নলকূপের মাধ্যমে আবার বেরিয়ে আসে মানুষের সেবায়। পানির চলন ক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাই বাঁধ বেধে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করে। সূর্যের আলোকেও সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে- যাকে আমরা **সৌরবিদ্যুৎ** বলি। বাস্তবে সূর্যের দ্বারা আমরা ও আমাদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা যে কি পরিমাণ উপকৃত হচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

সৌরজগতে সূর্যের দায়িত্ব

সূর্যের দায়িত্ব বলতে এটুকু পর্যন্ত বলা যায়- **সূর্যই মূলত সৌরজগৎ**। কারণ, পুরো সৌরজগৎ মূলত সূর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। **গ্রহ,**



উপগ্রহ, উল্কা, গ্রহাণুপুঞ্জ (এ্যাস্টারোইড) ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ খবরদারি সূর্যের। সে তার বিরাট শক্তিশালী মহাকার্ষিক প্রভাব দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। দৃশ্যমান আলো ও তাপ ছাড়াও সূর্য তার অত্যন্ত পাতলা বিরাট বায়ুমণ্ডল দ্বারাও সৌরজগতের সবকিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। **ইলেকট্রিক্যালী চার্জকরা অণুকণা** পুরো সৌরজগতব্যাপী চলন্ত আছে। এই চলনকে বলে **সোলার উইন্ড বা সৌরবাতাস**। যেসব



এলাকায় এই সৌরবাতাস বিদ্যমান একে বলে হিলিওস্ফিয়ার।

হিলিওস্ফিয়ার একটি বিরাট এলাকা যার ভেতর সকল গ্রহ-উপগ্রহ অবস্থান করে। অধিকাংশ মতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ১০০ গুণ দূরত্ব পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। অর্থাৎ **১০০ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** পর্যন্ত। সূর্য থেকে সৌরবাতাস জন্ম নিয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। যে এলাকায় পৌঁছার পর এই বাতাসের প্রভাব আর অবশিষ্ট নেই, সেই এলাকাকে বলে **হিলিওপোজ**। এই এলাকাই হচ্ছে সৌরজগতের বাইরের সীমা।

সৌরবাতাসের ফলেই পৃথিবীর উভয় মেরুর উপরে আকাশে **'অরোরা'** নামক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গিন প্রদর্শনীর উদ্ভব ঘটে যা দেখতে সত্যিই মনোমুগ্ধকর। আমরা গ্রন্থের প্রথমেই এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসব কথা পুনর্ব্যক্ত হলো।

সূর্যের ধরন

ইতোমধ্যে আমরা সূর্যের ধরন সম্পর্কে একটি তথ্য তুলে ধরেছি। মহাবিশ্বে অসংখ্য তারা আছে। তবে সবগুলো অবশ্যই একই ধরনের



নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সনাক্তকরণের একটি পথ বের করেছেন।

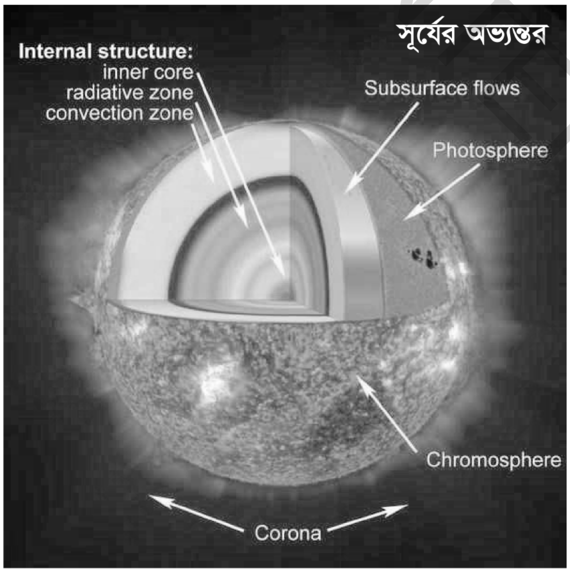
তারার কয়েকটি মৌলিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে এটা কোন্ ধরনের। সার্বিকভাবে গুণাবলী-নির্ভর ধরনের নামকরণ করা হয়েছে, **স্পেকট্রেল টাইপ**। তারা থেকে প্রাপ্ত আলোকের **ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম** গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা কোন্ ধরনের তারা তা নির্ধারণ করে থাকেন। **স্পেকট্রেল টাইপ** ইংরেজী বিভিন্ন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো: **O (নীল তারা- তাপমাত্রা- ২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন), B (সাদা-নীল তারা, তাপমাত্রা- ১১,০০০-২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন), A (সাদা তারা- তাপমাত্রা- ৭,৫০০-১১,০০০ ডিগ্রী কেলভিন), F (হলুদ-নীল তারা- তাপমাত্রা- ৬,০০০-৭,৫০০ ডিগ্রী কেলভিন), G (হলুদ (সূর্যের মতো) তারা- তাপমাত্রা- ৫,০০০-৬,০০০ ডিগ্রী কেলভিন), k (কমলা-হলুদ তারা- তাপমাত্রা- ৩,৫০০-৫০০০ ডিগ্রী কেলভিন)** এবং **M (লাল তারা- তাপমাত্রা- ৩,৫০০ ডিগ্রী কেলভিন)**। সূর্য এই তালিকা অনুযায়ী **G** টাইপের তারা। **স্পেকট্রেল টাইপ** শুধুমাত্র তাপমাত্রা এবং রঙের উপর নির্ভর করে না অবশ্যই। আরো অনেক তথ্যও আছে যেমন, সূর্যের ক্ষেত্রে এতে **কেলসিয়াম স্পেকট্রেল লাইন** বেশী, **হাইড্রোজেন লাইন** তেমন শক্তিশালী নয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ধাতুর লাইন আছে যেমন লোহা। সুতরাং একটি তারার **স্পেকট্রেল টাইপ** থেকে আমরা অনেক তথ্য জেনে নিতে পারি।

সূর্যের জন্ম-মৃত্যু

সূর্য ও সৌরজগতের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা শুধুমাত্র **'মতবাদ'** বা থিওরী দ্বারা বুঝানো সম্ভব। আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে একটি থিওরীর প্রতি বেশী আস্থাশীল করেছে। এই থিওরী মুতাবিক, আজ থেকে **৪.৫ কিংবা ৪.৬ বিলিয়ন (৪৫০ বা ৪৬০ কোটি বৎসর)** পূর্বে ঘূর্ণনরত আন্তঃতারা গ্যাস-ক্লাউড থেকে আমাদের সূর্য ও তার সকল পরিবারবর্গের জন্ম হয়। এই বিরাট মাত্রার গ্যাসীয় বস্তু আসলো কোত্থেকে, সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে অপর এক বা একাধিক তারার বিস্ফোরণ থেকে এই বস্তু এসেছে। গ্যাসখণ্ড তার নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে জড়ো হতে থাকে। এই ঘূর্ণনরত গ্যাসের মধ্যখানে সূর্য আত্মপ্রকাশ করে এবং বাইর দিকে ছোট ছোট খণ্ড জড়ো হয়ে গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম দেয়। সূর্যের মধ্যে জড়ের মাত্রা অত্যধিক থাকায় এর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে কেন্দ্রের মধ্যে শুরু হয় **আনবিক ফিউশন প্রতিক্রিয়া**। এই প্রতিক্রিয়া আজো অব্যাহত আছে

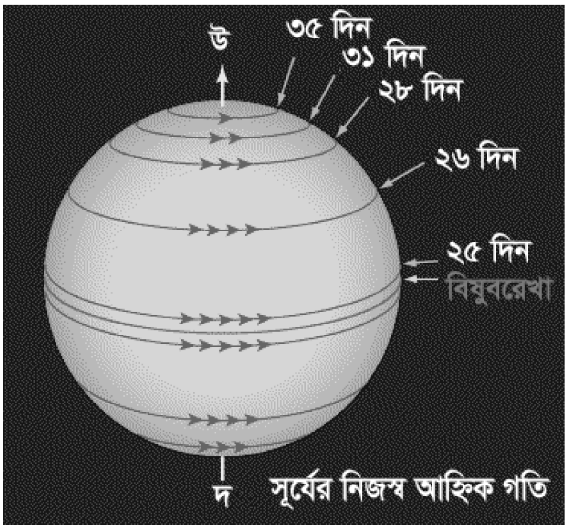
এবং এরই ফলে সূর্য থেকে নির্গত হয় উজ্জ্বল আলো ও তাপ।

জন্ম নিলে মৃত্যু হবে- এটাই নিয়ম। সূর্যের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সে অনন্তকাল জ্বলন্ত থাকতে পারবে না। একদিন তার অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়ার জ্বালানি- হাইড্রোজেন, শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত **৪.৫ বিলিয়ন বছর** প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখতে যেয়ে এই জ্বালানির **৩৭%** ব্যয় হয়েছে। সূর্য ফিউশন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে **৭ বিলিয়ন বছর পরে সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিবর্তিত হবে**- তখন সূর্য মৃত্যুর পথযাত্রী হয়ে পড়বে। কিভাবে আমাদের এই তারার মৃত্যু



ঘটবে? যে উপায়ে তা হবে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সে বর্ণনা শুনলে সত্যিই শরীরে শিহরণ জেগে উঠে।

সূর্যের ঔজ্জ্বল্যতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তার কেন্দ্রে হিলিয়ামের মাত্রা বেড়ে ওঠবে। হাইড্রোজেন সাপ্লাইয়ের পরিমাণ কমতে থাকলেও সূর্যকে নিজের মধ্যে **কলাপ্স** হওয়া

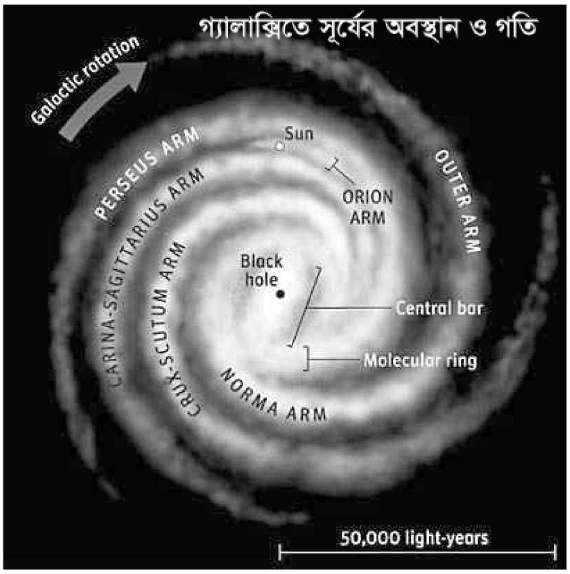


সূর্যের নিজস্ব আহ্নিক গতি

থেকে বেঁচে থাকতে কেন্দ্রের চাপ যথেষ্ট রেখে যেতে হবে। আর একমাত্র তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটা সম্ভব। সুতরাং এই বৃদ্ধিকরণের ফলে আনবিক প্রতিক্রিয়ার রেইটও বাড়বে, যার ফলে সূর্যটি আরোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। আজ থেকে **৩ বিলিয়ন বছর** পর সূর্য এতোই গরম হবে যে পৃথিবীর সকল মহাসাগরের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে। এর আরোও **৪ বিলিয়ন বছর** পর সূর্যের যাবতীয় জ্বালানি শেষ হবে। এসময় আয়তন এতোই বৃদ্ধি পাবে যে, প্রথম গ্রহ বুধ সূর্যের অভ্যন্তরে চলে যাবে। এই অবস্থাকে বলে **'রেড জায়ান্ট'** স্টেজ। এই স্টেজে পাঁছার পর সূর্যের ঔজ্জ্বল্যতা আজ থেকে **২ হাজার গুণ** বেশী হবে। অবশ্য শুধু ঔজ্জ্বল্যতা নয় তাপমাত্রাও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর মধ্যস্থিত পাথর পর্যন্ত এই তাপে গলে যাবে। এসময় বাইর সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ অনেকটা বেশী গরম হয়ে ওঠবে।

জায়ান্ট তারা হিসাবে অবশ্য স্থায়ী থাকবে না আমাদের সূর্যটি- জ্বালানি শেষ হওয়ার পর নিজস্ব ভরকে আর অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখতে সক্ষম হবে না। সূর্য তখন দ্রুত ছোট্ট হওয়া শুরু কবরে এবং অবশেষে ছোট্ট একটি তারায় পরিণত হবে যার নাম হলো **'হুয়াইট ডোর্ফ'** বা **সাদা বামন**

তারা। সূর্যের ব্যাস তখন পৃথিবীর ব্যাস থেকে বেশী হবে না। তবে তার ভর বা ম্যাস হবে অনেক গুণ। ৮ বিলিয়ন বছর পরে সাদা বামনে রূপান্তরিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সূর্য তার এনার্জি হারিয়ে একদা নিভে যাবে। তখন **সূর্য হবে একটি মৃত তারা**।



আধুনিক যুগে মহাকাশ থেকে সৌরগবেষণা

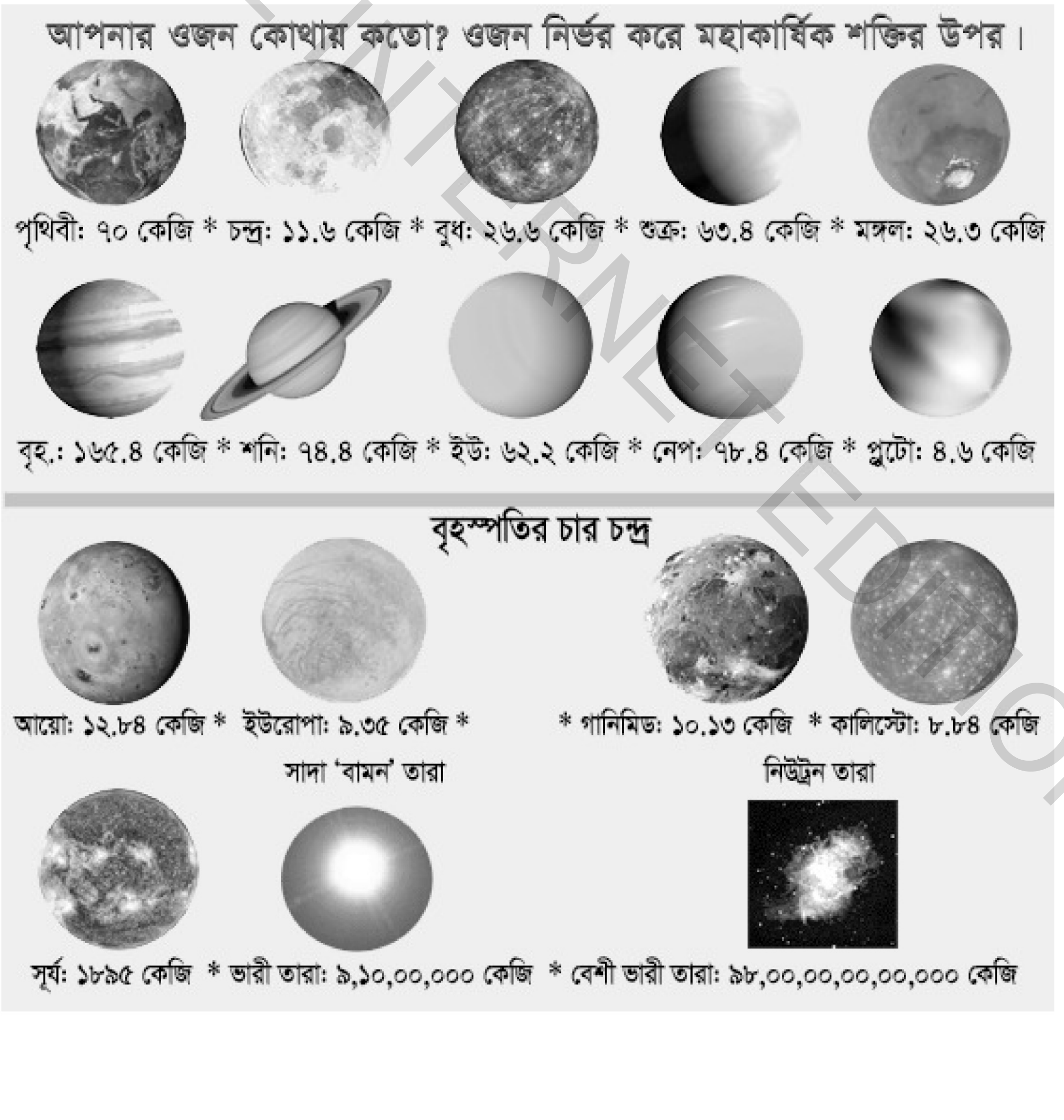
সূর্য সম্পর্কে অনেক তথ্য আধুনিক যুগে আবিস্কৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে **স্পুটনিক-২** নামক একটি মহাকাশযান প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেরণ করে। মহাকাশে স্পেইস ক্রাফ্‌ট প্রেরণের ইতিহাসে এটি ছিলো দ্বিতীয় যান- প্রথমটি ছিলো **স্পুটনিক-১**। **স্পুটনিক-২** কিছু বিশেষ যন্ত্রাদি নিয়ে যায়। এগুলো দ্বারা মহাকাশ থেকে সূর্য নিয়ে গবেষণা হয়। এরপর আজ পর্যন্ত বেশ ক'টি **'মিশন'** দ্বারা সূর্যের উপর গবেষণা চালানো হয়েছে। যেমন আমেরিকার **'পাইওনিয়ার'** মহাকাশযান। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্কের উপর গবেষণার উদ্দেশ্যে এই মিশনের সকল উপগ্রহে কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতি সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। এই প্রোগ্রামটি ১৯৫০ এর দশকের শেষে শুরু হয়ে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এরপর আমেরিকার **মারিনার-২** মহাকাশযান ১৯৬২ সালে কেনেডি স্পেইস সেন্টার থেকে উড্ডয়ন করে। এ ক্রাফ্‌টটি মূলত দ্বিতীয় গ্রহ বুধের উপর কাছে থেকে গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু বোনাস হিসাবে সূর্যকে মহাকাশ থেকে গবেষণার লক্ষ্যে কিছু বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রাফটের সঙ্গে প্রেরিত হয়। এই মিশনই **'সৌরবাতাস'** আবিষ্কার করে।



আমেরিকার **'নাসা'** মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ১৯৬০ ও ১০৭০ দশকে **'অরবিটিং সোলার অবজারভেটরী'** নামক একাধিক বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে। সূর্যের ১২ বৎসরের পুরো পিরিওডের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর এই উপগ্রহগুলো গবেষণা চালায়।

প্রিয় নভোচারী সহযাত্রী ভাইবোন! কাল্পনিক মহাকাশযানে সৌরজগতের সর্বত্র আমাদের এই অপূর্ব ভ্রমণের এখানেই শেষ। তবে একটি ব্যাপার এখনও বাকী আছে। আমাদেরকে তো ফিরে যেতে হবে নিজেদের বাসস্থান-গ্রহে? সুতরাং সেলেস্টিয়ার সুবাদে আমাদের কাল্পনিক মহাকাশযানটি সূর্যের কাছে থেকে পৃথিবীপানে ঘুরালাম। যা দৃশ্যমান হলো তা-ই পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে তুলে ধরেছি। দেখুন, কী ছোট্ট একটি গ্রহ আমাদের নীল পৃথিবীটা! চলুন, আর অপেক্ষা নেই। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে আমরা হয়ে পড়েছি ক্লান্ত। মা-গ্রহের বিরহে জর্জরিত! ফিরে যেতে হবে যারতার আরামদায়ক বাসগৃহে।

সমাপ্ত



*বিকল্প নামকরণ

কেন এই বিকল্প নামকরণ- এ প্রশ্নের জবাব দ্বিবিধ। **প্রথমত:** সৌরজগতের ৮টি বড় বস্তুর **'বাংলা'** নাম আছে। এদের মধ্যে **'পৃথিবী'** ছাড়া বাকী ৭টি সপ্তাহের ৭ বারের নামে নামকরণ হয়েছে। যেমন: **রবি (সূর্য), বুধ, শুক্র, সোম** (চন্দ্রের অপর নাম), **মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি**। সুতরাং অন্যান্যগুলোর **'বাংলা'** নামকরণ স্বভাবতই হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আজো হয় নি। **দ্বিতীয়ত:** ব্যক্তিগতভাবে কোন **'কাল্পনিক পৌরাণিক কাহিনী'**র চরিত্রের নামানুসারে গ্রহ-উপগ্রহের নামকরণ করা আমি পছন্দ করি না। আপনি হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না। তবে **'বাংলাকরণ'** ও **'সত্যানুসরণ'**র খাতিরে আমি গ্রহ-উপগ্রহের বিকল্প নাম উক্ত টেবিলে প্রকাশ করেছি। এসব নামকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিকল্প নামকরণের নিয়মনীতি

১. বাংলা ৬টি ঋতুর নামানুসারে গ্রহের নামকরণ: শনিগ্রহ থেকে দূরে ঘূর্ণনরত কয়েকটি গ্রহ ও **'বামন গ্রহের'** নামকরণ গ্রীক পৌরাণিক গল্পের চরিত্রের নামানুসারে করা হয়েছে। এগুলো হলো **'ইউরেনাস' (গ্রীষ্ম), 'নেপচুন' (বর্ষা), 'প্লুটো' (শরৎ), 'হোমিয়া' (হেমন্ত), 'এরিস' (শীত)** ও **'সেরেস' (বসন্ত)**। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, বাংলা ৭ বারের নামে ৭টি বস্তুর নামকরণ হয়েছে অনেক আগেই। সুতরাং এই ৬টি **'গ্রহের'** নামকরণ বাংলা ৬টি ঋতুর নামানুসারে রাখাই হবে সর্বাপেক্ষা যথাযথ।

২. আমাদের চন্দ্র পরে সৌরজগতের ১২টি বৃহৎ চাঁদের নামকরণ ১২ মাসের নামানুসারে: আমরা সপ্তাহের ৭ বারের নামে ৭টি বস্তুর নামকরণ করেছি। ৬টি ঋতুর নামানুসারে করেছি ৬টি গ্রহের নামকরণ। সুতরাং **১২** মাসের নামে বারোটি বৃহৎ চন্দ্রের নামকরণই হবে সর্বাপেক্ষা যথাযথ। এ **১২**টি চন্দ্রের অবস্থান হলো: বৃহস্পতির তিনটি বড় উপগ্রহ, যথা: **গানিমিড (বৈশাখ), কালিস্টো (জ্যৈষ্ঠ), আয়ো (আষাঢ়)**; শনির তিনটি বড় উপগ্রহ, যথা: **টাইটান (শ্রাবণ), রিয়া (ভাদ্র), আইয়াপেটাস (আশ্বিন)**; গ্রীষ্মের (ইউরেনাসের) তিনটি বড় উপগ্রহ, যথা: **টাইটানিয়া (কার্তিক), অবেরন (অগ্রহায়ণ), আম্ব্রিয়েল (পৌষ)**; এবং বর্ষার (নেপচুনের) তিনটি বড় উপগ্রহ, যথা: **ট্রাইটন (মাঘ), প্রটিউস (ফাল্গুন) ও নিরিদ (চৈত্র)**।

৩. তিনটি বামন গ্রহের ৬টি চন্দ্রের নামকরণ পৃথিবীর ৬টি মহাদেশের নামে: বামন গ্রহ (ডর্ফ প্লানেট) শরৎ, হেমন্ত ও শীতের (যথাক্রমে প্লুটো, হোমিয়া ও এরিস) আছে মোট ৬টি উপগ্রহ। পৃথিবীর বুকে মহাদেশের গুরুত্ব বিরাট। আমি ৬টি মহাদেশের নামে এই ৬টি উপগ্রহের নামকরণ করেছি। যথা: **ক্যারন (এশিয়া), নিক্স (আমেরিকা), হাইড্রা (আফ্রিকা), নামাকা (ইউরোপ), হাই'আয়াকা (এ্যান্টার্কটিকা) ও ডিসনোমিয়া (অস্ট্রেলিয়া)**। আশা রাখি এই নির্বাচন আপনার পছন্দ হবে।

৪. পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহের নামের অনুসরণে অন্যান্য উপগ্রহের নামকরণ: মানবিক ভাবের আদান-প্রদান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, উন্নয়ন ও বিকাশে ভাষার বিকল্প নেই। সুতরাং ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, ন্যুনত লক্ষাধিক মানুষ কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা **১৩০০**; তিন লক্ষ বা ততোধিক মানুষ কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা **৭৫০টি**; দশ লক্ষ বা বেশী লোক কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা **৪০০**; ন্যূনত ত্রিশ লক্ষ মানুষ কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা **২০০**; এক কোটি কিংবা বেশী লোক কথা বলেন এমন মাতৃভাষার সংখ্যা **৮০টি**; এবং পৃথিবীর বুকে মোট **৪০টি** ভাষা আছে যাদের মোট বক্তার সংখ্যা তিন কোটি বা বেশী। সুতরাং মানব-বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ভাষার নামানুসারে আমাদের

চন্দ্র বাদে সৌরজগতের এ পর্যন্ত জানা বাকী **১৭৩টি** নেচারেল উপগ্রহের নামকরণ ভাষার নামে করাই হবে যথাযথ। অন্তত, আমি তা-ই মনে করি। অবশ্য চাঁদের বড়ত্বের দিকে খিয়াল রেখে প্রথম চল্লিশটি প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র ব্যবহৃত ভাষার নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের নামকরণ করেছি।

মাজান্দারানি-গিলাকি, শান, লিথওয়ানিয়ান, গালিসিয়াম, জামেইকান-ক্রিওলি, সান, ইয়োয়ি, পিয়েমন্টিজ, কিম্বুন্ডু ও কিরজিজ- এই দশটি ভাষা নামকরণে আসে নি। আমি এজন্য দুঃখিত। চন্দ্রের সংখ্যা শেষ হয়ে যাওয়ায় ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ মানুষের ভাষা হয়েও এগুলোর একটিও বিকল্প নাম হিসাবে সম্পৃক্ত করা যায় নি। ভবিষ্যতে যদি নতুন কোন চন্দ্রের আবিষ্কার হয়- তাহলে এসব ভাষার নামানুসারে নামকরণের চেষ্টা চালাবো- যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন ও এই গ্রন্থের নতুন কোন সংস্করণ করতে সমর্থ হই।

লক্যাল ইন্টারেস্ট হিসাবে এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাচ্ছি। **আমাদের বাংলা ভাষা পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানে আছে।** ২০০৯ সালের হিসাব মতে পৃথিবীর **১০টি** দেশে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। মাতৃভাষা হিসাবে এ ভাষায় কথা বলেন মোট **১৮ কোটি ২০ লক্ষাধিক মানুষ।** সুতরাং প্রথম ৬টি বড় উপগ্রহের নামকরণের মধ্যে **'বাংলা'** নামটিও স্ব-যোগ্যতায়ই এসে গেছে। অন্য আরেক ব্যাপার হলো, **'রংপুরী'** আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন **১ কোটি ৫০ লক্ষাধিক মানুষ, 'চিট্টাগোনিয়ান' আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন ১ কোটি ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ এবং 'সিলেটি' আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক মানুষ।** সুতরাং মাতৃভাষা হিসাবে এ তিনটি **'বাংলাদেশী'** ভাষাও বিভিন্ন তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে হিসাবে সৌরজগতের তিনটি চাঁদের নামকরণও করেছি এই তিনটি ভাষার নামানুসারে।

নভোচারী পাঠকের মনের খোরাক যোগান দিতে এখানে কোন্ গ্রহের কোন্ চন্দ্রের বিকল্প নাম হিসাবে আমাদের ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তা জানিয়ে দিচ্ছি। বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্র **'মিটিস'** এর বিকল্প নাম হয়েছে **'বাংলা'**, বৃহস্পতির **'তেলজিনো'** নামক উপগ্রহের বিকল্প নাম হয়েছে **'চিট্টাগোনিয়ান'**, শনি গ্রহের **'এটলাস'** নামক চন্দ্রের বিকল্প নামকরণ হয়েছে **'সিলেটি'** এবং বৃহস্পতি গ্রহের **'এস/২০০৩ জে৪'** এর বিকল্প নামকরণ হয়েছে **'রংপুরী'**।

৫. আগের যুগের প্রসিদ্ধ দু'টি বিজ্ঞান গবেষণার ভাষার নামানুসারে পৃথিবীর পড়শী মঙ্গলের দু'টি চন্দ্রের নামকরণ: উপরোক্ত নীতিমালা ৪ এর অংশ হিসাবে মঙ্গলের দু'টি গ্রহের নামকরণ প্রাচীন গ্রীক ও আরবী ভাষার নামানুসারে করাটা আমার নিকট যথাযথ বলে মনে হয়েছে। গ্রীকরা **'বিজ্ঞানের জনক'** বলে খ্যাত। কিন্তু আরবরা তাদের সমুন্নত আরবী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দ্বারা পুরো পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করেছিলেন। উভয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন হেতু মঙ্গলের দু'টি চাঁদ **'ডাইমোস'** ও **'ফবোস'**-এর নামকরণ যথাক্রমে **'গ্রীক'** ও **'আরবী'** করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা, এ নির্বাচনটিও আপনাদের অপছন্দ হবে না।

পরিশিষ্ট

এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি

টেবিল -১

সূর্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

সূর্য		পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা	
পরিমাণ, আয়তন, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য	পমিরাণ	পরিমাণ	অনুপাত
ওজন (ম্যাস) ($\times১০^{২৪}$ কিগ্রা) - Mass	১৯,৮৯,১০০	৫.৯৭৩৬	৩,৩৩,০০০
ভলিউম (ঘনত্ব) ($\times১০^{১২}$ কিগ্রা^{৩}) -Volume	১,৪১২,০০০	১.০৮৩	১,৩০৪,০০০
গড় ব্যাসার্ধ (কিমি)	৬৯৬,০০০	৬৩৭১	১০৯.২
গড় ডেনসিটি (ঘনাঙ্ক) (কিগ্রা/মি^{৩})	১৪০৮	৫৫১৫	০.২৫৫
পৃষ্ঠদেশের মহাকর্ষ (মি/সে^{২})	২৭৪.০	৯.৭৮	২৮.০
মুক্তগতি (কিমি/সে)	৬১৭.৬	১১.১৯	৫৫.২
দৃশ্যত ঔজ্জ্বল্য	-২৬.৭৪	-৩.৮৬	
প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য	+৪.৮৩		
ম্যাস (বস্তু) রূপান্তর হার ($\times১০^{৬}$ কিগ্রা/সে)	৪৩০০		
গড় এনার্জি উৎপাদন (জুল্‌স / কিগ্রা)	০.১৯৩৭		
পৃষ্ঠদেশ থেকে এনার্জি বিকিরণ হার ($\times১০^{৬}$ জুল্‌স / মি^{২}সে)	৬৩.২৯		
বর্ণচ্ছটা ধরন (স্পেকট্রেল টাইপ)	G2 V		
কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য			
কেন্দ্রীয় চাপ (বার)	২.৪৭৭ x ১০^{১১}		
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা (কেলভিন)	১.৫৭১ x ১০^{৭}		
কেন্দ্রীয় ঘনাঙ্ক (কিগ্রা/মি^{২})	১.৬২২ x ১০^{৫}		
ঘূর্ণন ও প্রদক্ষিণ গতি সম্পর্কিত তথ্য			
নাক্ষত্রিক ঘূর্ণন পিরিওড (ঘণ্টা)	৬০৯.১২	২৩.৯৩৪৫	২৫.৪৪৯
পরিক্রমণ পথের কাত (ডিগ্রী)	৭.২৫	২৩.৪৫	০.৩০৯
নিকটস্থ তারার সঙ্গে তূল্য গতি (গ্যালাক্টিক গতি) (কিমি/সে)	১৯.৪		
পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য			
পৃথিবী থেকে দৃশ্যত ব্যাস (১ এইউ দূরত্বে-আর্ক সেকেন্ড)	১৯১৯		
সর্বোচ্চ দূরত্বে (আর্ক সেকেন্ড)	১৯৫২		

সর্বনিম্ন দূরত্বে (আর্ক সেকেন্ড)	১৮৮৭		
পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব ($\times$১০^{৬} কিমি)	১৪৯.৬		
পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব ($\times$১০^{৬} কিমি)	১৪৭.১		
পৃথিবী থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব ($\times$১০^{৬} কিমি)	১৫২.১		
সূর্যের মেগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কিত তথ্য			
(সূর্যের বিভিন্ন অংশে মেগনেটিক ফিল্ডের শক্তি)			
পোলার ফিল্ড (গাউস (Gauss))[¤]	১ থেকে ২		
সূর্যকলঙ্ক (গাউস)	৩০০০		
উদগ্রতাসমূহে (Prominences) (গাউস)	১০ থেকে ১০০		
ক্রমোস্ফিয়ারের সৈকতে (গাউস)	২০০		
ক্রমোস্ফিয়ারের উজ্জ্বল নেটওয়ার্কে (গাউস)	২৫		
উভয় মেরুর সক্রিয় অঞ্চলে (গাউস)	২০		
সূর্যের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত তথ্য			
পৃষ্ঠদেশে গ্যাসীয় চাপ (ফটোস্ফিয়ারের উপরে) (মিলিবার)	০.৮৬৮		
ফটোস্ফিয়ারের নিম্নের চাপ (মিলিবার)	১২৫		
কার্যকর তাপমাত্রা (কেলভিন)	৫৭৭৮		
ফটোস্ফিয়ারের উপরস্থ তাপমাত্রা (কেলভিন)	৪৪০০		
ফটোস্ফিয়ারের নিম্নস্থ তাপমাত্রা (কেলভিন)	৬৬০০		
ক্রমোস্ফিয়ারের উপরস্থ তাপমাত্রা (কেলভিন)	প্রায় ৩০,০০০		
ফটোস্ফিয়ারের গাঢ়ত্ব (কিমি)	৫০০		
ক্রমোস্ফিয়ারের গাঢ়ত্ব (কিমি)	প্রায় ২৫০০		
সূর্যকলঙ্ক পিরিওড (বৎসর)	১১.৪		
ফটোস্ফিয়ারের মৌলিক পদার্থ	হাইড্রোজেন (৯০.৯৬৫%), হিলিয়াম (৮.৮৮৯%)		
ফটোস্ফিয়ারের অন্যান্য পদার্থ	অক্সিজেন, কার্বন, নিওন, নাইট্রোজেন, লৌহ, ম্যাগনেজিয়াম, সিলিকন ও সালফার।		

তথ্যসূত্র: NASA Goddard Space Flight Center

[¤] GAUSS - symbol G (উচ্চারণ: গাউস): চুম্বকীয় ফিল্ডের শক্তি নির্ধারণের একটি একক (ইউনিট)।
১ জি = ০.০০০৪ টেলসা (telsa)।

টেবিল-২

পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

সূর্য থেকে যে দূরত্বে ঘূর্ণমান আছে (উপ-প্রধান অক্ষরেখা): আধুনিক (মেট্রিক): ১৪,৯৫,৯৮,২৬২ কিমি। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৯২,৯৫৬,০৫০ মাইল। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ১.৪৯৫৯৮২৬ x $১০^{৮}$ কিমি (১.০০০ এইউ)।

সূর্য থেকে দূরতম অবস্থান: আধুনিক (মেট্রিক): ১৫,২০,৯৮,২৩৩ কিমি। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৯,৪৫,০৯,৪৬০ মাইল। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ১.৫২০৯৮ x $১০^{৮}$ কিমি (১.০১৭ এইউ)।

বৎসরের দৈর্ঘ্য (বার্ষিক গতি): ১.০০০০১৭৪ পৃথিবী-বৎসর। ৩৬৫.২৬ পৃথিবী-দিবস।

প্রদক্ষিণপথের পরিধিরেখার দৈর্ঘ্য: আধুনিক (মেট্রিক): ৯৩,৯৮,৮৭,৯৭৪ কিমি। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৫৮,৪০,১৯,৩১১ মাইল। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ৯.৩৯৯ x $১০^{৮}$ কিমি।

গড় প্রদক্ষিণ গতি: আধুনিক (মেট্রিক): ১,০৭,২১৮ কিমি/ঘণ্টা। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৬৬,৬২২ মাইল প্রতি ঘণ্টা। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ২.৯৭৮৩ x $১০^{৪}$ মি/সে।

প্রদক্ষিণ ভিন্নকেন্দ্রিকতা: ০.০১৬৭১১২৩

প্রদক্ষিণ ঢাল: ০.০০০০৫ ডিগ্রী।

প্রদক্ষিণ থেকে বিষুবরেখার ঢাল: ২৩.৪৩৯৩ ডিগ্রী।

গড় ব্যাসার্ধ: আধুনিক (মেট্রিক): ৬,৩৭১.০০ কিমি। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৩,৯৫৮.৮ মাইল। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ৬.৩৭১০ x $১০^{৩}$ কিমি।

বিষুবরেখা বরাবর পরিধিরেখার দৈর্ঘ্য: আধুনিক (মেট্রিক): ৪০,০৩০.২ কিমি। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ২৪,৮৭৩.৬ মাইল। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ৪.০০৩০২ x $১০^{৪}$ কিমি।

ঘনমান (ভলিউম): আধুনিক (মেট্রিক): ১০৮,৩২০,৬৯,১৬,৮৪৬ $কিমি^{৩}$ । পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ২৫,৯৮৭,৫১,৫৯,৫৩২ $মাইল^{৩}$ । বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ১.০৮৩২১ x $১০^{১২}$ $কিমি^{৩}$ ।

ওজন (ম্যাস): আধুনিক (মেট্রিক): ৫,৯৭২,১৯,০০,০০০,০০,০০,০০০,০০,০০,০০০ কিগ্রা । বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ৫.৯৭২২ x $১০^{২৪}$ কিগ্রা ।

ঘনত্ব (ডেনসিটি): আধুনিক (মেট্রিক): ৫.৫১৩ গ্রা/$সেমি^{৩}$ ।

পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল (সারফেস এরিয়া): আধুনিক (মেট্রিক): ৫১০,০৬৪,৪৭২ $কিমি^{২}$। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ১৯৬,৯৩৬,৯৯৪ $মাইল^{২}$। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ৫.১০০৬ x $১০^{৮}$ $কিমি^{২}$।

পৃষ্ঠদেশে মহাকর্ষ: আধুনিক (মেট্রিক): ৯.৮০৬৬৫ মি/$সে^{২}$। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ৩২.০৪১ ফুট/$সে^{২}$।

মুক্তগতি: আধুনিক (মেট্রিক): ৪০,২৮৪ কিমি/ঘণ্টা। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): ২৫,০৩১ মাইল/ঘণ্টা। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ১.১১৯ x $১০^{৪}$ মি/সে।

নাক্ষত্রিক ঘূর্ণন পিরিওড (দিবস দৈর্ঘ্য): ০.৯৯৭২৬৯৬৮ পৃথিবী-দিবস। ২৩.৯৩৪ ঘণ্টা।

সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ পৃষ্ঠদেশ তাপমাত্রা: আধুনিক (মেট্রিক): -৮৮/৫৮ (সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ) ডিগ্রী সেন্টি.। পুরাতন (ইম্পেরিয়্যাল): -১২৬/১৩৬ (সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ) ডিগ্রী ফা.। বৈজ্ঞানিক লিখন পদ্ধতি: ১৮৫/৩৩১ (সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ) ডিগ্রী কে.।

তথ্যসূত্র: NASA Goddard Space Flight Center

টেবিল-৩
নয়টি গ্রহ ও আমাদের চন্দ্রের তথ্যাদি

*পৃথিবী থেকে দূরত্ব । সূত্র: NASA, Goddard Space Flight Center

বৈশিষ্ট্য / নাম বিকল্প নাম	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস / গ্রীষ্ম	নেপচুন / বর্ষা	প্লুটো / শরৎ
ম্যাস- বস্তুর মাত্রা ($\times$১০[২৮] কিগ্রা)	০.৩৩০	৪.৮৭	৫.৯৭	০.০৭৩	০.৬৪২	১৮৯৯	৫৬৮	৮৬.৮	১০২	০.০১২৫
ব্যাস (কিমি)	৪৮৭৯	১২,১১	১২,৭৫৬	৩৪৭৫	৬৭৯২	১৪৩	১২০,৫৩৬	৫১,১১৮	৪৯,৫২৮	২৩৯০
ঘনাঙ্ক (কিগ্রা/মি[৩])	৫৪২৭	৫২৪৩	৫৫১৫	৩৩৪০	৩৯৩৩	১৩২৬	৬৮৭	১২৭০	১৬৩৮	১৭৫০
মহাকর্ষ (মি/সে[২])	৩.৭	৮.৯	৯.৮	১.৬	৩.৭	২৩.১	৯.০	৮.৭	১১.০	০.৬
মুক্তগতি (কিমি/সে)	৪.৩	১০.৪	১১.২	২.৪	৫.০	৫৯.৫	৩৫.৫	২১.৩	২৩.৫	১.১
ঘূর্ণন পিরিওড (ঘণ্টা)	৪০৭.৬	-৫৮৩২.৫	২৩.৯	৬৫৫.৭	২৪.৬	৯.৯	১০.৭	-১৭.২	১৬.১	-১৫৩.৩
দিনের দৈর্ঘ্য (ঘণ্টা)	৪২২২.৬	২৮০২.০	২৪.০	৭০৮.৭	২৪.৭	৯.৯	১০.৭	১৭.২	১৬.১	১৫৩.৩
সূর্য থেকে দূরত্ব ($\times$১০[৬] কিমি)	৫৭.৯	১০৮.২	১৪৯.৬	০.৩৮৪*	২২৭.৯	৭৭৮.৬	১৪৩৩.৫	২৮৭২.৫	৪৪৯৫.১	৫৮৭০.০
সর্বনিম্ন দূরত্ব ($\times$১০[৬] কিমি)	৪৬.০	১০৭.৫	১৪৭.১	০.৩৬৩*	২০৬.৬	৭৪০.৫	১৩৫২.৬	২৭৪১.৩	৪৪৪৪.৫	৪৪৩৫.০
সর্বোচ্চ দূরত্ব ($\times$১০[৬] কিমি)	৬৯.৮	১০৮.৯	১৫২.১	০.৪০৬*	২৪৯.২	৮১৬.৬	১৫১৪.৫	৩০০৩.৬	৪৫৪৫.৭	৭৩০৪.৩
প্রদক্ষিণ পিরিওড (দিন)	৮৮.০	২২৪.৭	৩৬৫.২	২৭.৩	৬৮৭.০	৪৩৩১	১০,৭৪৭	৩০,৫৮৯	৫৯,৮০০	৯০,৫৮৮
প্রদক্ষিণ গতি (কিমি/সে)	৪৭.৯	৩৫.০	২৯.৮	১.০	২৪.১	১৩.১	৯.৭	৬.৮	৫.৪	৪.৭
প্রদক্ষিণ ঢাল (ডিগ্রী)	৭.০	৩.৪	০.০	৫.১	১.৯	১.৩	২.৫	০.৮	১.৮	১৭.২
প্রদক্ষিণ ভিন্নকেন্দ্রিতা	০.২০৫	০.০০৭	০.০১৭	০.০৫৫	০.০৯৪	০.০৪৯	০.০৫৭	০.০৪৬	০.০১১	০.২৪৪
অক্ষরেখার কাত (ডিগ্রী)	০.০১	১৭৭.৪	২৩.৪	৬.৭	২৫.২	৩.১	২৬.৭	৯৭.৮	২৮.৩	১২২.৫
গড় তাপমাত্রা (সেন্টি)	১৬৭	৪৬৪	১৫	-২০	-৬৫	-১১০	-১৪০	-১৯৫	-২০০	-২২৫
পৃষ্ঠদেশ চাপ (বার)	০	৯২	১	০	০.০১	অজানা	অজানা	অজানা	অজানা	০
রিং আছে কি?	না	না	না	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না
গ্রহে চুম্বক-ফিল্ড?	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	অজানা
চন্দ্রের সংখ্যা	০	০	১	০	২	৬৩	৬২	২৭	১৩	৩

টেবিল-৪

বামন গ্রহ ও তাদের তথ্যাদি

(প্লুটোকেও এখন ডর্ফ (বামন) গ্রহ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পুটোর তথ্যাদি টেবিল-৩-এ দেওয়া হয়েছে।)

বৈশিষ্ট্য / নাম বিকল্প নাম	হোমিয়া / হেমন্ত	সেরেস / শীত	এরিস / বসন্ত	মাকেমাকি / ঋতু
আবিষ্কারের বৎসর	২০০৪	১৮০১	২০০৫	২০০৫
ম্যাস- বস্তুর মাত্রা	৪.০০৬ x ১০^{২১} কিগ্রা	৯.৪৩ x ১০^{২০} কিগ্রা	১.৬৭ x ১০^{২২} কিগ্রা	৩ x ১০^{২৪} কিগ্রা
ব্যাস (কিমি)	৭১৮		১১৬৩	১৫০০ কিমি (আনু.)
ঘনাঙ্ক (গ্রা/সেমি^{৩})	২.৬	২.০৭৭	২.৫২	২
মহাকর্ষ (মি/সে^{২})	০.৪৪	০.২৭	০.৮২৭	০.৪
মুক্তগতি (কিমি/সে)	০.৮৪	০.৫১	১.৩৮৪	০.৭৫
ঘূর্ণন পিরিওড (ঘণ্টা)	৩.৯১৫	৯.০৭৪	২৫.৯	৭.৭৭১
সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব (এইউ)	৫১.৫৪৪	২.৯৮৫৮	৯৭.৬৬	৫৩.০৭৪
সূর্য থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব (এইউ)	৩৪.৭২১	২.৫৪৬৮	৩৭.৭৭	৩৮.৫০৯
প্রদক্ষিণ পিরিওড (বৎসর)	২৮৩.২৮	৪.৬০	৫৫৭	৩০৯.৮৮
গড় প্রদক্ষিণ গতি (কিমি/সে)	৪.৮৪৮	১৭.৮৮২	৩.৪৩৬	৪.৪১৯
প্রদক্ষিণ ঢাল (ডিগ্রী)	২৮.২২	১০.৫৮৫	৪৪.১৮৭	২৮.৯৬
প্রদক্ষিণ ভিন্নকেন্দ্রিতা	০.১৯৫	০.০৭৯৩৪	০.৪৪১	০.১৫৯
পৃষ্ঠদেশ তাপমাত্রা (কে)	৫০	১৬৮ থেকে ২৩৫		
চন্দ্রের সংখ্যা	২ (হাই'আয়িকা ও নামাকা)	নেই	১ (ডিসনোমিয়া /	এখনো পাওয়া যায় নি

সূত্রঃ NASA Goddard Space Flight Center

টেবিল-৫

সৌরজগতের চন্দ্রসমূহ

অক্টোবর ০৮ পর্যন্ত জানা মোট চন্দ্রের সংখ্যা ১৭৪টি। এর মধ্যে ১৬৮টি যারতার প্রকৃত গ্রহ (পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস (গ্রীষ্ম) ও নেপচুন (বর্ষা)) প্রদক্ষিণ করে। বাকী ৬টি চাঁদ স্ব-স্ব 'বামন গ্রহ' (সেরেস (শীত), প্লুটো (শরৎ), হোমিয়া (হেমন্ত) মাকেমাকি এবং এরিস (বসন্ত) প্রদক্ষিণ করে। *

গ্রহ / বিকল্প নাম	আবিষ্কার সাল (ঈ)	গ্রহ থেকে দূরত্ব (কিমি)	ব্যাস (কিমি)	প্রদক্ষিণ পিরিওড (দিন)
পৃথিবী (১টি চাঁদ)				
চন্দ্র	আদি যুগ	৩৮৪,৪০০	৩৪৭৬	২৭.৩২২
মঙ্গল (২টি চাঁদ)				
ডাইমস / গ্রীক	১৮৭৭	২৩,৪৬০	৮	১.২৬৩
ফবোস / আরবী	১৮৭৭	৯,২৭০	২৮ x ২০	০.৩১৯
বৃহস্পতি (৬৩টি চন্দ্র)				
এডরাস্টিয়া / টাইওয়ানিজ	১৯৭৯	১২৮,৯৮০	২৬ x ১৬	০.২৯৮
এইটনি / গুজরাটি	২০০১	২৩,৫৪৭,০০০	৩	৭৩৬
আমলথিয়া / চাইনিজ	১৮৯২	১৮১৩০০	২৬২ x ১৩৪	০.৪৯৮
আনানকি / পোলিশ	১৯৫১	২১,২০০,০০০	২০	৬৩১
আওইডি / ফার্সি	২০০৩	২৩,৮০৭,৬৫৫	৪	৭৪৮.৮
আর্কি / ভজপুরী	২০০২	২৩,০৬৪,০০০	৩	৭১৫.৬
অটোনোউ / আওয়াদি	২০০১	২৪,১২২,০০০	৪	৭৫৩
কালিস্টো / জ্যৈষ্ঠ	১৬১০	১,৮৮৩,০০০	৪,৮০০	১৬.৬৮৯
কারমি / ইউক্রেনিয়ান	১৯৩৮	২২,৬০০,০০০	৩০	৬৯২
ক্যালিরউ / মালে	২০০০	২৪,২০০,০০০	১০	৭৭৪
কার্পো / মালেয়ালাম	২০০৩	১৭,১০০,০০০	৩	৪৬৫.৫
শাল্ডিন / কান্নাদা	২০০০	২৩,১৭৯,০০০	৩.৮	৭৪১
সাইলিন / মাইথিলি	২০০৩	২৪,০০০,০০০	২	৭৩৭.৮
এরিনোম / সুন্দানিজ	২০০০	২৩,২৭৯,০০০	৩.২	৬৭২
ইউনদি / বার্মিজ	২০০১	২১,০১৭,০০০	৩	৬২২
ইউকেলেইড / অরিয়া	২০০৩	২৪,৫৫৭,২৯৫	৪	৭৪৬.৪
ইউপোরিস / মারওয়ারি	২০০১	১৯,৩৯৪,০০০	২	৫৩৪
ইউরোপা / লাতিন	১৬১০	৬৭০,৯০০	৩১২৬	৩.৫৫১
ইউরিডোম / হাক্কা	২০০১	২৩,২১৯,০০০	৩	৭১৩

গানিমিড / বৈশাখ	১৬১০	১,০৭০,০০০	৫২৭৬	৭.১৫৫
হারপালইক / থাই	২০০০	২১,১০৫,০০০	৪.৩	৫৯৫
হিজেমোন / হোউসা	২০০৩	২৪,৫১৪,০৯৫	৩	৭৮১.৬
হিলাইক / তাগালগ	২০০৩	১০,৯৭২,৮৩০	৪	২৩৩.৮
হারমিপি / রোমানিয়ান	২০০১	২১,২৫২,০০০	৪	৬৩০
হিমালিয়া / স্পানিশ	১৯০৪	১১,৪৮০,০০০	১৭০	২৫০.৫৭
আয়ো / আষাঢ়	১৬১০	৪২১,৬০০	৩৬২৯	১.৭৬৯
লকাস্টি / ডাচ	২০০০	২১,২৬৯,০০০	৫.২	৬৫৭
আইসোনোন / গ্যান	২০০০	২৩,২১৭,০০০	৩.৮	৭১২
কেইল / সিন্ধি	২০০১	২৩,১২৪,০০০	২	৬০৯
কালিকোর / উজবেক	২০০৩	২২,৩৯৫,৩৯০	২	৬৮৩.০
কালাইক / আজারবাইজানি	২০০০	২৩,৫৮৩,০০০	৫.২	৭৬০
কোরি / রাজাস্থানি	২০০৩	২৪,৫৪৩,০০০	২	৭৭৯.২
লিডা / লাও-ইসান	১৯৭৪	১১,০৯৪,০০০	১০	২৩৮.৭২
লাইসিথিয়া / ইয়োরবা	১৯৩৮	১১,৭২০,০০০	২৪	২৫৯.২২
মেজাক্লাইট / ইগবো	২০০০	২৩,৮০৬,০০০	৫.৪	৭৭১
মিটিস / বাংলা	১৯৭৯	১২৭,৯৬০	৪০	০.২৯৫
নিমি / বারবার	২০০৩	২১,০৬৯,০০০	২	৬২০.০৪
অরথোসি / আহমারিক	২০০১	২১,১৬৮,০০০	২	৬১৭
পাসিফেই / পর্তুগিজ	১৯০৮	২৩,৫০০,০০০	৩৬	৭৩৫
পাসিদি / অরেমো	২০০১	২৩,০২৯,০০০	২	৭১৫
প্রাক্সিডাইক / চাট্টিসগোরি	২০০০	২১,১৪৭,০০০	৬.৮	৬৩২
সাইনোপ / আসামী	১৯১৪	২৩,৭০০,৭০০	২৮	৭৫৮
স্পন্ড / কুর্দিস	২০০১	২৩,৮০৮,০০০	২	৭৩২
এস/২০০০ জে১১ / সার্ভো-ক্রোয়েশিয়ান	২০০০	১২,৫৫৫,০০০	৪.০	২৮৪.৩
এস/২০০৩ জে২ / সিংহালিজ	২০০৩	২৮,৫৭০,৪১০	২	৯৮২.৫
এস/২০০৩ জে৩ / সেবুয়ানো	২০০৩	১৮,৩৩৯,৮৮৫	২	৫০৪.০
এস/২০০৩ জে৪ / রংপুরী	২০০৩	২৩,২৫৭,৯২০	২	৭২৩.২
এস/২০০৩ জে৫ / মালাগাছে	২০০৩	২৪,০৮৪,১৮০	৪	৭৫৯.৭
এস/২০০৩ জে৯ / খেমের	২০০৩	২২,৪৪১,৬৮০	১	৬৮৩.০
এস/২০০৩ জে১০ / শত-সোয়ানা	২০০৩	২৪,২৪৯,৬০০	২	৭৬৭.০

এস/২০০৩ জে১২ / নেপালি	২০০৩	১৯,০০২,৪৮০	১	৫৩৩.৩
এস/২০০৩ জে১৫ / রুয়ান্দা-রুন্দি	২০০৩	২২,০০০,০০০	২	৬৬৮.৪
এস/২০০৩ জে১৬ / সুমালি	২০০৩	২১,০০০,০০০	২	৫৯৫.৪
এস/২০০৩ জে১৭ / মাদুরিস	২০০৩	২২,০০০,০০০	২	৬৯০.৩
এস/২০০৩ জে১৮ / হারিয়ানভি	২০০৩	২০,৭০০,০০০	২	৬০৬.৩
এস/২০০৩ জে১৯ / ফুলা	২০০৩	২২,৮০০,০০০	২	৭০১.৩
এস/০৩ জে২৩ / ভবরিয়ান	২০০৩	২৩,৫৬৩,০০০	২	৭৩২.৪৪
টাইজিট / মাগাহি	২০০০	২৩,৩৬০,০০০	৫.০	৬৮৭
থিবি / ইংলিশ	১৯৭৯	২২১,৯০০	১০০	০.৬৭৫
তেলজিনো / চিট্টাগোনিয়ান	২০০৩	২১,১৬২,০০০	২	৬২৮.০৯
থেমিস্টো / ডেকান	১৯৭৫	৭,৫০৭,০০০	৮	১৩০.০৭
থাইওন / হাঙ্গেরিয়ান	২০০১	২১,৩১২,০০০	৪	৬১৫
শনিগ্রহ (৬২টি চন্দ্র)				
এজির / চাটালান	২০০৫	২০,৭৩৫,০০০	৬	১,১১৬.৫
আলবিওরিক্স / শোনা	২০০০	১৬,৩৯২,০০০	৩০	৭৮৩
আনথি / মিন-বেই	২০০৪	১৯৭,৭০০	১	১.০৪
এটলাস / সিলেটি	১৯৮০	১৩৭,৬৪০	৩৭ x ২৭	০.৬০২
বেবহিওন / জুলু	২০০৫	১৭,১১৯,০০০	৬	৮৩৪.৮
বার্জেলমির / চেক	২০০৫	১৯,৩৩৮,০০০	৬	১,০০৫.৯
বেসলা / কানোউজি	২০০৫	২০,১২৯,০০০	৭	১,০৮৩.৬
কালিপ্সো / বুলগেরিয়ান	১৯৮০	২৯৪,৬৬০	৩০ x ১৬	১.৮৮৮
ডাফনিস / মিন-দং	২০০৫	১৩৬,৫০০	৭	০.৫৯৪
ডাইওনি / রাশিয়ান	১৮৮৪	৩৭৭,৪০০	১১২০	২.৭৩৭
এনসেলেডাস / জার্মান	১৭৮৯	২৩৮,০২০	৪৯৮	১.৩৭০
এপিমেথিউস / লম্বার্ড	১৯৬৬	১৫১,৪২২	১৩৮ x ১১০	০.৬৯৪
এরিয়াপো / ওয়াইগোর	২০০০	১৭,৬১১,০০০	১০	৮৭১.১৭
ফারবোটি / চিওয়া	২০০৫	২০,৩৯০,০০০	৫	১,০৮৬.১
ফেনরির / বেলারুশিয়ান	২০০৫	২২,৪৫৩,০০০	৪	১,২৬০.৩
ফন্‌জোট / কাযাখ	২০০৫	২৫,১০৮,০০০	৬	১,৪৯০.৯
গ্রীপ / সুইডিশ	২০০৬	১৮,২০৬,০০০	৬	৯২১.২
হাতি / আকান	২০০৫	১৯,৮৫৬,০০০	৬	১,০৩৮.৭

হেলিনি / মাকুয়া	১৯৮০	৩৭৭,৪০০	৩৬ x ২৮	২.৭৩৭
হাইপারিওন / লাহন্দা	১৮৮৪	১,৪৮১,০০০	৩৬০ x ২২৬	২১.২৭৭
হাইরোকিন /	২০০৬	১৮,৪৩৭,০০০	৮	৯৩১.৮
আইয়াপেটাস / আশ্বিন	১৬৭১	৩,৫৬১,৩০০	১৪৩৬	৭৯.৩২১৫
ইজিরাক / তাতার-বাশকি	২০০০	১১,৪৪০,০০০	১৪	৪৫১.৪৮
জেইনাস / বাগেলি	১৯৬৬	১৫১,৪৭২	১৯০ x ১৫৪	০.৬৯৫
জার্নসাক্সা / জোসা	২০০৬	১৮,৮১১,০০০	৬	৯৬৪.৭
কারি / হাইটিয়ান	২০০৬	২২,১১৮,০০০	৭	১,২৩৩.৬
কিভিউক / কঙ্গানি	২০০০	১১,৩৬৫,০০০	১৭	৪৪৯.২২
লৌগি / আলবানিয়ান	২০০৬	২৩,০৬৫,০০০	৬	১,৩১২.০
মিথোন / গুয়ারানি	২০০৪	১৯৪,০০০	৩	১.০১
মাইমাস / জাভানিজ	১৭৮৯	১৮৫,৫২০	৩৯৮	০.৯৪২
মান্ডিলফারি / আফ্রিকান্স	২০০০	১৮,৭০৯,০০০	৭	৯৫১.৩৮
নার্ভি / স্লোভাক	২০০৩	১৮,৭১৯,০০০	৮	৯৫৬.২
পালিয়াক / ফিনিশ	২০০০	১৫,১৯৯,০০০	২৫	৬৮৬.৯২
পালিন / হিব্রু	২০০৪	২১১,০০০	৪	১.১৪
প্যান / কাশ্মীরী	১৯৯০	১৩৩,৬৩০	১৯.৩২	০.৫৭৫০
প্যান্ডোরা / মিনাঙ্কাবাউ	১৯৮০	১৪১,৭০০	১১০ x ৬২	০.৬২৯
ফয়েবি / তেলুগু	১৮৯৮	১২,৯৫২,০০০	২২০	৫৫০.৪৮
পলিডিউসেস / ডেনিশ	২০০৪	৩৭৭,৪০০	৪	২.৭৪
প্রমেথিউস / ভিলি	১৯৮০	১৩৯,৩৫০	১৪৮ x ৬৮	০.৬১৩
রিয়া / ভাদ্র	১৬৭২	৫২৭,০৪০	১৫২৮	৪.৫১৮
সিয়ারনাক / মঙ্গলিয়ান	২০০০	১৮,১৬০,০০০	৪৫	৮৯৩.০৭
স্কাথি / টিংরিনিয়া	২০০০	১৫,৬৪৫,০০০	৮	৭২৮.৯৩
স্কল / হিলিগাইনোন	২০০৬	১৭,৬৬৫,০০০	৬	৮৭৮.৩
সুরতার / কঙ্গো	২০০৬	২২,৭০৭,০০০	৬	১,২৯৭.৭
সাত্তাংগর / ভেনেশিয়ান	২০০০	১৯,৪৭০,০০০	৭	১০১৬.৮
এস/০৪ এস০৭ / সান্টালি	২০০৪	১৯,৮০০,০০০	৬	১,১০৩
এস/০৪ এস১২ / শিলুবা	২০০৪	১৯,৬৫০,০০০	৫	১,০৪৮
এস/০৪ এস১৩ / সুকুমা-নায়ামুইজি	২০০৪	১৮,৪৫০,০০০	৬	৯০৬
এস/০৪ এস১৭ / আর্মেনিয়ান	২০০৪	১৮,৬০০,০০০	৪	৯৮৬
এস/০৬ এস০১ / মসি-দাগোম্বা	২০০৬	১৮,৯৮১,১৩৫	৬	৯৭০

এস/০৬ এস০৩ / তুর্কমেন	২০০৬	২১,১৩২,০০০	৬	১,১৪২
এস/০৭ এস২ / বাতাক	২০০৭	১৬,৫৬০,০০০	৬	৮০০
এস/০৭ এস৩ / সাউদার্ণ-কুইচিউয়া	২০০৭	২০,৫১৮,৫০০	৫	১,১০০
তারক্বিক / বেলুচি	২০০৭	১৮,০০৯,০০০	৭	৮৮৭.৫
টারভস / ইলোকানো	২০০০	১৮,২৩৯,০০০	১৬	৯২৫.৭০
টেলেস্টো / গিকুয়াইউ	১৯৮০	২৯৪,৬৬০	৩০ x ১৬	১.৮৮৮
টিদিস / জাপানিজ	১৬৮৪	২৯৪,৬৬০	১০৬০	১.৮৮৮
থাইমর / নিয়াপোলিটান	২০০০	২০,৪৭০,০০০	৭	১০৮৮.৮৯
টাইটান / শ্রাবণ	১৬৫৫	১,২২১,৮৫০	৫১৫০	১৫.৯৪৫
ইমির / মান্দিঙ্গো	২০০০	২৩,০৯৬,০০০	২০	১৩১২.৩৭
ইউরেনাস/ গ্রীষ্ম (২৭টি চন্দ্র)				
আরিয়েল / পর্তুগিজ	১৮৫১	১৯১,২৪০	১১৬০	২.৫২০
বেলিন্ডা / সিসিলিয়ান	১৯৮৬	৭৫,২৬০	৬৬	০.৬২৪
বিয়াঙ্কা / নরওয়েজিয়ান	১৯৮৬	৭৫,২৬০	৪২	০.৪৩৩
কালিবান / বিকল	১৯৯৭	৭,২০০,০০০	৮০	৫৭৯.৫
করদেলিয়া / বাম্বারা	১৯৮৬	৪৯,৭৫০	২৬	০.৩৩৫
ক্রেসিডা / সাউদার্থ-থাই	১৯৮৬	৬১,৭৭০	৬২	০.৪৬৪
কিউপিড / দলোও	২০০৩	৭৪,৮০০	১২	০.৬১৮
ডেজডামোনা / জর্জিয়ান	১৯৮৬	৬২,৬৬০	৫৪	০.৪৭৪
ফারদিন্যান্ড / কিতুবা	২০০১	২০,৯০১,০০০	২১	২,৮২৩.৪
ফ্রান্সিসকো / কানুরি	২০০১	৪,২৭৬,০০০	২২	২৬৬.৬
জুলিয়েট / ইতালিয়ান	১৯৮৬	৬৪,৩৬০	৮৪	০.৪৯৩
ম্যাব / উলুফ	২০০৩	৯৭,৭৩৪	১৬	০.৯২৩
মার্গারেট / গান্ধা	২০০৩	১৪,৬৮৮,৭০০	১১	১,৬৯৪.৮
মিরান্ডা / মারাঠি	১৯৪৮	১২৯,৭৮০	৪৭২	১.৪১৪
অবেরন / অগ্রহায়ণ	১৭৮৭	৫৮২,৬০০	১৫২৬	১৩.৪৬৩
অফেলিয়া / উম্বুন্ধু	১৯৮৬	৫৩,৪৪০	৩০.৪	০.৩৭৬৪
পারডিটা / কাম্বা	১৯৮৬	৭৬,৪২০	২০	০.৬৩৮
পর্টিয়া / তামিল	১৯৮৬	৬৬,০৮৫	১০৮	০.৫১৩
প্রসপেরো / ডগরি	১৯৯৯	১৬,২৫৬,০০০	৩০	৫.৩৪৬
পাক / কোরিয়ান	১৯৮৫	৮৬,০১০	১৫৪	০.৭৬২
রজেলিন্ড / সঙ্গা	১৯৮৬	৬৯,৯৪১	৫৪	০.৫৫৮
সেটেবস / কনকানি	১৯৯৯	১৭,৪১৮,০০০	৪৭	২,২৩৪.৮
স্টিফানো / লুইয়া	১৯৯৯	৮,০০৪,০০০	৩২	৬৭৭.৪

সাইকোরেক্স / ফ্রেঞ্চ	১৯৯৭	১২,২০০,০০০	১৬০	১২৮৩.৩৯
টাইটানিয়া / কাত্রিক	১৭৮৭	৪৩৫,৮৪০	১,৫৭৮	৮.৭০৬
ট্রিংকুলো / মেম্বা	২০০১	৮,৫৭৮,০০০	১০	৭৫৯.০
আম্রিয়েল / পৌষ	১৮৫১	২৬৫,৯৭০	১১৯০	৪.১৪৪
নেপচুন / বর্ষা (১৩টি চন্দ্র)				
ডেসপিনা / তুর্কি	১৯৮৯	৬২,০০০	১৬০	০.৪০
গালাটিয়া / পশ্‌তু	১৯৮৯	৫২,৫০০	১৪০	০.৩৩
হালিমিড / মালে	২০০২	১৫,৬৮৬,০০০	৬০	১,৮৭৪.৮৩
লারিস্‌সা / উর্দু	১৯৮৯	৭৩,৬০০	২০০	০.৫৬
লাওমিডিয়া / বুগিনিজ	২০০২	২২৬১৩২০০	৩৮	২৯৮০.৪
নেইয়াড / এসেহনিজ	১৯৮৯	৪৮,২০০	৫০	০.৩০
নিরিদ / চৈত্র	১৯৪৯	৫৫১৩৪০০	৩৪০	৩৬০.১৬
নেসো / বার্মিজ	২০০২	৪৭,২৭৯,৬৭০	৬০	৯,০০৭.১
প্রটিউস / ফাল্গুন	১৯৮৯	১১৭,৬০০	৪২০	১.১২
সামেইদ / এফিক	২০০৩	৪৬,৭৩৮,০০০	৩৮	৯,১৩৬.১১
সাও / বালিনিজ	২০০২	২২,৩৩৭,১৯০	৩৮	২,৯২৫.৬
তালাসা / ফার্সি	১৯৮৯	৫০,০০০	৯০	০.৩১
ট্রাইটন / মাঘ	১৮৪৬	৩৫৪,৮০০	২৭০৫	৫.৮৭৭
প্লুটো / শরৎ (৩টি চন্দ্র)				
ক্যারন / এশিয়া	১৯৭৮	১৯,৫৭১	১,২০৭	৬.৩৮৭
নিক্স / আমেরিকা	২০০৫	৪৮,৬৭৫	৪৪-১৩০	২৪.৮৫৬
হাইড্রা / আফ্রিকা	২০০৫	৬৪,৭৮০	৪৪-১৩০	৩৮.২০৬
হোমিয়া / হেমন্ত (২টি চন্দ্র)				
নামাকা / ইউরোপ	২০০৫	৩৯০০০	~১৭০	৩৪.৭
হাই'আয়াকা / এ্যান্টার্কটিকা	২০০৫	৪৯৫০০	~৩১০	৪৯.১২
এরিস / শীত (১টি চন্দ্র)				
ডিসনোমিয়া / অস্ট্রেলিয়া	২০০৫	৩০,০০০-৩৬,০০০	~৩০০	~১৪

সূত্র: Windows to the Universe, National Earth Science Teachers Association
www.windows2universe.org/

Index - নির্ঘণ্ট

(অধিকাংশ ইংরেজী শব্দ মূল বর্ণনায় আসে নি।)